হজ, উমরা ও যিয়ারত

মুফতি মুহাম্মাদ নু‘মান আবুল বাশার

মাওলানা আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ড. আব্দুল জলীল

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

الحج والعمرة والزيارة

(باللغة البنغالية)

محمد نعمان أبو البشر

علي حسن طيب

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

د/ محمد عبد الجليل

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [ال عمران: ٩٧]

“আর সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহ’র হজ করা ফরয।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.............

গ্রন্থটি হজ, উমরা ও মসজিদে নববীর যিয়ারত বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গসুন্দর সঙ্কলন। হজ-উমরা-যিয়ারতের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতার প্রতি লেখকবৃন্দ গুরুত্ব দিয়েছেন। সহীহ হাদীস ও মতের আলোকে, দুর্বল হাদীস ও মত বর্জন করে গ্রন্থটিকে হাজী, উমরা পালনকারী ও যিয়ারতকারী প্রতিটি মানুষের বোধগম্য করার প্রয়াসও লক্ষণীয়।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করেছেন এবং বাইতুল্লাহ'র হজ ফরয করেছেন। সালাত ও সালাম সৃষ্টির সেরা সেই মহামানবের ওপর, যাকে তিনি হিদায়াতের দূত হিসেবে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথী ও অনাগত সকল অনুসারীর ওপর।

হজ বিশ্ব মুসলিমের মিলনমেলা। এ এক বিশাল ও মহতি সমাবেশ। ভাষা, বর্ণ, দেশ ও স্বভাব-প্রকৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও এখানে দুনিয়ার নানা প্রান্তের মানুষ এক মহৎ ইবাদতের লক্ষ্যে একত্রিত হয়। এটি একটি আত্মিক, দৈহিক, আর্থিক ও মৌখিক ইবাদত। এতে সামাজিক ও বৈশ্বিক, দাওয়াহ ও প্রচার এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা বিষয়ের সমাহার ঘটে। তাই এর যাবতীয় নিয়ম-কানূন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং তা সঠিকভাবে পালন করা একান্ত প্রয়োজন। মূলত এসবের মাধ্যমেই হাজী সাহেবান সঠিক অর্থে তাদের হজ পালন করতে পারবেন, পৌঁছতে পারবেন তাদের মূল লক্ষ্যে। কাঙ্ক্ষিত সে লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা প্রদানের জন্যই আমাদের এ প্রয়াস। আমরা কতটুকু সফল হয়েছি, তা বিচারের ভার বিজ্ঞপাঠকদের ওপর।

বইটির আদ্যোপান্ত জুড়ে আছে বাংলাদেশ চ্যারিটেবল এণ্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (BCRF) -এর গবেষণা পরিষদ এবং সম্পাদকমণ্ডলীর

একান্ত নিষ্ঠা ও শ্রমের স্বাক্ষর। এছাড়াও গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাদের সহযোগিতা আমাদেরকে ঋণী করেছে তারা হলেন, মাওলানা আসাদুজ্জামান, মাওলানা জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের, ভাই ওয়ালীউল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র কামারুজ্জামান শামীম, মুহাম্মাদ জুনায়েদ, উম্মে হানী ও আব্দুল্লাহ আল-মামুনসহ বেশ কজন মেধাবী মুখ। বিজ্ঞজনদের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহণও আমাদেরকে অনেকাংশে ঋণী করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

মুফতি মুহাম্মাদ নু'মান আবুল বাশার

চেয়ারম্যান

BCRF

সম্পাদকমণ্ডলীর কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হজ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। বিশ্বমুসলিমের শ্রেষ্ঠতম একক মিলনকেন্দ্রিক আমল। হজের এ আমলটি বিশুদ্ধভাবে পালনের সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন ভাষায় প্রচুর বই-পুস্তক রয়েছে। বাংলা ভাষায়ও বইয়ের অভাব নেই। অভাব রয়েছে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য-প্রমাণ সমৃদ্ধ হজের মূল কার্যাবলিসহ যাবতীয় কর্মসমূহের সঠিক নির্দেশনামূলক একটি স্বতন্ত্র বইয়ের। বাংলাদেশ চ্যারিটেবল এণ্ড রিসার্স ফাউন্ডেশন (BCRF) সে অভাব পূরণে এগিয়ে এসেছে।

হজের আমলসমূহের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনাকারীর বর্ণনার ভিন্নতার কারণে মতবিরোধপূর্ণ বর্ণনাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন বা অধিক বিশুদ্ধ মতগুলো বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় দো'আগুলোর বাংলা উচ্চারণ দেওয়া হয়েছে। আরবী কিছু বর্ণের সঠিক উচ্চারণ অন্য ভাষায় সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে পাঠককে আলেমগণের কাছ থেকে সঠিক উচ্চারণ জেনে নেওয়ার অনুরোধ রইল। কিছু কিছু পরিভাষার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আলাদাভাবে প্রদান করা হয়েছে। সকল আমলের ক্ষেত্রেই শুধু বই পড়ে পূর্ণাঙ্গ ও সুচারুরূপে আমল করা সম্ভব নয়। সেজন্য বিজ্ঞ আলেমদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ।

বইটি নির্ভুল করার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। যদি কারো চোখে কোনো ভুল ধরা পড়ে, তা অবহিত করলে কৃতজ্ঞ হব। BCRF-এর অনেকগুলো ভালো কাজের মধ্যে এ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। এর উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ

কবুল করুন এবং তাদের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করুন। আমীন।

ড. আব্দুল জলীল

ও

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া মজুমদার

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

হজের সফর

সফরের দো‘আ

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের উদ্দেশ্যে উটের পিঠে আরোহণ করতেন, তখন বলতেন,

«اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحانَ الذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وإِنَّا إِلَى ربِّنَا لَمُنْقَلِبُون، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنا هَذَا البِرَّ والتَّقْوى، ومِنَ الْعَمَلِ ما تَرْضَى، اللَّهُمَّ هوِّن عَلَيْنا سَفَرَنا هَذَا واطْوِعنَّا بُعدَه، اللَّهُمَّ أنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَر، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِيْ الْمَالِ والأَهْلِ».

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাযী ছাখখারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুকরিনীন; ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফি সাফারিনা হাযাল-বির্রা ওয়াত-তাকওয়া, ওয়া মিনাল আমালি মা-তারদা। আললাহুম্মা হাওয়িন ‘আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াতবি ‘আন্না বু‘দাহু। আল্লাহুম্মা আনতাস সাহেবু ফিস-সাফারি, ওয়াল খালীফাতু ফিল আহলি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ওয়া‘ছাইস সাফারি ওয়া কাআবাতিল মানযারি ওয়া সূইল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি।)

“আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। পবিত্র সেই মহান সত্ত্বা যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা একে

বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই ফিরে যাব আমাদের রবের নিকট। হে আল্লাহ, আমাদের এ সফরে আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা জানাই সৎকাজ ও তাকওয়ার এবং এমন আমলের যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এ সফর সহজ করুন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ, এ সফরে আপনিই আমাদের সাথী এবং পরিবার-পরিজনের আপনিই তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ, আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট ও অবাঞ্ছিত দৃশ্য থেকে এবং সম্পদ ও পরিজনের মধ্যে মন্দ প্রত্যাবর্তন থেকে।”

আর সফর থেকে ফিরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দো‘আগুলো পড়তেন এবং সাথে এ অংশটি যোগ করতেন-

«آئِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ».

(আয়িবূনা, তায়িবূনা, আবিদূনা, লি রাব্বিনা হামিদূন)

“আমরা আমাদের রবের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের রবের প্রশংসাকারী।”[1]

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪২।

প্রথম অধ্যায়: হজ-উমরা কী, কেন ও কখন

- হজ-উমরার বিধি-নিষেধ জানা ওয়াজিব কেন
- বদলী হজ
- হজের প্রকারভেদ
- হজের ফরয-ওয়াজিব
- উমরার বিধান
- উমরার ফরয-ওয়াজিব
- হজ ফরয ও উমরা ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ
- হজ ও উমরার ফযীলত
- হজের প্রকারভেদ
- বদলী হজ

হজ-উমরার বিধি-নিষেধ জানা ওয়াজিব কেন

প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা ফরয। আর প্রয়োজনীয় মুহূর্তের জ্ঞান অর্জন করা বিশেষভাবে ফরয। ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত ইসলামী বিধি-বিধান জানা ফরয। কৃষকের জন্য কৃষি সংক্রান্ত ইসলামের যাবতীয় নির্দেশনা জানা ফরয। তেমনি ইবাদতের ক্ষেত্রেও সালাত কায়েমকারীর জন্য সালাতের যাবতীয় মাসআলা জানা ফরয। হজ পালনকারীর জন্য হজ সংক্রান্ত যাবতীয় মাসআলা জানা ফরয।

প্রচুর অর্থ ব্যয় ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করে হজ থেকে ফেরার পর যদি আলেমের কাছে গিয়ে বলতে হয়,'আমি এই ভুল করেছি, দেখুন তো কোনো পথ করা যায় কি-না', তবে তা দুঃখজনক বৈ কি। অথচ তার ওপর ফরয ছিল, হজের সফরের পূর্বেই এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। ইমাম বুখারী রহ. তার রচিত সহীহ গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ-শিরোনাম করেছেন এভাবে:

باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ}

(এ অধ্যায় 'কথা ও কাজের আগে জ্ঞান লাভ করার বিষয়ে'; কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সুতরাং তুমি 'জান' যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)। ইমাম বুখারী রহ. এখানে কথা ও কাজের আগে ইলম তথা জ্ঞানকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»

“তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ ও উমরার বিধি-বিধান শিখে নাও।”[2] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হজ ও উমরা পালনের আগেই হজ সংক্রান্ত যাবতীয় আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব, আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, হজ-উমরা পালনকারী প্রত্যেক নর-নারীর জন্য যথাযথভাবে হজ ও উমরার বিষয়াদি জানা ফরয। হজ ও উমরা পালনের বিধি-বিধান জানার পাশাপাশি প্রত্যেক হজ ও উমরাকারীকে অতি গুরুত্বের সাথে হজ ও উমরার শিক্ষণীয় দিকগুলো অধ্যয়ন ও অনুধাবন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের সফরে বা হজের দিনগুলোতে কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন, উম্মত ও পরিবার-পরিজন এবং স্বজনদের সাথে উঠাবসায় কী ধরনের আচার-আচরণ করেছেন তা রপ্ত করতে হবে। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টির অধ্যয়ন, অনুধাবন ও রপ্তকরণ হজ-উমরার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টি করবে।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে হজ-উমরার বিধি-বিধান জানা, এর শিক্ষণীয় দিকগুলো অনুধাবন করা এবং সহীহভাবে হজ-উমরা পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৭।

হজ-উমরার সংজ্ঞা

হজ:

হজের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা।[3] শরী‘আতের পরিভাষায় হজ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট কিছু জায়গায়, নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু কর্ম সম্পাদন করা।[4]

উমরা:

উমরার আভিধানিক অর্থ: যিয়ারত করা। শরী‘আতের পরিভাষায় উমরা অর্থ, নির্দিষ্ট কিছু কর্ম অর্থাৎ ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ ও মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত করা।[5]

হজের বিধান

১. হজ ইসলামের পাঁচ রুকন বা স্তম্ভের অন্যতম, যা আল্লাহ তা‘আলা সামর্থবান মানুষের ওপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧﴾ [ال عمران: ٩٧]

“এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহ’র হজ করা ফরয। আর যে কুফুরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে

---

[3] ইবনুল আসীর, নিহায়া : (১/৩৪০)।

[4] ইবন কুদামা, আল-মুগনী : (৫/৫)।

[5] ড .সাঈদ আল-কাহতানী, আল-উমরাতু ওয়াল হাজ্জ ওয়ায যিয়ারাহ, পৃ .৯।

অমুখাপেক্ষী।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

“ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে পাঁচটি বস্তুর ওপর: এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়েম করা; যাকাত প্রদান করা; হজ করা এবং রমযানের সিয়াম পালন করা।”[6]

সুতরাং হজ ফরয হওয়ার বিধান কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত।

২. হজ সামর্থবান ব্যক্তির ওপর সারা জীবনে একবার ফরয। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ.فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا ، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا. الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ‘হে লোক সকল, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ওপর হজ

[6] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ০৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬১।

ফরয করেছেন।’ তখন আকরা‘ ইবন হাবিস রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, প্রত্যেক বছর? তিনি বললেন, ‘আমি বললে অবশ্যই তা ফরয হয়ে যাবে। আর যদি ফরয হয়ে যায়, তবে তোমরা তার ওপর আমল করবে না এবং তোমরা তার ওপর আমল করতে সক্ষমও হবে না। হজ একবার ফরয। যে অতিরিক্ত আদায় করবে, সেটা হবে নফল।”[7]

৩. সক্ষম ব্যক্তির ওপর বিলম্ব না করে হজ করা জরুরী। কালক্ষেপণ করা মোটেই উচিৎ নয়। এটা মূলত শিথিলতা ও সময়ের অপচয় মাত্র। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ».

“তোমরা বিলম্ব না করে ফরয হজ আদায় কর। কারণ, তোমাদের কেউ জানে না, কী বিপদাপদ তার সামনে আসবে।”[8]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ»

“যে কেউ হজ করার ইচ্ছা করে সে যেন তা তাড়াতাড়ি করে, কারণ

---

[7] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৩০৪; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৫১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৮৬; অনুরূপ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৭।

[8] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৮৬৭; অনুরূপ ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৮৩।

কোনো রোগীর রোগ এসে যেতে পারে, কোনো পথভ্রষ্ট পথভ্রষ্টতায় যেতে পারে, অনুরূপ কোনো মানুষের কোনো বিশেষ প্রয়োজন এসে তাকে হজ থেকে বিরত রাখতে পারে।”[9]

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ لَهُ جَدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ».

“আমার ইচ্ছা হয়, এসব শহরে আমি লোক প্রেরণ করি, তারা যেন দেখে কে সামর্থবান হওয়ার পরও হজ করে নি। অতঃপর তারা তার ওপর জিযিয়া[10] আরোপ করবে। কারণ, তারা মুসলিম নয়, তারা মুসলিম নয়।”[11]

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন,

«لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا- يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَوَجَدَ لِذَلِكَ سَعَةً».

“ইয়াহূদী হয়ে মারা যাক বা খ্রিস্টান হয়ে -তিনি কথাটি তিনবার বললেন- সেই ব্যক্তি যে আর্থিক স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও হজ না করে মারা গেল।’[12]

---

[9] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৮৩।

[10] কর বা ট্যাক্স।

[11] ইবন হাজার, আত-তালখীসুল হাবীর : (২/২২৩)।

[12] বা বাইহাকী : (৪/৩৩৪), হাদীস নং ৮৪৪৪; আবূ নু‘আইম ফিল হিলইয়াহ (৯/২৫২); অনুরূপ, ইবন আবি শাইবাহ (৩/৩০৬), হাদীস নং ১৪৪৫৫।

হজের ফরয-ওয়াজিব

হজের ফরযসমূহ:

১. ইহরাম তথা হজের নিয়ত করা। যে ব্যক্তি হজের নিয়ত করবে না তার হজ হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

"নিশ্চয় আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকের জন্য তাই হবে, যা সে নিয়ত করে।"[13]

২. উকূফে আরাফা বা আরাফায় অবস্থান।[14] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْحَجُّ عَرَفَةُ».

---

[13] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১।

[14] হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শের অনুকরণ করেছেন। তিনি মুশরিকদের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে বলছেন, 'هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِهِمْ'"আমাদের আদর্শ তাদের আদর্শ থেকে ভিন্ন।" সুতরাং তিনি মুসলিমদেরকে নিয়ে আরাফার ময়দানে অবস্থান করলেন এবং এ ক্ষেত্রেও কুরাইশদের বিপরীত করলেন। কেননা কুরাইশরা মুযদালিফা অতিক্রম করত না; বরং মুযদালিফাতেই অবস্থান করত এবং বলত, আমরা হারাম এলাকা ছাড়া অন্য জায়গা থেকে প্রস্থান করব না। উল্লেখ্য, আরাফা হারামের সীমারেখার বাইরে। [মুস্তাদরাক, হাদীস নং ৩০৯৭ ও বায়হাকী : আস-সুনানুল-কুবরা : (৫/১২৫)]

“হজ হচ্ছে আরাফা।”[15]

৩. তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারা (বাইতুল্লাহ’র ফরয তাওয়াফ)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]

“আর তারা যেন প্রাচীন ঘরের[16] তাওয়াফ করে।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৯]

সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন ঋতুবতী হলেন, তখন নবীজী বললেন, ‘সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে তো ইফাযা অর্থাৎ বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ করেছে। তাওয়াফে ইফাযার পর সে ঋতুবতী হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাহলে এখন যাত্রা কর।[17] এ থেকে বুঝা যায়, তাওয়াফে ইফাযা ফরয।

৪. সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করা।[18] অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ ও

---

[15] নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৬; তিরমিযী, হাদীস নং ৮৮৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০১৫।

[16] الْبَيْتِ الْعَتِيق বা পুরাতন ঘর বলতে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য তৈরিকৃত সবচাইতে পুরাতন ঘর তথা কা‘বা ঘরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, ইবাদতের জন্য নির্মিত এটিই যমীনের বুকে সর্বপ্রথম ঘর।

[17] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪২৮।

[18] জাহেলী যুগে আনসারদের কিছু লোক মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ পালন করত এবং মনে করত যে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা বৈধ নয়। তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করতে আসল, তখন

ইমামের মতে এটা ফরয।[19] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ».

“তোমরা সাঈ কর, কেননা আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ওপর সাঈ ফরয করেছেন।”[20]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ».

“আমার জীবনের কসম! আল্লাহ কখনো সে ব্যক্তির হজ পরিপূর্ণ করবেন না যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে না।”[21]

মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি কোনো একটি ফরয ছেড়ে দিবে, তার হজ হবে না।

হজের ওয়াজিবসমূহ:

১. মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ মীকাত অতিক্রমের আগেই ইহরাম বাঁধা।

বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থাপন করল। তিনি বললেন, ‘সাঈ কর, কেননা আল্লাহ তোমাদের ওপর সাঈ ফরয করেছেন।’ (বিস্তারিত দেখুন: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৪৩)

[19] ইমাম আবূ হানীফা রহ-.এর মতে এটি ওয়াজিব।

[20] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৭৩৬৭; সহীহ ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ২৭৬৪।

[21] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৭৭।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাতগুলো নির্ধারণ করার সময় বলেন,

«هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ».

“এগুলো তাদের জন্য এবং যারা অন্যত্র থেকে ঐ পথে আসে হজ ও উমরা আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে তাদের জন্যও।”[22]

২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা।

যে ব্যক্তি আরাফার ময়দানে দিনে উকূফ করবে, তার ওপর ওয়াজিব হচ্ছে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দানে দিনে উকূফ করেছেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছেন। মিসওয়ার ইবন মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আরাফায় আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতা করার সময় বললেন, মুশরিক ও পৌত্তলিকরা সূর্যাস্তের সময় এখান থেকে প্রস্থান করত, যখন সূর্য পাহাড়ের মাথায় পুরুষের মাথায় পাগড়ির মতোই অবস্থান করত। অতএব, আমাদের আদর্শ তাদের আদর্শ থেকে ভিন্ন”।[23] সুতরাং সূর্যাস্তের পর আরাফা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্থান মুশরিকদের আচারের সাথে ভিন্নতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই ছিল।

৩. মুযদালিফায় রাত যাপন।

---

[22] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮১।

[23] বায়হাকী, আস-সুনানুল-কুবরা : (৫/১২৫)।

ক. কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় রাত যাপন করেছেন এবং বলেছেন,

«لِتَأْخُذْ أُمَّتِي نُسُكَهَا ، فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا».

"আমার উম্মত যেন হজের বিধান শিখে নেয়। কারণ, আমি জানি না যে, এ বছরের পর সম্ভবত তাদের সাথে আমার আর সাক্ষাত হবে না।"[24]

খ. তিনি অর্ধরাতের পর দুর্বলদেরকে মুযদালিফা প্রস্থানের অনুমতি দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, মুযদালিফায় রাত যাপন ওয়াজিব। কারণ অনুমতি তখনই প্রয়োজন হয় যখন বিষয়টি গুরুত্বের দাবী রাখে।

গ. আল্লাহ তা'আলা মাশ'আরে হারামের নিকট তাঁর যিকির করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ﴾ [البقرة: ١٩٨]

"সুতরাং যখন তোমরা আরাফা থেকে বের হয়ে আসবে, তখন মাশ'আরে হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৮]

৪. তাশরীকের রাতগুলো মিনায় যাপন।

১০ তারিখ দিবাগত রাত ও ১১ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় যাপন করতে হবে। ১২ তারিখ যদি মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্য ডুবে যায়

---

[24] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৯৪৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২৩।

তাহলে ১২ তারিখ দিবাগত রাতও মিনায় যাপন করতে হবে। ১৩ তারিখ কঙ্কর মেরে তারপর মিনা ত্যাগ করতে হবে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের সালাত মসজিদুল হারামে আদায় ও তাওয়াফে যিয়ারত শেষ করে মিনায় ফিরে এসেছেন এবং তাশরীকের রাতগুলো মিনায় কাটিয়েছেন।”[25]

হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিনার রাতগুলো মক্কাতে যাপনের অনুমতি দিয়েছেন এবং উটের দায়িত্বশীলদেরকে মিনার বাইরে রাতযাপনের অনুমতি দিয়েছেন। এই অনুমতি প্রদান থেকে প্রতীয়মান হয়, মিনার রাতগুলোতে মিনাতে যাপন করা ওয়াজিব।

৫. জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

১০ যিলহজ জামরাতুল আকাবায় (বড় জমারায়) কঙ্কর নিক্ষেপ করা। তাশরীকের দিনসমূহ যথা, ১২, ১২ এবং যারা ১৩ তারিখ মিনায় থাকবেন, তাদের জন্য ১৩ তারিখেও। যথাক্রমে ছোট, মধ্যম ও বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

---

[25] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৭৩।

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ».

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি কুরবানীর দিন তিনি তাঁর বাহনের ওপর বসে কঙ্কর নিক্ষেপ করছেন এবং বলেছেন, তোমরা তোমাদের হজের বিধান জেনে নাও। কারণ, আমি জানি না, সম্ভবত আমার এ হজের পর আমি আর হজ করতে পারব না।"[26]

৬. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করার আদেশ দিয়ে বলেন, وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحِلل অর্থাৎ সে যেন মাথার চুল ছোট করে এবং হালাল হয়ে যায়।[27] আর তিনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার মাগফিরাতের দো'আ করেছেন এবং চুল ছোটকারীদের জন্য একবার মাগফিরাতের দো'আ করেছেন।

৭. বিদায়ী তাওয়াফ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী তাওয়াফের আদেশ দিয়ে বলেন,

«لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْت».

"বাইতুল্লাহ'র সাথে তার শেষ সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন না

---

[26] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৭; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৭০।

[27] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২২৭।

যায়।”[28]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ».

“লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের শেষ কাজ যেন হয় বাইতুল্লাহ’র সাক্ষাত। তবে তিনি ঋতুবতী মহিলার জন্য ছাড় দিয়েছেন।”[29]

উল্লেখ্য, যে এসবের একটিও ছেড়ে দিবে, তার ওপর দম ওয়াজিব হবে অর্থাৎ একটি পশু যবেহ করতে হবে।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا».

“যে ব্যক্তি তার হজের কোনো কাজ করতে ভুলে যায় অথবা ছেড়ে দেয় সে যেন একটি পশু যবেহ করে।”[30]

---

[28] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩২৭।

[29] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩২৮।

[30] মুআত্তা মালেক, হাদীস নং ১৮৮; দারাকুতনী : (৩/২৭০), হাদীস নং ২৫৩৪।

উমরার বিধান

বিশুদ্ধ মতানুসারে উমরা করা ওয়াজিব।[31] আর তা জীবনে একবার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ».

"ইসলাম হচ্ছে তোমার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়েম করা; যাকাত প্রদান করা; হজ করা ও উমরা করা; নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল করা; পূর্ণরূপে অযু করা এবং রমযানের সিয়াম পালন করা।"[32]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, মহিলাদের কি জিহাদ আছে? উত্তরে তিনি বললেন,

«نَعَمْ ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ ، لاَ قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ».

---

[31] ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে উমরা করা সুন্নাত। প্রমাণ, জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস: উমরা করা ওয়াজিব কি-না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছেন, لاَ وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ "না, তবে যদি উমরা করো তা হবে তোমার জন্য উত্তম।" উভয়পক্ষের দলীল-প্রমাণ পর্যালোচনা করলে যারা ওয়াজিব বলেছেন তাদের মতই প্রাধান্যযোগ্য বলে মনে হয়।

[32] ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ৩০৬৫; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ১৭৩।

‘হ্যাঁ, তাদেরও জিহাদ[33] আছে, তাতে কোনো লড়াই নেই। তা হলো, হজ ও উমরা।”[34]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ لاَ بُدَّ مِنْهُمَا فَمَنْ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ».

“প্রত্যেকের ওপর একবার হজ ও একবার উমরা ওয়াজিব,[35] যা অবশ্যই আদায় করতে হবে। যে এরপর অতিরিক্ত করবে, তা হবে উত্তম ও নফল।”[36]

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ».

“আল্লাহর প্রতিটি মাখলূক (সামর্থবান মানুষ)-এর ওপর অবশ্যই

---

[33] জিহাদ খুবই কষ্টসাধ্য আমল। মহিলাদের জন্য হজ) পুরুষদের তুলনায় (অধিক কষ্টসাধ্য কাজ। সেহেতু তা মহিলাদের জিহাদ। মহিলাদের অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া শারীরিকভাবেও অনেক কাজ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া আরো অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে।

[34] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৫৩২২; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯০১; ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ৩০৭৪।

[35] সুন্নাহের পরিভাষায় ফরয ও ওয়াজিব উভয়টির জন্য ওয়াজিব শব্দ ব্যবহার করা হয়।

[36] ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ৩০৬৬; হাকেম, হাদীস নং ১৭৩২; বুখারী, তা‘লিকাহ।

উমরা ওয়াজিব।”[37]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ وَاجِبَتَانِ».

“হজ ও উমরা উভয়টা ওয়াজিব।”[38]

উমরার ফরয-ওয়াজিব

উমরার ফরয:

১. ইহরাম বাঁধার নিয়ত করা। যে ব্যক্তি উমরার নিয়ত করবে না তার উমরা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

‘নিশ্চয় আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকের জন্য তাই হবে, যা সে নিয়ত করে।’[39]

২. বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ۝٢٩﴾ [الحج: ٢٩]

“আর তারা যেন প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৯]

---

[37] ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ৩০৬৭।

[38] মুহাল্লা: (৫/৮)।

[39] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১।

৩. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা। (অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ ও ইমামের মতে)। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে এটি ওয়াজিব। সাফা ও মারওয়ায় সাঈ ফরয হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَة»

"আর তোমাদের মধ্যে যে হাদী নিয়ে আসেনি সে যেন বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফ করে এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করে।"[40] তাছাড়া তিনি সাঈ সম্পর্কে আরো বলেন,

«اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيِ».

"তোমরা সাঈ করো, কেননা আল্লাহ তোমাদের ওপর সাঈ ফরয করেছেন।"[41]

সুতরাং যদি কেউ ইহরাম বাঁধার নিয়ত না করে, তবে তার উমরা আদায় হবে না। যদিও সে তাওয়াফ, সাঈ সম্পাদন করে। তেমনি যদি কেউ তাওয়াফ বা সাঈ না করে, তাহলে তার উমরা আদায় হবে না। তাওয়াফ ও সাঈ আদায় না করা পর্যন্ত সে ইহরাম অবস্থায় থাকবে। এমতাবস্থায় তাকে চুল ছোট বা মাথা মুণ্ডন না করে ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে।

---

[40] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২২৭।

[41] মুসনাদ আহমাদ : (৬/৪২১), হাদীস নং ২৭৩৬৭; মুস্তাদরাক হাকেম, হাদীস নং (৪/৭০), হাদীস নং ৬৯৪৩; ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ২৭৬৪।

উমরার ওয়াজিব:

১. মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

ক. মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীদের জন্য যে মীকাত দিয়ে তিনি প্রবেশ করবেন সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধা। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাতগুলো নির্ধারণ করার সময় বলেন,

«هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ».

"এগুলো তাদের জন্য এবং যারা অন্যত্র থেকে ঐ পথে আসে হজ ও উমরা আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে তাদের জন্যও।"[42]

খ. মক্কায় অবস্থানকারীদের জন্য হিল্ল অর্থাৎ হারাম এলাকার বাইরে থেকে ইহরাম বাঁধা। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তান'ঈম থেকে ইহরাম বাঁধার আদেশ দিয়েছেন।[43] তানঈম হারামের সীমার বাইরে অবস্থিত। মক্কায় অবস্থানকারী উমরাকারীদের জন্য এটি সবচেয়ে কাছের মীকাত অর্থাৎ উমরার ইহরাম বাঁধার স্থান।

গ. যারা মীকাতের ভেতরে অথচ হারাম এলাকার বাইরে অবস্থান করেন তারা নিজ নিজ অবস্থানস্থল থেকেই উমরার ইহরাম বাঁধবেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ»

---

[42] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮১।

[43] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১১।

“আর যারা মীকাতের ভেতরে অবস্থানকারী তারা যেখান থেকে (হজ বা উমরার) ইচ্ছা করে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে।”[44]

২. মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছোট করা।

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার আদেশ দিয়ে বলেন, وَلْيُقْصِرْ ، وَلْيُحِلل অর্থাৎ সে যেন মাথার চুল ছোট করে এবং হালাল হয়ে যায়।[45]

৩. সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা ওয়াজিব। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, এটি ফরয।

---

[44] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮১।

[45] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২২৭।

চয়নিকা

'যার অন্তর আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের চেতনায় পূর্ণ, তার পক্ষে স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব। কারণ, এ মহান সত্ত্বার বিরুদ্ধাচরণ আর অন্যদের আদেশ লঙ্ঘন সমান নয়। যে নিজকে চিনতে পেরেছে, নিজের প্রকৃত অবস্থা জানতে পেরেছে এবং প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে স্বীয় দৈন্যতা আর তাঁর প্রতি তীব্র মুখাপেক্ষিতার বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছে, তার পক্ষে সেই মহান সত্ত্বার বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিজের করুণ দশা আর রবের অসীম ক্ষমতার উপলব্ধিই তাকে যাবতীয় পাপাচার ও স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ থেকে ফিরিয়ে রাখে। ফলে সে যে কোনো মূল্যে প্রভূর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। শাস্তির সতর্ক বাণীতে তার বিশ্বাস যত দৃঢ় হয়, শাস্তি থেকে বাঁচতে তার চেষ্টাও তত প্রাণান্তকর হয়।'[46]

-ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রহ.

[46] মাদারিজুস সালিকীন : (১/১৪৪-১৪৫)।

হজ ফরয ও উমরা ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

হজ-উমরা সহীহ হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলিম ও জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। আর তার ওপর হজ-উমরা আবশ্যক হওয়ার জন্য তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক ও সামর্থবান হতে হবে। মহিলা হলে হজের সফরে তার সাথে মাহরাম থাকতে হবে। নিচে এর বিবরণ তুলে ধরা হলো:

হজ ও উমরা সহীহ হওয়ার শর্ত:

১. মুসলিম হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ﴾ [التوبة: ٢٨]

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় তাদের এ বছরের পর।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَٰتُهُمۡ إِلَّآ أَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ﴾ [التوبة: ٥٤]

"আর তাদের দান কবুল থেকে একমাত্র বাধা এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৪] আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বিদায় হজের পূর্বের বছর, যে হজে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হজের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন- এমন এক দলের সদস্য করে পাঠালেন যারা কুরবানীর দিন মিনায় ঘোষণা দিচ্ছিল,

«لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ».

“এ বছরের পর আর কোনো মুশির্ক হজ করবে না এবং কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করবে না।”[47] বুঝা গেল, এতে যেকোনো ইবাদত সহীহ ও কবুল হওয়ার জন্য মুসলিম হওয়া পূর্বশর্ত।

২. আকল বা বিবেকসম্পন্ন হওয়া।

তাই বিবেকশূন্য ব্যক্তির ওপর হজ-উমরা জরুরী নয়। কারণ, সে ইসলামের বিধি-বিধান জানা এবং আল্লাহর আদেশ বুঝার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং সে দায়িত্ব পালনে অক্ষম। তাই আল্লাহর নির্দেশ পালনে সে আদিষ্ট নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يُرْفَع الْقَلَم عَنْ الصَّغِير وَعَنْ الْمَجْنُون وَعَنْ النَّائِم».

“বাচ্চা, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়।”[48] যদি কেউ ইহরাম বাঁধার পূর্বেই বেহুঁশ বা অজ্ঞান হয়, তার জন্য বেহুঁশ অবস্থায় ইহরাম বাঁধার অবকাশ নেই। কেননা হজে বা উমরা আদায়ের জন্য নিয়ত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি সে ইহরাম বাঁধার পর বেহুঁশ হয় তাহলে তার ইহরাম শুদ্ধ হবে। বেহুঁশ

---

[47] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৯।

[48] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২০৪২।

হওয়ার কারণে তার ইহরামের কোনো ক্ষতি হবে না। এমতাবস্থায় তার সফরসঙ্গীদের উচিৎ তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া, সে যেন সময়মত আরাফাতে অবস্থান করতে পারে।

হজ ও উমরা আবশ্যক হওয়ার শর্ত:

১. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা-যদিও সে বুঝার মত বা ভালো-মন্দ পার্থক্য করার মত জ্ঞান রাখে- তার জন্য হজ-উমরা আবশ্যক নয়। কেননা তার জ্ঞান ও শক্তি এখনো পূর্ণতা পায় নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ:- وَفِيهِ - وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ».

“তিনজন থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: (তন্মধ্যে) শিশু থেকে, যতক্ষণ না সে যৌবনে উপনীত হয়।”[49]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

«وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ».

“এবং শিশু থেকে যতক্ষণ না সে বালেগ হয়।”[50]

তবে বাচ্চারা যদি হজ বা উমরা আদায় করে, তবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘একজন মহিলা একটি শিশুকে উঁচু ধরে জানতে চাইল, ‘হে আল্লাহর রাসূল, এর জন্য

---

[49] তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৩২

[50] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪৪০৩।

কি হজ রয়েছে?’ তিনি বললেন,

«نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».

“হ্যাঁ, আর সাওয়াব হবে তোমার।”[51]

প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো শিশুও ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সব বিষয় থেকে দূরে থাকবে। তবে তার ইচ্ছাকৃত ভুলগুলোকে অনিচ্ছাকৃত ভুল হিসেবে গণ্য করা হবে। ভুলের কারণে তার ওপর কিংবা তার অভিভাবকের ওপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে না। এ হজ তার জন্য নফল হবে। সামর্থবান হলে বালেগ হওয়ার পর তাকে ফরয হজ করতে হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَيُّما صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةً أُخْرَى».

“কোনো বাচ্চা যদি হজ করে, অতঃপর সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তবে পরবর্তীকালে সামর্থবান হলে তাকে আরেকটি হজ করতে হবে।”[52]

অনেক ফিকহবিদ বলেন, ‘শিশু যদি বালেগ হওয়ার আগে ইহরাম বাঁধে এবং ইহরাম অবস্থায় বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে আরাফায় অবস্থান করে, তাহলে তার ফরয হজ আদায় হয়ে যাবে।’

২. সামর্থবান হওয়া।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[51] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৬।

[52] আল-আওসাত : ২৭৩১; মাজমাউজ যাওয়ায়েদ : (৩/৬০২); অনুরূপ সহীহ ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ৩০৫১; মুস্তাদরাক হাকেম, হাদীস নং ১৭৬৯।

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧﴾ [ال عمران: ٩٧]

"এবং সামর্থবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহ'র হজ করা ফরয। আর যে কুফুরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

আপনার কোনো ঋণ থেকে থাকলে হজ করার পূর্বেই তা পরিশোধ করে নিন। যাকাত, কাফ্‌ফারা ও মানত ইত্যাদি পরিশোধ না করে থাকলে তাও আদায় করে নিন। কেননা এগুলো আল্লাহর ঋণ। মানুষের ঋণও পরিশোধ করে নিন। মনে রাখবেন, যাবতীয় ঋণ পরিশোধ ও হজের সফরকালীন সময়ে পরিবারের ব্যয় মেটানোর ব্যবস্থা করে হজের কার্যাদি সম্পন্ন করার মত অর্থ-কড়ি বা সামর্থ যদি আপনার থাকে তাহলে হজে যেতে আপনি আর্থিকভাবে সামর্থবান। আপনার ওপর হজ ফরয। তবে আপনি যদি এমন ধরনের বড় ব্যবসায়ী হন, বিভিন্ন প্রয়োজনে যার বড় ধরনের ঋণ করতেই হয়, তাহলে আপনার গোটা ঋণের ব্যাপারে একটা আলাদা অসিয়ত নামা তৈরি করুন। আপনার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী যারা হবেন তাদেরকে এ বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করে যান।

আপনি হালাল রিযিক উপার্জন করে হজে যাওয়ার মতো টাকা জোগাড় করার চেষ্টা করুন। কখনো হারাম টাকায় হজ করার পরিকল্পনা করবেন না। যদি এমন হয় যে, আপনার সমগ্র সম্পদই হারাম, তাহলে আপনি তাওবা করুন। হারাম পথ বর্জন করে হালাল পথে সম্পদ উপার্জন শুরু করুন। আর কোনো দিন হারাম পথে যাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করুন।

আপনি যদি দৈহিকভাবে সুস্থ হোন। অর্থাৎ শারীরিক দুর্বলতা, বার্ধক্য বা দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে হজের সফর বা হজের রুকন আদায় করতে অক্ষম না হোন, তাহলে আপনি হজে যেতে শারীরিকভাবে সামর্থবান বিবেচিত হবেন।

আপনি যদি আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থবান হোন, তাহলে আপনার ওপর সশরীরে হজ করা ফরয। আর যদি আর্থিকভাবে সামর্থবান কিন্তু শারীরিকভাবে সামর্থবান না হোন, তাহলে আপনি প্রতিনিধি নির্ধারণ করবেন, যিনি আপনার পক্ষ থেকে হজ ও উমরা আদায় করবেন। 'বদলী হজ' অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

৩. হজের সফরে মহিলার সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে সফরের দূরত্বে গিয়ে হজ করতে হলে মাহরাম সাথে থাকা শর্ত। যে মহিলার মাহরাম নেই তার ওপর হজ ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا».

“কোনো মহিলা যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে আর কোনো পুরুষ যেন কোনো মহিলার সাথে মাহরাম থাকা ছাড়া তার কাছে না যায়। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি অমুক অমুক যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা করেছি। এদিকে আমার স্ত্রী হজের ইচ্ছা করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যাও।”[53]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ».

“কোনো মহিলা যেন মাহরাম ছাড়া কখনো হজ না করে।”[54]

মহিলার মাহরাম

যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্থায়ীভাবে হারাম, তারাই শরী‘আতের পরিভাষায় মাহরাম। মাহরাম কয়েক ধরনের হয়ে থাকে।

এক. বংশগত মাহরাম।

বংশগত মাহরাম মোট সাত প্রকার:

মহিলার পিতৃকূল: যেমন পিতা, দাদা, নানা, পর-দাদা, পর-নানা এবং তদূর্ধ্ব পিতৃপুরুষ।

মহিলার ছেলে-সন্তান: যেমন পুত্র, পুত্রের পুত্র, কন্যার পুত্র ও তাদের অধস্তন পুরুষ।

মহিলার ভাই: সহোদর তথা আপন ভাই বা বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বৈমাত্রেয় ভাই।

---

[53] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬২।

[54] দারাকুতনী : (৩/২২৭), হাদীস নং ২৪৪০।

মহিলার চাচা: আপন চাচা বা বৈপিত্রেয় চাচা অথবা বৈমাত্রেয় চাচা। অথবা পিতা বা মাতার চাচা।

মহিলার মামা: আপন মামা বা বৈপিত্রেয় মামা অথবা বৈমাত্রেয় মামা। অথবা পিতা বা মাতার মামা।

মহিলার ভাইয়ের ছেলে: ভাইয়ের ছেলে, ভাইয়ের ছেলের ছেলে, ভাইয়ের ছেলের কন্যাদের ছেলে ও তাদের অধস্তন পুরুষ।

মহিলার বোনের ছেলে: বোনের ছেলে, বোনের ছেলের ছেলে, বোনের ছেলের কন্যাদের ছেলে ও তাদের অধস্তন পুরুষ।

দুই. দুগ্ধপানজনিত মাহরাম।

দুগ্ধপানজনিত মাহরামও বংশগত মাহরামের ন্যায় সাত প্রকার, যার বিবরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন. বৈবাহিক সম্পর্কজাত মাহরাম।

বৈবাহিক সম্পর্কজাত মাহরাম পাঁচ ধরনের:

১- স্বামী।

২- স্বামীর পুত্র, তার পুত্রের পুত্র, কন্যার পুত্র এবং তাদের অধস্তন পুরুষ।

৩- স্বামীর পিতা, দাদা, নানা এবং তদূর্ধ্ব পুরুষ।

৪- কন্যার স্বামী, পুত্রসন্তানের মেয়ের স্বামী, কন্যাসন্তানের মেয়ের স্বামী এবং তাদের অধস্তন কন্যাদের স্বামী।

৫- মায়ের স্বামী এবং দাদী বা নানীর স্বামী।

মাহরাম বিষয়ক শর্ত

মাহরাম পুরুষ অবশ্যই মুসলিম, বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। কেননা মাহরাম সাথে নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে হজের কার্যাদি সম্পাদনে মহিলার সার্বিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মাহরাম যদি অমুসলিম হয় অথবা ভালো-মন্দ বিচার-ক্ষমতা না রাখে অথবা বালক কিংবা শিশু হয় কিংবা পাগল হয়, তবে তার দ্বারা মহিলার সার্বিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না।

যদি কোনো মহিলা মাহরাম ছাড়া হজ করে, তাহলে তা আদায় হবে বটে। কিন্তু মাহরাম ছাড়া সফরের কারণে সে গুনাহগার হবে। কেননা মহিলাদের সাথে মাহরাম থাকা হজ ফরয হওয়ার শর্ত। আদায় হওয়ার শর্ত নয়।

হজ ও উমরার ফযীলত

হজ ও উমরার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো:

১. হজ অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমলটি সর্বোত্তম?

«فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُور».

“তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। বলা হলো, ‘তারপর কী’? তিনি বললেন, ‘আল্লাহর পথে জিহাদ করা’প্সবলা হলো ‘তারপর কোনটি?’ তিনি বললেন, ‘কবুল হজ’।”[55]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সর্বোত্তম আমল কী- এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন,

«الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا».

“এক আল্লাহর প্রতি ঈমান; অতঃপর মাবরূর হজ, যা সকল আমল থেকে শ্রেষ্ঠ; সূর্য উদয় ও অস্তের মধ্যে যে পার্থক্য ঠিক তারই মতো (অন্যান্য আমলের সাথে তার শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য)।”[56]

২. পাপমুক্ত হজের প্রতিদান জান্নাত। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ».

“আর মাবরূর হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।”[57]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজকে জিহাদ হিসেবে গণ্য করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[55] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৩।

[56] আহমদ : (৪/৩৪২), হাদীস নং ১৯০১০।

[57] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৯।

‘হে আল্লাহর রাসূল, জিহাদকে তো সর্বোত্তম আমল হিসেবে মনে করা হয়, আমরা কি জিহাদ করবো না? তিনি বললেন,

«لَكُنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ».

“তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে মাবরূর হজ।”[58]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি আপনাদের সাথে জিহাদে ও অভিযানে যাব না’? তিনি বললেন,

«لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ».

“তোমাদের জন্য উত্তম ও সুন্দরতম জিহাদ হল ‘হজ’- মাবরূর হজ।”[59] আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«جِهَادُ الْكَبِيرِ ، وَالصَّغِيرِ ، وَالضَّعِيفِ ، وَالْمَرْأَةِ: الْحَجُّ ، وَالْعُمْرَةُ».

“বয়োঃবৃদ্ধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, দুর্বল ও মহিলার জিহাদ হচ্ছে হজ ও উমরা।”[60]

৪. হজ পাপ মোচন করে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

---

[58] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৮৪।

[59] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬১।

[60] নাসাঈ, হাদীস নং ২৬২৬।

“যে আল্লাহর জন্য হজ করল, যৌন-স্পর্শ রয়েছে এমন কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল এবং শরী‘আত অনুমতি দেয় না এমন কাজ থেকে বিরত থাকল, সে তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতো পবিত্র হয়ে ফিরে এল।”[61]

এ হাদীসের অর্থ আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন,

«أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ».

“তুমি কি জান না, ‘কারো ইসলাম গ্রহণ তার পূর্বের সকল গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয়, হিজরত তার পূর্বের সকল গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয় এবং হজ তার পূর্বের সকল গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয়?”[62]

৫. হজের ন্যায় উমরাও পাপ মোচন করেপ্দআবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

“যে ব্যক্তি এই ঘরে এলো, অতঃপর যৌন-স্পর্শ রয়েছে এমন কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল এবং শরী‘আত বহির্ভুত কাজ থেকে বিরত থাকল, সে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত (নিষ্পাপ) হয়ে ফিরে গেল।” ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর

---

[61] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৫০।

[62] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১।

মতানুসারে এখানে হজকারী ও উমরাকারী উভয় ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে।[63]

৬. হজ ও উমরা পাপ মোচনের পাশাপাশি হজকারী ও উমরাকারীর অভাবও দূর করে দেয়। আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ».

“তোমরা হজ ও উমরা পরপর করতে থাক, কেননা তা অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন দূর করে দেয় কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রুপার ময়লাকে।”[64]

৭. হজ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর মেহমান বা প্রতিনিধি। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ ، وَفْدُ اللهِ ، دَعَاهُمْ ، فَأَجَابُوهُ ، وَسَأَلُوهُ ، فَأَعْطَاهُمْ».

“আল্লাহর পথে যুদ্ধে বিজয়ী, হজকারী ও উমরাকারী আল্লাহর মেহমান বা প্রতিনিধি। আল্লাহ তাদেরকে আহবান করেছেন, তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আর তারা তাঁর কাছে চেয়েছেন এবং তিনি

[63] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৫০।

[64] তিরমিযী, হাদীস নং ৮১০; নাসাঈ, হাদীস নং ২৬৩০।

তাদেরকে দিয়েছেন।”[65] অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ، وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ».

“হজ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর মেহমান বা প্রতিনিধি। তারা আল্লাহকে ডাকলে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। তারা তাঁর কাছে মাগফিরাত কামনা করলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।”[66]

৮. এক উমরা থেকে আরেক উমরা- মধ্যবর্তী গুনাহ ও পাপের কাফ্ফারা। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا».

“এক উমরা থেকে অন্য উমরা- এ দুয়ের মাঝে যা কিছু (পাপ) ঘটবে তা তার জন্য কাফফারা।”[67]

৯. হজের করার নিয়তে বের হয়ে মারা গেলেও হজের সাওয়াব পেতে থাকবে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

---

[65] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯৩; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৪৬১৩।

[66] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯২ ।

[67] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৯।

“যে ব্যক্তি হজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে; অতঃপর সে মারা গেছে, তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হজের নেকী লেখা হতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশে বের হয়ে মারা যাবে, তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উমরার নেকী লেখা হতে থাকবে।”[68]

১০. আল্লাহ তা‘আলা রমযান মাসে উমরা আদায়কে অনেক মর্যাদাশীল করেছেন, তিনি একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করার সমতুল্য সাওয়াবে ভূষিত করেছেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي».

“নিশ্চয় রমযানে উমরা করা হজ করার সমতুল্য অথবা তিনি বলেছেন, আমার সাথে হজ করার সমতুল্য।”[69]

১১. বাইতুল্লাহ’র উদ্দেশ্যে বের হলে প্রতি কদমে নেকী লেখা হয় ও গুনাহ মাফ করা হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً».

“তুমি যখন বাইতুল্লাহ’র উদ্দেশ্যে আপন ঘর থেকে বের হবে, তোমার

---

[68] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১৪।

[69] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫৬।

বাহনের প্রত্যেকবার মাটিতে পা রাখা এবং পা তোলার বিনিময়ে তোমার জন্য একটি করে নেকী লেখা হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করা হবে।”[70]

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامِ ، لا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلا تَرْفَعُهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهِ خَطِيئَةً ، وَرَفَعَكَ دَرَجَةً»

“কারণ, যখন তুমি বাইতুল্লাহ’র উদ্দেশ্যে আপন ঘর থেকে বের হবে, তোমার উটনীর প্রত্যেকবার পায়ের ক্ষুর রাখা এবং ক্ষুর তোলার সাথে সাথে তোমার জন্য একটি করে নেকী লেখা হবে, তোমার একটি করে গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।”[71]

স্মরণ রাখা দরকার, যে কেবল আল্লাহকে রাজী করার জন্য আমল করবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মুতাবিক হজ-উমরা সম্পন্ন করবে, সেই এসব ফযীলত অর্জন করবে। যেকোনো আমল আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য দু’টি শর্ত রয়েছে, যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

প্রথম শর্ত: একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[70] তাবরানী, মু‘জামুল কাবীর : (১১/৫৫); সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ১৩৬০।

[71] সসহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২।

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

"সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে তাই পাবে, যা সে নিয়ত করবে।"[72]

দ্বিতীয় শর্ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া। কারণ, তিনি বলেছেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

"যে এমন আমল করল, যাতে আমাদের অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"[73]

অতএব, যার আমল কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মুতাবিক হবে তার আমলই আল্লাহর নিকট কবুল হবে। পক্ষান্তরে যার আমলে উভয় শর্ত অথবা এর যেকোনো একটি অনুপস্থিত থাকবে, তার আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ٢٣﴾ [الفرقان: ٢٢]

"আর তারা যে কাজ করেছে আমরা সেদিকে অগ্রসর হব। অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দিব।" [সূরা আল-ফুরকান : ৩৩]

পক্ষান্তরে যার আমলে উভয় শর্ত পূরণ হবে, তার আমল সম্পর্কে

---

[72] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭।

[73] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣﴾ [فصلت: ٣٣]

“আর দীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজকে পূর্ণ সমর্পণ করল।” [সূরা ফুস্সিলাত, আয়াত: ৩৩]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ بَلَىٰۚ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَلَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١١٢ ﴾ [البقرة: ١١٢]

“হ্যাঁ, যে নিজকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও, তবে তার জন্য রয়েছে তার রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১১২]

সুতরাং উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, ‘সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল’ হাদীসটি অন্তরের আমলসমূহের মানদণ্ড এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত ‘যে এমন আমল করল, যাতে আমার অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’ হাদীসটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলসমূহের মানদণ্ড। হাদীস দু’টি ব্যাপক অর্থবোধক। দীনের মূল বিষয়াদি ও শাখা-প্রশাখাসমূহ এবং অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের কোনোটিই এর বাইরে নয়। এক কথায় সম্পূর্ণ দীন এর আওতাভুক্ত।

হজের প্রকারভেদ

হজ তিনভাবে আদায় করা যায়: তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ।

১. তামাত্তু হজ

তামাত্তু হজের পরিচয়:

হজের মাসগুলোতে হজের সফরে বের হবার পর প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধা এবং সাথে সাথে এ উমরার পরে হজের জন্য ইহরাম বাঁধার নিয়তও থাকা।

তামাত্তু হজের নিয়ম:

হাজী সাহেব হজের মাসগুলোতে প্রথমে শুধু উমরার জন্য তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে ইহরাম বাঁধবেন। তারপর তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করে মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার মাধ্যমে উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবেন এবং স্বাভাবিক কাপড় পরে নিবেন। তারপর যিলহজ মাসের আট তারিখ মিনা যাবার আগে নিজ অবস্থানস্থল থেকে হজের ইহরাম বাঁধবেন।

তামাত্তু হজ তিনভাবে আদায় করা যায়

ক) মীকাত থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ সাঈ করে মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং হজ পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করা। ৮ যিলহজ হজের ইহরাম বেঁধে হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

খ) মীকাত থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা গমন করা। উমরার কার্যক্রম তথা তাওয়াফ, সাঈ করার পর কসর-হলক

সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাওয়া। হজের পূর্বেই যিয়ারতে মদীনা সেরে নেওয়া এবং মদীনা থেকে মক্কায় আসার পথে যুল-হুলাইফা বা আবইয়ারে আলী থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কায় আসা। অতঃপর উমরা আদায় করে কসর করে হালাল হয়ে যাওয়া; তারপর ৮ যিলহজ হজের জন্য নতুনভাবে ইহরাম বেঁধে হজ আদায় করা।

গ) ইহরাম না বেঁধে সরাসরি মদীনা গমন করা। যিয়ারতে মদীনা শেষ করে মক্কায় আসার পথে যুল-হুলাইফা বা আবইয়ারে আলী থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা অতঃপর মক্কায় এসে তাওয়াফ, সাঈ ও কসর-হলক করে হালাল হয়ে যাওয়া। এরপর ৮ যিলহজ হজের ইহরাম বাঁধা।

তামাত্তু হজ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য:

- যদি কেউ হজের মাসে হজের নিয়ত না করে উমরা করে, পরবর্তীকালে তার মনে হজ পালনের ইচ্ছা জাগে, তাহলে সে তামাত্তুকারী হবে না।
- তামাত্তুকারীর ওপর এক সফরে দু'টি ইবাদতের সুযোগ লাভের শুকরিয়া স্বরূপ হাদী বা পশু যবেহ করা ওয়াজিব।
- উমরা সমাপ্ত করার পর তিনি স্বদেশে ফেরত যাবেন না। নিজ দেশে গেলে এটি আর তামাত্তুর উমরা হবে না; বরং স্বতন্ত্র উমরা বলে গণ্য হবে।
- উমরা করার পর তিনি হালাল হয়ে যাবেন। এখন ইহরাম অবস্থায় হারাম কাজগুলো তার জন্য হালাল হয়ে যাবে এবং নির্দ্বিধায় তিনি তা করতে পারবেন।

- তামাত্তুকারী উমরা সম্পন্ন করার পর মদীনায় গেলে সেখান থেকে মক্কায় আসার জন্য তাকে উমরা বা হজের ইহরাম বেঁধে আসতে হবে। এমতাবস্থায় প্রথম উমরাটিই তার জন্য তামাত্তুর উমরা হিসেবে গণ্য হবে।

২. কিরান হজ

কিরান হজের পরিচয়:

উমরার সাথে যুক্ত করে একই সফরে ও একই ইহরামে উমরা ও হজ আদায় করাকে কিরান হজ বলে।

কিরান হজের নিয়ম:

কিরান হজ দু'ভাবে আদায় করা যায়।

ক) মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার সময় একই সাথে হজ ও উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হজ্জান) বলে তালবিয়া পাঠ শুরু করা। তারপর মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরা আদায় করা এবং ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। অতঃপর হজের সময় ৮ যিলহজ ইহরামসহ মিনা-আরাফা-মুযদালিফায় গমন এবং হজের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা।

খ) মীকাত থেকে শুধু উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা। পবিত্র মক্কায় পৌঁছার পর উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে হজের নিয়ত উমরার সাথে যুক্ত করে নেওয়া। উমরার তাওয়াফ-সাঈ শেষ করে ইহরাম অবস্থায় হজের অপেক্ষায় থাকা এবং ৮ যিলহজ ইহরামসহ মিনায় গমন ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করা।

কিরান হজ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য:

- কিরান হজকারীর ওপর সর্ব সম্মতিক্রমে শুকরিয়া স্বরূপ হাদী বা পশু যবেহ করা ওয়াজিব।
- কোনো ব্যক্তি তামাত্তুর নিয়ত করে ইহরাম বেঁধেছে; কিন্তু আরাফায় অবস্থানের পূর্বে এই উমরা সম্পাদন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাহলে তার হজ উমরার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কিরান হজকারী হিসেবে গণ্য হবে। এর দুই অবস্থা হতে পারে। যথা:

১. কোনো মহিলা তামাত্তু হজের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধল; কিন্তু উমরার তাওয়াফ করার আগেই তার হায়েয বা নিফাস শুরু হয়ে গেল এবং আরাফায় অবস্থানের আগে সে হায়েয বা নিফাস থেকে পবিত্র হতে পারল না। এমতাবস্থায় তার ইহরাম হজের ইহরামে পরিণত হবে এবং সে কিরান হজকারী হিসেবে গণ্য হবে। সে অন্যসব হাজীর মত হজের অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পাদন করবে। শুধু কা'বা ঘরের তাওয়াফ বাকি রাখবে। হায়েয বা নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে এই তাওয়াফ সেরে নিবে।

২. কোনো ব্যক্তি তামাত্তুর নিয়তে হজের ইহরাম বাঁধল; কিন্তু আরাফায় অবস্থানের পূর্বে তার পক্ষে তাওয়াফ করা সম্ভব হলো না। তাহলে হজের পূর্বে উমরা পূর্ণ করা অসম্ভব হওয়ার কারণে হজ উমরার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। আর তিনি কিরান হজকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩. ইফরাদ হজ

ইফরাদ হজের পরিচয়:

হজের মাসগুলোতে শুধু হজের ইহরাম বেঁধে হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করাকে ইফরাদ হজ বলে।

ইফরাদ হজের নিয়ম:

হজের মাসগুলোতে শুধু হজের ইহরাম বাঁধার জন্য حَجًّا لَبَّيْكَ (লাব্বাইকা হজ্জান) বলে তালবিয়া পাঠ শুরু করা। এরপর মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফে কুদূম অর্থাৎ আগমনী তাওয়াফ এবং হজের জন্য সাঈ করা। অতঃপর ১০ যিলহজ কুরবানীর দিন হালাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা। এরপর হজের অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পাদন করা।

ইফরাদ হজ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য:

- তাওয়াফে কুদূমের পর হজের সাঈকে তাওয়াফে ইফাযা অর্থাৎ ফরয তাওয়াফের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয আছে।
- ইফরাদ হজকারীর ওপর হাদী বা পশু যবেহ করা ওয়াজিব নয়।
- কিরান হজকারী ও ইফরাদ হজকারীর আমল অভিন্ন। কিন্তু কিরানকারীর জন্য দু’টি ইবাদত (হজ ও উমরা) পালনের কারণে কুরবানী ওয়াজিব হয়, যা ইফরাদকারীর ওপর ওয়াজিব নয়। তামাত্তুকারীর ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। তাকে এ জন্য দু’টি তাওয়াফ ও দু’টি সাঈ করতে হয়। একটি তাওয়াফ ও সাঈ উমরার জন্য আরেকটি হজের জন্য।

- কিরানকারী ও ইফরাদকারী উভয়েই তাওয়াফে কুদূম করবেন। তবে এটি ছুটে গেলে অধিকাংশ আলেমের মতে কোনো দম ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে তাওয়াফে ইফাযা (তাওয়াফে যিয়ারত) ফরয। এটি ছাড়া হজ শুদ্ধ হবে না।
- কিরানকারী ও ইফরাদকারী উভয়ের ক্ষেত্রে হজের জন্য একটি সাঈ প্রযোজ্য হবে। এটি তাওয়াফে কুদূমের পরেও সম্পাদন করতে পারবে বা তাওয়াফে ইফাযা বা ফরয তাওয়াফের পরেও সম্পাদন করতে পারবে।

হজ তিন ভাগে বিভক্ত হওয়ার প্রমাণ

১. কুরআন থেকে:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি উমরার পর হজ সম্পাদনপূর্বক তামাত্তু করবে, তবে যে পশু সহজ হবে, তা যবেহ করবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তামাত্তু করার ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক নয়। যে কোনো প্রকার হজই করা যাবে।

২. হাদীস থেকে:

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ».

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজের দিন বের হলাম। আমাদের কেউ উমরার ইহরাম বাঁধলেন, কেউবা হজ ও উমরার জন্য একসাথে ইহরাম বাঁধলেন। আবার কেউ শুধু হজের ইহরাম বাঁধলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজের ইহরাম বাঁধলেন। আর যারা শুধু হজ কিংবা হজ ও উমরা উভয়টির ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা কুরবানীর দিন পর্যন্ত হালাল হন নি।”[74]

হাদীসে আরও এসেছে, হানযালা আসলামী বলেন, আমি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا».

“যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই ইবন মারইয়াম (ঈসা) ফাজ্জুর-রাওহাতে তালবিয়া পাঠ করবেন। হজ অথবা উমরার কিংবা উভয়টার জন্য।”[75]

৩. ইজমায়ে উম্মত:

ইমাম নববী রহ. বলেন, ইফরাদ, তামাত্তু ও কিরান হজ জায়েয

---

[74] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১১।

[75] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫২।

হওয়ার ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[76] খাত্তাবী রহ. বলেন, ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু হজ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।[77]

তিন প্রকারের হজের মধ্যে কোনটি উত্তম?

হানাফী আলেমদের মতে কিরান হজ সর্বোত্তম। তারা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন,

«يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِوَادِى الْعَقِيقِ يَقُولُ: أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّى فَقَالَ صَلِّ فِى هَذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِى حَجَّةٍ».

"তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকীক উপত্যকায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার কাছে এসে বলল, এই বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন, হজের মধ্যে উমরা।"[78]

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ ও উমরা একসাথে আদায় করেছেন।"[79] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[76] শারহুন নাববী লিমুসলিম : (৮/২৩৫)।

[77] আউনুল মা'বূদ : (৫/১৯৫)।

[78] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৪।

[79] তিরমিযী, হাদীস নং ৯৪৭।

«فَإِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ».

"আমি হাদী প্রেরণ করলাম এবং কিরান হজ আদায় করলাম।"[80]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর জন্য কিরান হজকেই পছন্দ করেছেন। আর সেটি সর্বোত্তম বলেই তাঁর নবীর জন্য পছন্দ করেছেন। হানাফী আলেমগণ আরও বলেন, কিরান হজ অন্য সকল হজ থেকে উত্তম, কারণ এটি উমরা ও হজের সমষ্টি এবং এর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাকা হয়, তাছাড়া এটি কষ্টকরও বটে, তাই এর সাওয়াব অধিক ও পরিপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।[81]

মালেকী ও শাফে'ঈদের মতে ইফরাদ সর্বোত্তম। তাদের দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খুলাফায়ে রাশেদীন ইফরাদ হজ আদায় করেছেন। আর এখানে হাদী যবেহ করার মাধ্যমে বদলা দেওয়ারও বাধ্যবাধকতা থাকে না; কিন্তু কিরান ও তামাত্তু হজের পূর্ণতার জন্য সেখানে হাদী যবেহ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাছাড়া ইফরাদ হজে হাজী কেবল হজকে উদ্দেশ্য করেই সফর করে।[82]

হাম্বলী আলেমদের মতে তামাত্তু হজ সর্বোত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় যেসব সাহাবী হাদী তথা কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে আসেন নি, তাদেরকে তামাত্তুর জন্য

---

[80] নাসাঈ, হাদীস নং ২৭২৫।

[81] ইবন হুমাম, ফাতহুল কাদীর : (৩/১৯৯-২১০)।

[82] শারহু খালীল লিল-খুরাশী : (২/৩১০)।

উৎসাহিত করেন। এমনকি তামাত্তুর জন্য হজের নিয়তকে উমরার নিয়তে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন,

«اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ».

“তোমরা তোমাদের হজের ইহরামটিকে উমরায় বদলে নাও। তবে যারা হাদীকে মালা পরিয়েছ (হাদী সাথে করে নিয়ে এসেছ) তারা ছাড়া।”[83]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছিলেন,

«لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ».

“আমি যা আগে করে ফেলেছি তা যদি নতুন করে করার সুযোগ থাকত, তাহলে আমি হাদী সাথে নিয়ে আসতাম না। আর যদি আমার সাথে হাদী না থাকতো, তাহলে আমি হালাল হয়ে যেতাম।”[84] সুতরাং এ হাদীস দ্বারা তামাত্তু হজ উত্তম হওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণিত হলো।

কোনো কোনো আলেম উপরোক্ত মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে বলেন, ‘সুন্নাহ দ্বারা যা প্রমাণিত তা হচ্ছে, ‘যে ব্যক্তি হাদী নিয়ে আসেনি তার জন্য তামাত্তু উত্তম। যে হাদী নিয়ে এসেছে তার জন্য কিরান উত্তম। আর তা তখনই হবে যখন একই সফরে হজ ও উমরা করবে। পক্ষান্তরে যদি উমরার জন্য ভিন্ন সফর এবং হজের জন্য ভিন্ন সফর হয়, তাহলে তার ইফরাদ উত্তম। এ ব্যাপারে চার ইমাম একমত।’[85]

---

[83] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৭২।

[84] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫০।

[85] ইবন তাইমিয়া, মাজমু‘ ফাতাওয়া : (২০/৩৭৩)।

বদলী হজ

যদি কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরয ও উমরা ওয়াজিব হয়; কিন্তু সে সশরীরে তা আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির হজ পালনকে বদলী হজ এবং উমরা আদায়কে বদলী উমরা বলা হয়। বেশ কিছু হাদীস দ্বারা বদলী হজ ও বদলী উমরার বিধান প্রমাণিত হয়। যেমন ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, খাছআম গোত্রের জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

«يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا ، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ « نَعَمْ ». وَذَلِكَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ».

“হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর যা হজের ব্যাপারে ফরয করেছেন তা আমার পিতাকে খুব বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে। তিনি বাহনের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারেন না। তবে কি আমি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করে দিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ’, ঘটনাটি ছিল বিদায় হজের সময়কার।”[86]

আবূ রাযীন বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি বলল,

«يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».

[86] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৪।

“হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা একেবারে বৃদ্ধ। তিনি হজ-উমরা করার শক্তি রাখেন না। সাওয়ারীর উপর উঠে চলতেও পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে তুমি হজ ও উমরা করো।”[87]

যার ওপর হজ ফরয তিনি যদি হজ না করেই মারা যান, তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে হজ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বের করতে হবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«أَمَرَتْ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا».

“সিনান ইবন আবদুল্লাহ জুহানির স্ত্রী তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করতে বললেন যে, তার মা মারা গেছেন অথচ তিনি হজ করতে পারেন নি। তার জন্য কি তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ করা যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, যদি তার মায়ের ওপর কোনো ঋণ থাকত, আর সে তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করত, তাহলে তার পক্ষ থেকে কি তা পরিশোধ হত না? তাই সে যেন তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ আদায় করে।”[88]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে

---

[87] তিরমিযী, হাদীস নং ৯৩০; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮১০।

[88] নাসাঈ, হাদীস নং ২৬৩৩।

এসেছে,

«أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ». حُجِّى عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».

"জুহাইনা বংশের জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমার মা হজের মানত করেছিলেন। তিনি সে হজ আদায়ের আগেই মারা গেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ করবো?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ করো। তোমার মায়ের যদি কোনো ঋণ থাকতো তুমি কি তা পরিশোধ করতে না? তুমি (তোমার মায়ের যিম্মায় থাকা) আল্লাহর হক পরিশোধ করো। কেননা আল্লাহর পাওনা অধিক পরিশোধযোগ্য।"[89]

বদলী হজের পূর্বে হজ করা জরুরী কি না?

বিশুদ্ধ মতানুসারে প্রতিনিধি হওয়ার আগে তার নিজের হজ করা জরুরী।[90] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ

---

[89] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৫২।

[90] ইমাম আবূ হানীফা রহ-.এর মতে, বদলী হজ করার জন্য তার পূর্বে হজ করা জরুরী নয়। তবে যিনি পূর্বে হজ করেছেন তাকে দিয়ে বদলী হজ করানো উত্তম।

حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, শুবরুমার পক্ষ থেকে লাব্বাইক। তিনি বললেন, শুবরুমা কে? সে বলল, আমার ভাই, অথবা সে বলল আমার নিকটাত্মীয়। তিনি বললেন, তুমি কি নিজের হজ করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, (আগে) নিজের হজ করো, তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ করবে।"[91]

বদলী হজ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য:

১. বদলী হজে প্রেরণকারীর উচিৎ একজন সঠিক ও যোগ্য ব্যক্তিকে তার পক্ষে হজ করতে পাঠানো, যিনি হজ-উমরার নিয়ম-কানূন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত এবং যার অন্তরে রয়েছে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়।

২. বদলী হজকারীর কর্তব্য আপন নিয়ত পরিশুদ্ধ করা এবং দুই উদ্দেশ্যের যেকোনো একটি সামনে রেখে বদলী হজ করতে যাওয়া:

ক. যে ব্যক্তি চায় মৃত ব্যক্তিকে তার হজের দায় থেকে মুক্ত করতে। আল্লাহর প্রাপ্য এই ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে তার উপকার করতে। সে এটা করবে হয়তো মৃত ব্যক্তির সাথে তার আত্মীয়তার সূত্রে কিংবা একজন মুসলিম ভাই হিসেবেপ্ন অতএব, যতটুকু অর্থ খরচ হবে তা-ই গ্রহণ করবে। অবশিষ্টগুলো ফিরত দিবেপ্ন এটি একটি ইহসান বা সৎকর্ম আর আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলকে ভালোবাসেন।

---

[91] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৮১১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯০৩।

খ. যে ব্যক্তি হজ করতে এবং হজের নিদর্শনাবলি দেখতে ভালোবাসে অথচ সে হজের খরচ যোগাতে অক্ষম। অতএব, সে তার প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ নিবে এবং তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে হজের ফরয আদায় করবে।

মোটকথা, বদলী হজকারী হজের জন্য টাকা নিবেপ্লটাকার জন্য হজে যাবে না। আশা করা যায়, এ ব্যক্তি বিশাল নেকীর অধিকারী হবে এবং তাকে প্রেরণকারীর মতো সেও পূর্ণ হজের সাওয়াব পাবে ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ».

“যে বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ সন্তুষ্টচিত্তে তার দায়িত্ব পালন করে সেও একজন সদকাকারী।”[92]

আর বদলী হজের মাধ্যমে যার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন করা, আখিরাতের আমলের উসীলায় দুনিয়া কামাই করা এবং দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ লাভ করা, সে আখিরাতে কিছুই পাবে না।[93]

হজের সামর্থ থাকা না থাকা সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা

- যে ব্যক্তি অতি বার্ধক্যে উপনীত অথবা যার সুস্থ্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন রোগের কারণে হজ-উমরা আদায়ে অক্ষম এ অবস্থায় যদি সে আর্থিকভাবে সক্ষম হয় তবে তার ওপর হজ ফরয হবে না।

---

[92] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০২৩।

[93] মাজমু‘, ইবন তাইমিয়া) : ২৬/২৮(।

- যে বর্তমানে শারীরিকভাবে অক্ষম কিন্তু সে শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম ছিল। তার ওপর হজ ফরয এবং তার কর্তব্য হলো, তার পক্ষ থেকে হজ আদায়ের জন্য একজনকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

- যার ওপর হজ ফরয সে যদি হজ না করেই মারা যায় আর তার সম্পদ থাকে, তাহলে তার সে সম্পদ থেকে হজের খরচ পরিমাণ অর্থ নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে তার বদলী হজ আদায় করাতে হবে।

- মহিলাদের মধ্যে যারা হজ-উমরা সম্পাদন করেছে তারাও মহিলাদের পক্ষ থেকে বদলী হজ ও বদলী উমরা করতে পারবে।

- মহিলারা আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম হলেও কোনো মাহরাম না থাকলে হজ করতে পারবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

"কোনো মহিলা যেন তার মাহরামের সাথে ছাড়া হজ না করে।"[94]

বদলী হজ কোন প্রকারের হবে

তিন প্রকার হজের মধ্যে বদলী হজ কোন প্রকারের হবে, তা যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ করা হচ্ছে তিনি নির্ধারণ করে দিবেন। যদি

[94] দারাকুতনী, হাদীস নং ২৪৪০।

ইফরাদ করতে বলেন, তাহলে ইফরাদ করতে হবে। যদি কিরান করতে বলেন, তাহলে কিরান করতে হবে। আর যদি তামাত্তু করতে বলেন, তাহলে তামাত্তু করতে হবে। এর অন্যথা করা যাবে না। মনে রাখবেন, বদলী হজ ইফরাদই হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে বলেছিলেন,

«حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»

“তোমার পিতার পক্ষ থেকে তুমি হজ ও উমরা করো।”[95] এই হাদীসে হজ ও উমরা উভয়টার কথাই আছে। এতে প্রমাণিত হয়, বদলী হজকারী তামাত্তু ও কিরান হজ করতে পারবে।

বদলী হজকারী ইফরাদ ভিন্ন অন্য কোনো হজ করলে তার হজ হবে না- হাদীসে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। আর এর সপক্ষে কোনো দলীল-প্রমাণও নেই। ‘হজ’ শব্দ উচ্চারণ করলে শুধুই ইফরাদ বোঝাবে, এর পেছনেও কোনো প্রমাণ নেই। কেননা এক হাদীসে এসেছে, دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ (হজে উমরা প্রবিষ্ট হয়েছে)।[96] সুতরাং হজের সাথে উমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাস‘আম গোত্রের মহিলাকে তার পিতার বদলী-হজ করার অনুমতি দেওয়ার সময় যে বলেছেন, فَحُجِّيْ عَنْهُ ‘তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ করো’-এর দ্বারা তিনি উমরাবিহীন হজ বুঝিয়েছেন- এ কথার পেছনে কোনো যুক্তি নেই।

---

[95] তিরমিযী, হাদীস নং ৯৩০।

[96] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

বদলী-হজ কেবলই ইফরাদ হজ হতে হবে- ফিক্হশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবেও এ কথা লেখা নেই। ফিকহশাস্ত্রের কিতাবে লেখা আছে, বদলী-হজ যার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে তিনি যে ধরনের নির্দেশ দিবেন সে ধরনের হজই করতে হবে। যেমন প্রসিদ্ধ কিতাব বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে:

إِذَا أَمَرَ بِحَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَقَرَنَ فَهُوَ مُخَالِفٌ ضَامِنٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُجْزِي ذَلِكَ عَنْ الْآمِرِ نَسْتَحْسِنُ وَنَدَعُ الْقِيَاسَ فِيهِ ، وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَاعْتَمَرَ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ وَلَوْ اعْتَمَرَ ثُمَّ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ يَضْمَنُ النَّفَقَةَ فِي قَوْلِهِمْ ؛ جَمِيعًا لِأَمْرِهِ بِهِ بِالْحَجِّ ، بِسَفَرٍ وَقَدْ أَتَى بِالْحَجِّ مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَ سَفَرَهُ الْأَوَّلَ إِلَى الْعُمْرَةِ ، فَكَانَ مُخَالِفًا فَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ . وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْحَجِّ عَنْهُ فَجَمَعَ بَيْنَ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ عَنْهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَحَجَّ عَنْهُ وَاعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ صَارَ مُخَالِفًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

“(যিনি বদলী-হজ করাচ্ছেন) তিনি যদি শুধু হজ করার নির্দেশ দেন অথবা শুধু উমরা করার নির্দেশ দেন, আর বদলী-হজকারী কিরান হজ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে, বদলী-হজকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, নির্দেশকারীর পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আমরা ‘ইসতিহসান’-এর ওপর আমল করি এবং কিয়াস পরিত্যাগ করি। যিনি বদলী হজ করাচ্ছেন, তিনি যদি হজ করার নির্দেশ দেন আর বদলী-হজকারী উমরা করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা সে নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে নিপ্ল আর যদি সে উমরা করে এবং পরে মক্কা থেকে হজ করে তাহলে সকলের মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা বদলী-হজকারীর প্রতি যিনি হজ

করাচ্ছেন তার নির্দেশ ছিল হজের সফর করার, সে সফর ছাড়াই হজ করেছে। কারণ, প্রথম সফরটা সে উমরার জন্য করেছে। তাই সে নির্দেশের উল্টো কাজ করেছে। সে জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি নির্দেশদাতা হজ ও উমরা উভয়টা এক ইহরামে একত্রে আদায় করতে বলেন, আর বদলী-হজকারী নির্দেশদাতার জন্য শুধু হজ করে, কিন্তু উমরা করে নিজের জন্য, তবে সে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর যাহেরী রেওয়ায়েত[97] অনুসারে-নির্দেশের উল্টো করল।'[98]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, বদলী-হজ যিনি করাচ্ছেন তার কথা মতো হজ সম্পাদন করতে হবে। তিনি যে ধরনের হজের নির্দেশ দিবেন সে ধরনের হজ করতে হবে। নির্দেশ মোতাবেক হজ না করলে কোথায় কোথায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। বদলী-হজকারীকে সর্বাবস্থায় ইফরাদ হজ করতে হবে, এ কথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. কেউই বলেন নি। বরং যিনি হজ করাবেন তার উচিৎ তামাত্তু হজ করানো। কারণ, এতে হজ-উমরা উভয়টি রয়েছে। আর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী উমরা করা ওয়াজিব। ফলে তামাত্তু করলে উভয়টি আদায় হয়ে যায়।

---

[97] যে ছয়টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বর্ণনা হানাফী মাযহাবের ফাতাওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য সেগুলোকে যাহেরী রিওয়ায়েত বলে।

[98] বাদায়েউস্ সানায়ে : (২/২১৩-২১৪)।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হজের সময় দো'আ করার সুযোগ

- যিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের ফযীলত
- মাবরূর হজ
- দো'আ: হজ-উমরার প্রাণ

যিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের ফযীলত

যিলহজ মাসের প্রথম দশদিন অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ. يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

"এমন কোনো দিন নেই যার আমল যিলহজ মাসের এই দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হলো এবং এর কোনো কিছু নিয়েই ফিরত এলো না (তার কথা ভিন্ন)।"[99]

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلا الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتكبير والتَّحْمِيدِ، يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ.»

"এ দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ও মহান কোনো আমল নেই। তাই তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহমীদ (আল-

[99] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ২৪৩৮; তিরমিযী, হাদীস নং ৭৫৭।

হামদুলিল্লাহ) বেশি বেশি করে পড়।”[100]

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِلا مَنْ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ.»

“যিলহজের (প্রথম) দশদিনের মতো আল্লাহর কাছে উত্তম কোনো দিন নেই। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর পথে জিহাদেও কি এর চেয়ে উত্তম দিন নেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কেবল সে-ই যে (জিহাদে) তার চেহারাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।”[101]

এ হাদীসগুলোর মর্ম হলো, বছরে যতগুলো মর্যাদাপূর্ণ দিন আছে তার মধ্যে এ দশ দিনের প্রতিটি দিনই সর্বোত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিনসমূহে নেক আমল করার জন্য তাঁর উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর এ উৎসাহ প্রদান এ সময়টার ফযীলত প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ওপরে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

যিলহজ মাসের প্রথম দশকে রয়েছে আরাফা ও কুরবানীর দিন। আর এ দু’টো দিনেরই রয়েছে অনেক মর্যাদা। যিলহজ মাসের প্রথম দশকের দিনগুলো মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ এ দিনগুলোয়

---

[100] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৬১৫৪, ৫৪৪৬।

[101] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব) : ২/৩২(, হাদীস নং ১১৫০।

সালাত, সিয়াম, সদাকা, হজ ও কুরবানীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলো একত্রিত হয়েছে যার অন্য কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।[102]

যিলহজের প্রথম দশকে নেক আমলের ফযীলত

ইবন রজব রহ. বলেন, উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায়, নেক আমলের মৌসুম হিসেবে যিলহজ মাসের প্রথম দশক হলো সর্বোত্তম, এ দিবসগুলোয় সম্পাদিত নেক আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। হাদীসের কোনো কোন বর্ণনায় أَحَبُّ ('আহাববু' তথা সর্বাধিক প্রিয়) শব্দ এসেছে আবার কোনো কোন বর্ণনায় أَفْضَلُ ('আফযালু' তথা সর্বোত্তম) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব, এ সময়ে নেক আমল করা বছরের অন্য যে কোনো সময়ে নেক আমল করার থেকে বেশি মর্যাদা ও ফযীলতপূর্ণ।

যিলহজের প্রথম দশকে যেসব আমল করা যেতে পারে

১. খাঁটি তাওবা করা

তাওবার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা বা ফিরে আসা। যেসব কথা ও কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অপছন্দ করেন তা বর্জন করে যেসব কথা ও কাজ তিনি পছন্দ করেন তার দিকে ফিরে আসা। সাথে সাথে অতীতে এ ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে অন্তর থেকে অনুতাপ ও অনুশোচনা ব্যক্ত করা।

---

[102] দুরূসু আশরি যিল-হজ: ২২-২৩।

২. হজ ও উমরা পালন করা

হজ ও উমরা পালনের ফযীলত বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৩. সিয়াম পালন করা ও বেশি বেশি নেক আমল করা

নেক আমলের সময়ই আল্লাহ রাববুল আলামীনের কাছে প্রিয়। তবে এই বরকতময় দিনগুলোতে নেক আমলের মর্যাদা ও সাওয়াব অনেক বেশি। যারা এ দিনগুলোতে হজ আদায়ের সুযোগ পেয়েছেন তারা যে অনেক ভাগ্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের উচিৎ হবে যিলহজ মাসের এই মোবারক দিনগুলোতে যত বেশি সম্ভব সিয়াম পালন করা এবং নেক আমল করা।

৪. কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির-আযকারে নিমগ্ন থাকা

এ দিনগুলোয় যিকির-আযকারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, হাদীসে এসেছে:

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এ দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহ রাববুল আলামীনের কাছে প্রিয় ও মহান কোনো আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ) তাকবীর (আল্লাহু আকবার) তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি করে আদায় কর।'[103] এছাড়া কুরআন তিলাওয়াত যেহেতু সর্বোত্তম যিকির তাই বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা উচিৎ।

---

[103] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৫৪৪৬।

৫. উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা

এ দিনগুলোতে আল্লাহ রাববুল আলামীনের মহত্ত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। এ তাকবীর প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরে মসজিদে, বাড়ি-ঘরে, রাস্তা-ঘাট, বাজারসহ সর্বত্র উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। তবে মহিলাদের তাকবীর হবে নিম্ন স্বরে। তাকবীরের শব্দগুলো নিম্নরূপ:

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الحَمْدُ.

(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ)

তাকবীর বর্তমানে হয়ে পড়েছে একটি পরিত্যাক্ত ও বিলুপ্তপ্রায় সুন্নাত। আমাদের সকলের কর্তব্য এ সুন্নাতের পুনর্জীবনের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচারণা চালানো।

যিলহজ মাসের সূচনা থেকে আইয়ামে তাশরীক শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ তাকবীর পাঠ করা সকলের জন্য ব্যাপকভাবে মুস্তাহাব। তবে বিশেষভাবে আরাফা দিবসের ফজরের পর থেকে মিনার দিনগুলোর শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ যেদিন মিনায় পাথর নিক্ষেপ শেষ করবে সেদিন আসর পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের পর উক্ত তাকবীর পাঠ করার জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এ মতটি বর্ণিত। ইবন তাইমিয়া রহ. একে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত বলেছেন। উল্লেখ্য, যদি কোনো ব্যক্তি ইহরাম বাধে, তবে সে তালবিয়ার সাথে মাঝে মাঝে তকবীরও পাঠ করবে।

হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত।[104]

দো‘আ: হজ-উমরার প্রাণ

দো‘আ বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ একটি আমল। আল্লাহর মুখাপেক্ষিতা ও অনুনয়-বিনয় প্রকাশের মাধ্যম হলো দো‘আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো‘আকেই সর্বোচ্চ ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন,

«الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»

“দো‘আই ইবাদত।”[105]

তিনি আরো বলেন,

«لَيْسَ شَيْء أَكرَمَ عَلى الله سُبْحَانَه مِنَ الدعَاء.»

“দো‘আর চেয়ে অধিক প্রিয় আল্লাহর কাছে অন্য কিছু নেই।”[106]

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو، لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلاَ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا ، قَالَ: إِذًا نُكْثِرُ ، قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ».

104 ইবন তাইমিয়া, মজমু‘ ফাতাওয়া : (২৪/২২০)।

105 তিরমিযী, হাদীস নং ২৯৬৯।

106 তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৭০।

“একজন মুসলিম যখন কোনো দো‘আ করে, আর সে দো‘আয় গুনাহের বিষয় থাকে না এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কথাও থাকে না, তখন আল্লাহ তাকে তিনটি বিষয়ের একটি দিয়েই থাকেন: হয়তো তার দো‘আর ফলাফল তাকে দুনিয়াতে নগদ দিয়ে দেন। অথবা সেটা তার জন্য আখিরাতে জমা করে রাখেন। নতুবা দো‘আর সমপরিমাণ গুনাহ তার থেকে দূর করে দেন। সাহাবী বললেন, তাহলে আমরা বেশি বেশি দো‘আ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহও বেশি বেশি দিবেন।”[107]

হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দো‘আর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তিনি তাওয়াফের সময় তাঁর রবের নিকট দো‘আ করেছেন।[108] সাফা ও মারওয়ার উপর দাঁড়িয়ে দো‘আ করেছেন; আরাফায় উটের উপর বসে হাত সিনা পর্যন্ত উঠিয়ে মিসকীন যেভাবে খাবার চায় সেভাবে দীর্ঘ দো‘আ ও কান্নাকাটি করেছেন; আরাফার যে জায়গায় তিনি অবস্থান করেছেন সেখানে স্থির হয়ে সূর্য হেলে গেলে সালাত আদায় করার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো‘আ করেছেন। মুযদালিফার মাশ‘আরুল হারামে ফজরের সালাতের পর আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ আকুতি-মিনতি ও মোনাজাতে রত থেকেছেন।[109] তাশরীকের দিনগুলোতে প্রথম দুই জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর

---

[107] আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৭১০।

[108] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৯২।

[109] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দো‘আ করেছেন।[110]

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন,

فَقَدْ تَضَمّنَتْ حَجّتُهُ صلى الله عليه وسلم سِتّ وَقَفَاتٍ لِلدّعَاءِ. الْمَوْقِفُ الْأَوّلُ عَلَى الصّفَا ، وَالثّانِي: عَلَى الْمَرْوَةِ ، وَالثّالِثُ بِعَرَفَةَ ، وَالرّابِعُ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَالْخَامِسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ، وَالسّادِسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثّانِيَةِ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ ছিল ছয়টি স্থানে বিশেষভাবে দো‘আয় পূর্ণ। প্রথম সাফায়, দ্বিতীয় মারওয়ায়, তৃতীয় আরাফায়, চতুর্থ মুযদালিফায়, পঞ্চম প্রথম জামরায় এবং ষষ্ঠ দ্বিতীয় জামরায়।”[111]

এ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দো‘আর আংশিক বর্ণনা মাত্র। অথচ তিনি মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় থেকে সেখানে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কখনো আল্লাহর প্রশংসা ও যিকির থেকে বিরত থাকেন নি। এ সময়ে তাঁর যবান ছিল আল্লাহর যিকিরে সদা সিক্ত। আল্লাহর মর্যাদার উপযোগী প্রশংসা তিনি বেশি বেশি করে করেছেন। যেমন, তালবিয়ায়, তাকবীরে, তাহলীলে, তাসবীহ ও আল্লাহর হামদ বর্ণনায়; কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে, আবার কখনো চলন্ত অবস্থায়, তথা সর্বক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনায় লিপ্ত থেকেছেন। হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[110] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৫১।

[111] যাদুল মা‘আদ : (২/২৬৩)।

ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন অবস্থা পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টিই আমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে।

উল্লেখ্য, হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো‘আ ও তাঁর প্রভূর প্রশংসার যতটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় তা অবর্ণিত অংশের তুলনায় অতি সামান্য। কেননা দো‘আ হলো বান্দা ও তাঁর প্রভূর মাঝে এক গোপন রহস্য। প্রত্যেক ব্যক্তি সংগোপনে তার প্রভূর সামনে যা কিছু তার প্রয়োজন সে বিষয়ে নিবিড় আকুতি ও মোনাজাত পেশ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অংশটুকু প্রকাশ করেছেন তা ছিল কেবল উম্মতের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার খাতিরে যাতে তারা তাঁর অনুসরণ করতে পারে।

দো‘আ ও যিকির হজের উদ্দেশ্য ও বড় মকসূদসমূহের অন্যতম। নিম্নে বর্ণিত আয়াতে একথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًاۗ﴾ [البقرة: ٢٠٠]

“তারপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ ﴾ [الحج: ٢٨]

“যাতে তারা তাদের পক্ষে কল্যাণকর বিষয়ের স্পর্শে আসতে পারে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত : ২৮] শুধু তাই নয় বরং হজের সকল আমল আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ».

“বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ এবং কঙ্কর নিক্ষেপ আল্লাহর যিকির কায়েমের লক্ষ্যেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।”[112]

এজন্য সে ব্যক্তিই সফল, যে এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং বেশি বেশি দো‘আ-যিকর ও কান্নাকাটি করে; আল্লাহর সামনে নিজের মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে; প্রয়োজন তুলে ধরে; স্বীয় মাওলার জন্য নত হয় এবং নিজকে হীন করে উপস্থিত করে। সচেতন হৃদয়ে একাগ্র চিত্তে ব্যাপক অর্থবোধক দো‘আর মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে।

দো‘আর আদব:

দো‘আর বেশ কিছু আদব রয়েছে, যেগুলো অনুসরণ করলে দো‘আ কবূলের আশা করা যায়। নিম্নে দো‘আর কয়েকটি আদব উল্লেখ করা হলো:

১. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা‘আলার কাছে দো‘আ করা। আল্লাহ

---

[112] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৮৮।

তা‘আলা বলেন,

﴿ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ ﴾ [غافر: ٦٠]

“তোমরা আমার কাছে দো‘আ কর, আমি তোমাদের দো‘আয় সাড়া দিব।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৬০]

২. উযু অবস্থায় দো‘আ করা। যেহেতু দো‘আ একটি ইবাদত তাই অযু অবস্থায় করাই উত্তম।

৩. হাতের তালু চেহারার দিকে ফিরিয়ে দো‘আ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا».

“তোমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে তখন হাতের তালু দিয়ে প্রার্থনা করবে। হাতের পিঠ দিয়ে নয়।”[113] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

«كَانَ إِذَا دَعَا جَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى وَجْهِهِ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো‘আ করার সময় হাতের তালু তাঁর চেহারার দিকে রাখতেন।”[114]

এটিই প্রয়োজন ও বিনয় প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা, যাতে একজন অভাবী কিছু পাবার আশায় দাতার দিকে বিনয়াবনত হয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়।

---

[113] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৪৮৬।

[114] তাবরানী : (১১/৪৩৫), হাদীস নং ১২২৩৪।

৪. হাত তোলা। প্রয়োজনে এতটুকু উঁচুতে তোলা যাতে বগলের নিচ দেখা যায়। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ يَسْأَلُ اللهَ مَسْأَلَةً إِلاَّ آتَاهَا إِيَّاهُ».

"যে ব্যক্তি তার উভয় হাত উঠায় এবং আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চায়, আল্লাহ তাকে তা দিয়েই দেন।"[115]

৫. আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করা।

ফুযালা ইবন উবায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে এক ব্যক্তিকে এভাবে দো'আ করতে শুনলেন যে, সে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করল না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'এ লোকটি তাড়াহুড়া করল।' এরপর তিনি বললেন,

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ»

"তোমাদের কেউ যখন দো'আ করবে, তখন সে যেন প্রথমে তার রবের প্রশংসা করে এবং তার স্তুতি জ্ঞাপন করে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম পাঠ

---

[115] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬০৩।

করে। অতঃপর যা ইচ্ছে প্রার্থনা করে।”[116] অন্য হাদীসে এসেছে,

«كُلُّ دُعاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ».

“প্রত্যেক দো‘আ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত না পড়া পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকে।”[117]

৬. নিজের জন্য ও নিজের আপনজনদের জন্য কল্যাণের দো‘আ করা, মন্দ বা অকল্যাণের দো‘আ না করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ».

“বান্দার দো‘আ কবুল হয়, যতক্ষণ না সে কোনো পাপ কাজের বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো‘আ করে।”[118] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ».

“তোমরা তোমাদের নিজদের, তোমাদের সন্তান-সন্ততির এবং তোমাদের সম্পদের ব্যাপারে বদ-দো‘আ করো না।”[119]

৭. দো‘আ কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর কাছে দো‘আ করা।

---

[116] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৪৮১।

[117] দায়লামী : (৩/৪৭৯১); সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৪৫২৩।

[118] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩৫।

[119] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০০৯।

«اُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاهٍ».

“কবুল হবার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তোমরা আল্লাহর কাছে দো‘আ কর। জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ গাফেল ও উদাসীন হৃদয় থেকে বের হওয়া দো‘আ কবুল করেন না।”[120]

৮. দো‘আর সময় সীমালঙ্ঘন না করা। সা‘দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ».

“অচিরেই এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা দো‘আয় সীমালঙ্ঘন করবে।”[121]

আর সে সীমালঙ্ঘন হচ্ছে, এমন কিছু চাওয়া যা হওয়া অসম্ভব। যেমন, নবী বা ফিরিশতা হবার দো‘আ করা অথবা জান্নাতের কোনো সুনির্দিষ্ট অংশ লাভের জন্য দো‘আ করা।

৯. বিনয় প্রকাশ ও কাকুতি-মিনতি করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱذۡكُر رَّبَّكَ فِي نَفۡسِكَ تَضَرُّعٗا وَخِيفَةٗ وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ﴾ [الاعراف: ٢٠٥]

“আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল-

120 তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৭৯।

121 আহমদ, হাদীস নং ১৪৮৩; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৪৮০।

সন্ধ্যায় অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২০৫]

১০. ব্যাপক অর্থবোধক ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন তা জামে‘ তথা পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক। এক বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপক অর্থবোধক দো‘আ পছন্দ করতেন এবং অন্যগুলো ত্যাগ করতেন।”[122]

১১. আল্লাহ তা‘আলার সুন্দর নামসমূহ ও তাঁর সুমহান গুণাবলির উসীলা দিয়ে দো‘আ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

“আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ, সেগুলোর মাধ্যমে তোমরা তাঁর নিকট দো‘আ কর।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০]

১২. ঈমান ও আমলে সালেহ তথা নেক কাজের উসীলা দিয়ে দো‘আ করা।

ক. ঈমানের উসীলা দিয়ে দো‘আ করার উদাহরণ কুরআনুল কারীমে উল্লেখ হয়েছে,

---

[122] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৪৮২।

﴿رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣﴾ [ال عمران: ١٩٣]

"হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহবানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন'প্ততাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: **১৯৩**]

খ. আমলে সালেহ তথা নেক কাজের উসীলা দিয়ে দো'আ করার উদাহরণ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে,

'তিন ব্যক্তি যাত্রাপথে রাত যাপনের জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ পাহাড় থেকে একটি পাথর খসে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এমন অসহায় অবস্থায় তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ নেক আমলের উসীলা দিয়ে দো'আ করে। একজন বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেদমত, অপরজন অবৈধ যৌনাচার থেকে নিজকে রক্ষা এবং তৃতীয়জন আমানতের যথাযথ হেফাযতের উসীলা দিয়ে পাথরের এই মহা বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করলেন। তাদের দো'আর ফলে পাথর সরে গেল। তারা সকলেই নিরাপদে গুহা থেকে বের হয়ে এলেন।'[123]

---

[123] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২১৫।

১৩. নিজের গুনাহের কথা স্বীকার করে দো‘আ করা। উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মাছের পেটে থাকাবস্থায় ইউনুস আলাইহিস সালাম যে দো‘আর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলাকে ডেকেছিলেন (অর্থাৎ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ। লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন। ‘আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম।’) যেকোনো মুসলিম ব্যক্তি তা দিয়ে দো‘আ করলে আল্লাহ তা‘আলা তার দো‘আ কবুল করে নিবেন।’[124]

১৪. উচ্চ স্বরে দো‘আ না করা; অনুচ্চ স্বরে দো‘আ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٥٥ ﴾ [الاعراف: ٥٥]

“তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ».

“হে লোক সকল, তোমরা নিজদের প্রতি সদয় হও এবং নিচু স্বরে দো‘আ করো। কারণ, তোমরা বধির বা অনুপস্থিত কাউকে

[124] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫০৫; মুস্তাদরাক হাকেম, হাদীস নং ৪১২১।

ডাকছো না। নিশ্চয় তিনি (তাঁর জ্ঞান) তোমাদের সাথেই আছেন। তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, নিকটবর্তী।”[125]

১৫. আল্লাহর কাছে বারবার চাওয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন। ইবন মাস‘ঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا.

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো‘আর বাক্যগুলো তিনবার করে বলতে এবং তিনি তিনবার করে ইস্তেগফার করতে পছন্দ করতেন।”[126]

১৬. কিবলামুখী হয়ে দো‘আ করা। আবদুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْكَعْبَةَ فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ . فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى ، قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا .

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা‘বামুখী হলেন। অতঃপর কুরাইশদের কয়েকজনের জন্য বদ-দো‘আ করলেন, তারা হলো, শাইবা ইবন রবী‘আ, উতবা ইবন রবী‘আ, ওয়ালীদ ইবন উতবা এবং আবূ জাহল ইবন হিশাম। আল্লাহর কসম, আমি তাদেরকে

---

[125] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৪।

[126] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৩৭৪৪।

মৃত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম। রোদ তাদেরকে বদলে দিয়েছিল। তখন ছিল গরমের দিন।”[127]

যেসব কারণে দো‘আ কবুল হয় না:

আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারীর কিছু কিছু অন্যায় ও ত্রুটি এমন রয়েছে, যার ফলে তার দো‘আ কবুল করা হয় না। যেমন,

১. পানীয় হারাম, খাদ্যবস্তু হারাম অথবা পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম হলে। অর্থাৎ প্রার্থনাকারী যদি তার খাদ্য ও পান সামগ্রী এবং পোশাক-আশাক হারাম উপার্জন দিয়ে ক্রয় করে থাকে, তাহলে তার দো‘আ কবুল হবে না।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে লোক সকল, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বিষয়ই গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগণকে যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, মুমিনদেরকেও সে নির্দেশই প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ۝٥١﴾ [المؤمنون: ٥١]

“হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র ও ভালো বস্তু থেকে খাও এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সর্ম্পকে আমি সম্যক জ্ঞাত।” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৫১] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

---

[127] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯৪।

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ۝١٧٢﴾ [البقرة: ١٧٢]

“হে মুমিনগণ, আহার কর আমরা তোমাদেরকে যে হালাল রিযক দিয়েছি তা থেকে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭২] এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফরে উস্কোখুস্কো ও ধূলিমলিন অবস্থায় আকাশের দিকে দু’হাত প্রসারিত করে দো‘আ করে: হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার পানাহার হারাম, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম মাল দিয়েই সে খাবার গ্রহণ করেছে, কীভাবে তার দো‘আ কবুল করা হবে!’[128]

২. দো‘আ কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা।

৩. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য দো‘আ করা। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ».

“বান্দার দো‘আ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হতে থাকে, যতক্ষণ না সে কোনো গুনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো‘আ করে অথবা যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে। বলা হলো, তাড়াহুড়া কী ইয়া

[128] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৫।

রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একথা বলা যে, আমি দো‘আ করেছি, কিন্তু কবুল হতে দেখছি না। অতঃপর আক্ষেপ করতে থাকে এবং দো‘আ করা ছেড়ে দেয়।”[129]

যেসব সময় ও অবস্থায় দো‘আ কবুল হয়:

১. আযানের সময় এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثِنْتَانِ لاَتُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

“দু’টি সময়ের দো‘আ প্রত্যাখ্যাত হয় না বা খুব কমই প্রত্যাখ্যাত হয়: আযানের সময়ের দো‘আ এবং যুদ্ধের সময় যখন একে অপরকে আঘাত করতে থাকে।”[130]

২. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَلاَ إِنَّ الدُّعَاءَ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَادْعُوا».

“জেনে রাখো, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দো‘আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। অতএব, তোমরা দো‘আ কর।”[131]

---

[129] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৪০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩৫।

[130] আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৫৪০; মুস্তাদরাক হাকেম, হাদীস নং ৭১২।

[131] আহমদ, হাদীস নং ১২৫৮৪; তিরমিযী, হাদীস নং ২১২।

৩. সাজদারত অবস্থায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

“বান্দা তার প্রতিপালকের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় সাজদারত অবস্থায়। সুতরাং তোমরা অধিক পরিমাণে দো‘আ কর।”[132]

৪. জুমু‘আর দিনের শেষ সময়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ».

“জুমু‘আর দিনের সময়গুলো বারটি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি সময় এমন যে, ঐ সময়ে কোনো মুসলিম আল্লাহ তা‘আলার কাছে যা চায়, আল্লাহ তা‘আলা তাকে তা দিয়েই দেন। অতএব, তোমরা আসরের পরের শেষ সময়ে তা তালাশ কর”।[133]

৫. রাতের শেষভাগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ».

“আমাদের রব প্রতি রাতে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট

---

[132] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮২।

[133] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১০৪৮; নাসাঈ, হাদীস নং ১৩৮৯।

থাকে তখন দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। এরপর বলতে থাকেন, কেউ কি আমার নিকট দো‘আ করবে, আমি তার দো‘আ কবুল করব? কেউ কি আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে তা দান করবো? কেউ কি আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো?”[134]

৬. সিয়াম পালনকারী, মুসাফির, মাযলুম, সন্তানের জন্য পিতার দো‘আ এবং সন্তানের জন্য পিতার বদ-দো‘আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ».

“তিনটি দো‘আ এমন যে, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই: সন্তানের জন্য পিতার দো‘আ; মুসাফির ব্যক্তির দো‘আ এবং মাযলুমের দো‘আ।”[135]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘সিয়াম পালনকারীর দো‘আ।’[136] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণের সময় বলেছিলেন,

«اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ».

“মযলুমের (বদ) দো‘আ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, মযলুমের দো‘আ

---

[134] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫৮।

[135] আলআদাবুল মুফরাদ-, হাদীস নং ৩২; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৫৩৬।

[136] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫২৬।

এবং আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরায় নেই।”[137]

৭. অসহায় ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দো‘আ। আল্লাহ তা‘আলা অসহায় ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দো‘আ কবুল করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النمل: ٦٢]

“বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহবানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

৮. আরাফার দিবসের দো‘আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير»

“উত্তম দো‘আ হচ্ছে আরাফার দিনের দো‘আ, আর সেই বাক্য যা আমি ও আমার পূর্ববতী নবীগণ বলেছি, (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।) ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”[138]

৯. হজ ও উমরাকারী এবং আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় জিহাদকারীর দো‘আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[137] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৯৬।

[138] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৮৫।

«الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ ، وَفْدُ اللهِ ، دَعَاهُمْ ، فَأَجَابُوهُ ، وَسَأَلُوهُ ، فَأَعْطَاهُمْ».

"আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী, হজ ও উমরাকারী আল্লাহর দূত। তিনি তাদেরকে ডেকেছেন, তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। তারা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছে, তাই তিনি তাদেরকে তা দান করেছেন।"[139]

[139] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯৩।

মাবরূর হজ

'মাবরূর অর্থ মকবুল। মাবরূর হজ অর্থ মকবুল হজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ».

"আর মাবরূর হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।"[140] তাই আমাদের হজ মাবরূর বা মকবুল হওয়ার জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা উচিৎ।

বৈধ উপার্জন

হজের সফর দো'আ কবুলের সফর। তারপরও যদি হারাম মাল দিয়ে তা করে তবে তা কবুল না হওয়ার বিষয়টি এসেই যায়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟»

"হে মানুষগণ, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই কাজের নির্দেশ

---

[140] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৯।

দিয়েছেন, যার নির্দেশ পয়গম্বরদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর।' *(সূরা মুমিনূন ৫১ আয়াত)* তিনি আরও বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা করে থাক।'' *(সূরা বাকারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি সেই লোকের কথা উল্লেখ করে বললেন, যে এলোমেলো চুলে, ধূলামলিন পায়ে সুদীর্ঘ সফরে থেকে আকাশ পানে দু' হাত তুলে 'ইয়া রবব্! 'ইয়া রবব্!' বলে দো'আ করে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম বস্তু দিয়েই তার শরীর পুষ্ট হয়েছে। তবে তার দো'আ কীভাবে কবুল করা হবে?''[141]

লোক দেখানো কিংবা সুনাম কুড়ানোর মানসিকতা বর্জন

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اَللّٰهُمَّ حَجَّةً لاَ رِيَاءَ فِيْهَا وَلاَ سُمْعَةَ».

"হে আল্লাহ, এমন হজের তাওফীক দান করুন, যা হবে লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানোর মানসিকতা মুক্ত।"[142]

---

[141] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৫।

[142] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯০।

আহার করানো ও ভালো কথা বলা

জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজ হজকে মাবরূর করে? তিনি বললেন,

«إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ الْكَلاَمِ».

“আহার করানো এবং ভালো ও সুন্দর কথা বলা।”[143] খাল্লাদ ইবন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবন যুবাইরকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন হাজী উত্তম? তিনি বললেন, যে আহার করায় এবং তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি বলেন, আমাকে ছাওরী বলেছেন, আমরা শুনেছি, এটিই মাবরূর হজ।’[144]

সালাম বিনিময়

জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজের দ্বারা হজ মাবরূর হয়? তিনি বললেন,

«إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ».

“খাবার খাওয়ানো এবং বেশি বেশি সালাম বিনিময়ের দ্বারা।”[145]

---

143 মুস্তাদরাক, হাদীস নং ১৭৭৮; সিলসিলাতুস সহীহাহ, হাদীস নং ১২৬৪; সহীহুত তারগীব : ১১০৪ (১১)।

144 মুসান্নাফে আবদুর-রাযযাক : (৫/১০), হাদীস নং ৮৮১৬।

145 মুসনাদে আহমদ: (৩/৩২৫, ৩৩৪), তবে এর সনদ দুর্বল।

তালবিয়া পাঠ ও কুরবানী করা

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হজে কোন্ কাজে সাওয়াব বেশি? তিনি বললেন, الْعَجُّ وَالثَّجُّ 'উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া এবং জন্তুর রক্ত প্রবাহিত করা।'[146]

সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করা

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হজের মধ্যে সবচেয়ে পুণ্যময় কাজ খাবার খাওয়ানো এবং সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করা।'[147]

ধৈর্য, তাকওয়া ও সদাচার

ছাওর ইবন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে এই কা'বা ঘরের ইচ্ছা করল অথচ তার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য নেই, তার হজ নিরাপদ নয়। ধৈর্য, যা দিয়ে সে তার মূর্খতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে; তাকওয়া, যা তাকে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং সঙ্গী-সাথির সাথে সদাচার।'[148]

দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ এবং আখিরাতে আগ্রহ

এক ব্যক্তি হাসান বসরীকে বললেন, হে আবূ সাঈদ, মাবরূর হজ কোন্টি? তিনি বললেন, 'যে হজ দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী এবং

---

[146] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৮২৭।

[147] আল-ইসতিযকার : (৪/১০৪)।

[148] আল-ইসতিযকার : (৪/১০৪)।

আখিরাতে আগ্রহী বানায়।’[149]

হজের আগের অবস্থা থেকে পরের অবস্থার উন্নতি

একজন হাজী যখন হজের সফরে বের হবেন। পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করবেন। তারপর হজ সম্পন্ন করে নিজ দেশে ফিরে আসবেন, তখন আমরা তাকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারব তার অবস্থার উন্নতি হয়েছ কি-না? যদি অন্যের সাথে আচার-আচরণ, লেনদেন, আমানতদারী, অন্যের হক আদায় এবং ইবাদতের ওপর অবিচলতায় তার অবস্থার উন্নতি হয়, তবে বুঝতে হবে, তার হজ মাবরূর হয়েছে।’

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাবরূর হজের বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ, মাবরূর হজ দুই পন্থায় হয়। এক. মানুষের সাথে সদাচার। দুই. হজের বিধি-বিধান পরিপূর্ণরূপে পালন।

মানুষের সাথে সদাচারের বিষয়টি ব্যাপক। যেমন এর ব্যাপকতা প্রকাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَنْ تُعِيْنَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ، تَحْمِلُهُ عَلَيْهَا وَتَدُلُّهُ عَلَى الطَّرِيْقِ، كُلُّ ذَلِكَ صَدَقَةٌ»

“তুমি মানুষকে তার বাহনে চড়তে সাহায্য করবে, তাকে তাতে উঠিয়ে দিবে এবং পথ দেখিয়ে দিবে- এসবই সাদাকা।”[150]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন,

---

[149] আল-ইসতিযকার : (৪/১০৪)।

[150] ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ১৪৯৩।

«البرُّ شيءٌ هيِّنٌ: وجهٌ طليقٌ وكلامٌ ليِّنٌ».

"নেক কাজ অনেক সহজ: হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আর নরম বাক্য।"[151]

হজ মৌসুমে যেহেতু পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে বিচিত্র স্বভাব ও বিভিন্ন পরিবেশের লোক সমবেত হয়। তাই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা এসব বৈচিত্র্য ও ব্যবধান ঘুচিয়ে, সব ধরনের বিবাদ-ঝগড়া এড়িয়ে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের চেতনায় একাকার হবার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: ١٩٧]

"হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব, এ মাসসমূহে যে নিজের ওপর হজ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭]

সারকথা, সেটিই মাবরূর হজ, যাতে কল্যাণের পূর্ণ সমাহার ঘটে। পূর্ণ মাত্রায় যাতে আদায় করা হয় হজের সব রুকন, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব। উপরন্তু তাতে বিরত থাকা হয় সব ধরনের গুনাহ ও পাপাচার থেকে। বস্তুত যে ব্যক্তি সকল ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসহ হজ পুরোপুরিভাবে আদায় করবে, অবশ্যই সে এই পুণ্য সফরে পাপাচার থেকে বিরত থাকবে।'

আর একমাত্র জান্নাতই যেহেতু মাবরূর হজের প্রতিদান। তাই এ সফরে বের হয়ে যে এর সকল বিধি-বিধান সুচারুরূপে পালন করে

[151] ইবন রজব, জামেউল উলূম ওয়াল-হিকাম : (২/৯৮), হাদীস নং ২৭।

হজ সম্পন্ন করে, সে প্রকৃতপক্ষে জান্নাত নিয়েই ফিরে আসে। মৃত্যুর পর জান্নাতই তার ঠিকানা। অতএব, আল্লাহ তা'আলা যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে এ নি'আমত ও অনুগ্রহে ভূষিত করেন তার জন্য কিছুতেই সমীচীন নয় হেলায় এ নি'আমত হাতছাড়া করা; হজের শিক্ষা বিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজকে এ মহা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা; বরং তার উচিৎ, যেকোনো মূল্যে এ নি'আমত ধরে রাখা।

মুসলিম মাত্রেরই জানা উচিৎ, হজের জন্য মক্কা গমন আল্লাহর এক বিশেষ দান ও অনুগ্রহ। কেউ তার সম্পদগুণে, শরীরের শক্তিবলে, নিজের ক্ষমতা বা পদ বলে সেখানে গমন করতে পারে না। এ জন্যই তাফসীরকারগণ বলেছেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন এর প্রথম ভিত রাখেন; কা'বা ঘর নির্মাণ করেন; তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী পাঠান, 'হে ইবরাহীম, তুমি মানবজাতিকে কা'বায় আসতে আহবান জানাও। তিনি বললেন, হে আমার রব, আমার আওয়াজ আর কতদূর পৌঁছবে? তাদের সবার কাছে আমার দাওয়াত কীভাবে পৌঁছবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার দায়িত্ব আহবান জানানো আর আমার দায়িত্ব তা পৌঁছে দেওয়া। অতঃপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান, 'হে মানব সম্প্রদায়, আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেছেন, অতএব, তোমরা এর উদ্দেশ্যে আগমন করো।' এ কথায় অনাগতকালে যারা হজ করবে তারা সবাই লাব্বাইক বলেছে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তারা সবাই তাদের বাপ-দাদার পিঠ থেকে সাড়া দিয়েছে। যে একবার লাব্বাইক বলেছে, সে একবার হজ করবে। যে দু'বার লাব্বাইক বলেছে সে দু'বার হজ

করবে। যে যতবার বলেছে তার ততবার হজ নসীব হবে।[152]

এজন্যই হাজী সাহেব যখন হজের কার্যাদির সূচনা করেন তখন তার শ্লোগান হয়, 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'প্ম আভিধানিকভাবে লাব্বাইক অর্থ আহবানে সাড়া দেয়া, উত্তর দেয়া। কেউ যখন কাউকে ডাকে, তার উত্তরে বলে, লাব্বাইক, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায়, আমি এখানে আছি। আমি আপনার নির্দেশ পালনে প্রস্তুত। আমি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছি ইত্যাদি। সুতরাং হাজী সাহেব যখন লাব্বাইক বলে হজের কার্যক্রম শুরু করেন, তখন তিনি মূলত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সে আহ্বানেই সাড়া দেন।

মোটকথা হজে যেতে পারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। প্রতিটি মানুষই জানে তার স্বগোত্রের বহু লোকের এ সৌভাগ্য হয় নি। অথচ তারা ধনে, জনে, শক্তিতে ও পদবিতে তার চেয়ে অনেক বড়। যদি তার ওপর আল্লাহর দয়া না হত তাহলে সে হজ করতে পারত না। কাউকে যদি এ সৌভাগ্যে ভূষিত করা হয়, তবে বুঝতে হবে তা কেবলই আল্লাহর দয়া। সুবহানাল্লাহ্! 'জান্নাতই মাবরূর হজের প্রতিদান!'

---

[152] নসবুর-রায়াহ : (৩/২৩)।

তৃতীয় অধ্যায়: ইহরাম, হজ-উমরার শুরু

- ইহরাম
- ইহরামের মীকাত
- ইহরামের সুন্নাতসমূহ
- তালবিয়ার বর্ণনা
- ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ
- ইহরাম অবস্থায় অনুমোদিত কাজ ও বিষয়

ইহরাম

ইহরামের সংজ্ঞা

ইহরাম বাঁধার মধ্য দিয়ে হজ ও উমরার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। ইহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ করা। হজ ও উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যখন হজ বা উমরা কিংবা উভয়টি পালনের উদ্দেশ্যে নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার ওপর কতিপয় হালাল ও জায়েয বস্তুও হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই এ প্রক্রিয়াটিকে ইহরাম বলা হয়।

শুধু হজ বা উমরার সংকল্প করলেই কেউ মুহরিম হবে না। যদিও সে নিজ দেশ থেকে সফর শুরুর সময় হজের সংকল্প করে। তেমনি শুধু সুগন্ধি ত্যাগ অথবা তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করলেই মুহরিম হবে না। এ জন্য বরং তাকে হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করার নিয়ত করতে হবে।

তাই হজ ও উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি গোসল ও পবিত্রতা অর্জন সম্পন্ন করে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন, অতঃপর হজ অথবা উমরা কিংবা উভয়টি শুরুর নিয়ত করবেন। যদি তামাত্তুকারী হন, তাহলে বলবেন,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً. (লাব্বাইকা উমরাতান)

তবে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিবেন, এ উমরা থেকে হালাল হবার পর এ সফরেই হজের ইহরাম করব। যদি কিরানকারী হন, তাহলে বলবেন,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. (লাব্বাইকা উমরাতান ও হাজ্জান)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,[153]

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

আর যদি ইফরাদকারী হন, তাহলে বলবেন,

لَبَّيْكَ حَجًّا. (লাব্বাইকা হাজ্জান)

পক্ষান্তরে যদি উমরা পালনকারী হন, তাহলে বলবেন,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً. (লাব্বাইকা উমরাতান)

এরপর তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন। হজ পালনকারী ব্যক্তি যদি অসুখ কিংবা শত্রু অথবা অন্য কোনো কারণে হজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করেন, তাহলে নিজের ওপর শর্তারোপ করে বলবেন,

اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي (আল্লাহুম্মা মাহিল্লী হাইছু হাবাসতানী)

“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যেখানে রুখে দিবেন, সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।”[154] অথবা বলবে,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، وَمَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي.

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ওয়া মাহিল্লী মিনাল আরদি হাইছু তাহবিসুনী)

‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, যেখানে তুমি আমাকে আটকে দিবে,

---

[153] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৩২।

[154] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০৭।

সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।’[155] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুবা‘আ বিন্ত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু কে এমনই শিখিয়েছেন।

নাবালকের ইহরাম

মুহরিম ব্যক্তি যদি ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী ও বোধসম্পন্ন বালক হয়, তাহলে সে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিহার করে ইহরামের কাপড় পরিধান করে নিজেই ইহরাম বাঁধবে। হজ বা উমরার যেসব আমল সে নিজে করতে পারে, নিজে করবে। অবশিষ্টগুলো অভিভাবক তার পক্ষ থেকে আদায় করবেন।

বালক যদি ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী বা বোধসম্পন্ন না হয়, তাহলে অভিভাবক তার শরীর থেকে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলে ইহরামের কাপড় পরিধান করাবেন। অতঃপর তার পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধবেন এবং তাকে নিয়ে হজের সকল আমল সম্পন্ন করবেন।

ইহরামের বিধান

ইহরাম হজের অন্যতম রুকন বা ফরয। ইহরাম ছাড়া হজ কিংবা উমরা- কোনটিই সহীহ হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

“সব কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই

---

[155] নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬৬।

পাবে যা সে নিয়ত করে।”[156] আর হজ শুরু করার নিয়তের নামই ইহরাম। অতএব, ইহরামের নিয়ত ছাড়া হজ সহীহ হবে না।

কেউ নফল হজ বা নফল উমরার ইহরাম বাঁধলে তার ওপর তাও পূরণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“আর তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা পূর্ণ কর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৬]

হজ বা উমরা পালনকারীগণ ইহরামের কাপড় খুলে ফেলার সময় হওয়ার পূর্বেই তা খুলে ফেলে হালাল হয়ে যাওয়ার সংকল্প করলেও তার ইহরাম বাতিল হবে না, বরং তার ইহরাম ত্যাগই অসার কাজ হিসেবে গণ্য হবে- এতে কারো দ্বিমত নেই। সুতরাং যেকোনো ভাবে তাকে ইহরাম পরবর্তী কাজ শেষ করতে হবে।[157]

---

[156] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭।

[157] একমাত্র ইসলাম পরিত্যাগ করা ছাড়া অন্য কিছু ইহরামের জন্য অন্তরায় নয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেলে তার ইহরাম বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَلِقَآءِ ٱلۡأٓخِرَةِ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡۚ هَلۡ يُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٤٧ ﴾ [الاعراف: ١٤٧]

“আর যারা আমার আয়াতসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাতে মিথ্যারোপ করেছে তাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে। তারা যা করে তা ছাড়া কি তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে?” এরপর যদি সে তাওবা করে এবং ইসলামে ফিরে আসে, তবে

ইহরামের মীকাত

মীকাত শব্দের অর্থ, নির্ধারিত সীমারেখা। স্থান বা কালের নির্ধারিত সীমারেখাকে মীকাত বলে। অর্থাৎ হজ বা উমরা পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ইহরাম ছাড়া যে স্থান অতিক্রম করা যায় না অথবা যে সময়ের পূর্বে হজের ইহরাম বাঁধা যায় না সেটাই মীকাত। আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যেসব বিষয়ের সম্মানের নির্দেশ দিয়েছেন যথার্থভাবে সেগুলোর সম্মান প্রদর্শন করা ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত এবং কল্যাণ অর্জনের পথ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ۝٣٢﴾ [الحج: ٣٢]

“এবং যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করবে, তাদের হৃদয়ের তাকওয়ার কারণেই তা করবে।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩২] মহান আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন বাইতুল্লাহ’র সম্মানার্থে বেশ দূর থেকে ইহরাম বেঁধে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে তার দিকে ছুটে যাওয়ার জন্যই হজ বা উমরার মীকাতসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে মীকাতের বিবরণ দেওয়া হলো।

প্রথম: মীকাতে যামানী অর্থাৎ কালবিষয়ক মীকাত

মীকাতে যামানী বলতে সেই সময়সমূহকে বুঝায় যার বাইরে ওযর ছাড়া হজের কোনো আমলই সহীহ হয় না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

তাকে হজ বা উমরা করার জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধতে হবে। কেননা, ইসলাম ত্যাগের কারণে তার আগের ইহরাম বাতিল হয়ে গেছে।

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [البقرة: ١٩٧]

“হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]

এ নির্দিষ্ট মাসগুলো হলো, পূর্ণ শাওয়াল ও যিলকদ এবং কারো কারো মতে যিলহজের ১০ তারিখ পর্যন্ত হজের মাস। কিন্তু বিশুদ্ধ মতানুসারে যিলহজ মাসের পুরোটিও হজের মাস। কেননা হজের কিছু কাজ যেমন পাথর নিক্ষেপ, মিনায় রাত্রি যাপন ইত্যাদি রুকন ১০ জিলহজের পরে আইয়ামে তাশরীকে আদায় করা হয়। শাওয়াল মাসের চাঁদ উদয় হওয়ার পূর্বে হজের ইহরাম বাঁধা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী।

কালবিষয়ক মীকাত সম্পর্কে কিছু বিধান ও সতর্কিকরণ

১. কালবিষয়ক মীকাত কেবল হজের জন্য। উমরার জন্য কালবিষয়ক কোনো মীকাত নেই। সারা বছরই উমরা করা যায়। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল-বাকারা’র ১৯৭ নং আয়াতে হজের সময় নির্দিষ্ট করেছেন, উমরার কোনো সময় নির্দিষ্ট করেন নিপ্ম এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের মাসসমূহ ছাড়া অন্য মাসে উমরা পালনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

«فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي»

“রমযানে উমরা করা হজ অথবা তিনি বলেছেন, আমার সাথে

হজ করার সমতুল্য।”[158]

২. হজের মাস শুরু হওয়ার আগে হজের ইহরাম সহীহ নয়। আল্লাহ তা‘আলা হজের মাসসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইহরাম যেহেতু হজেরই একটি আমল, তাই হজের সময়ের আগে এটি সহীহ হবেনা। কেউ যদি হজের মাস অর্থাৎ শাওয়ালের চাঁদ উদয়ের আগেই হজের ইহরাম বাঁধে তবে তার সে ইহরাম বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হজের ইহরাম হবে না, বরং তা উমরার ইহরাম হিসেবে গণ্য হবে। যেমন, সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার আগে কেউ সালাত আদায় করলে তা নফল হিসাবে গণ্য করা হয়।

৩. হজের কোনো আমল ওযর ছাড়া যিলহজ মাসের পরে পালন করা জায়েয নয়। যদি সঙ্গত ওযর থাকে তবে ভিন্ন কথা। যেমন, নিফাসবতী মহিলা যিলহজ মাসে পবিত্র না হলে তিনি তাওয়াফে ইফাযা অর্থাৎ ফরয তাওয়াফ যিলহজ মাসের পরে আদায় করতে পারবেন। আর কারো মাথায় জখম থাকলে তা ভালো হওয়া পর্যন্ত তিনি তার মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা বিলম্বিত করতে পারবেন। অর্থাৎ যিলহজ মাসের পরেও করতে পারবেন।

দ্বিতীয়: মীকাতে মাকানী বা স্থানবিষয়ক মীকাত

হজ ও উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির ইহরাম বাঁধার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেগুলোকে মীকাতে মাকানী বা স্থানবিষয়ক মীকাত বলা হয়।

---

[158] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫৬।

মীকাতে মাকানী পাঁচটি। যথা:

১. যুল-হুলাইফা। মসজিদে নববীর দক্ষিণে ৭ কি.মি. এবং মক্কা থেকে উত্তরে ৪২০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত, যা আবইয়ারে আলী নামে পরিচিত। এটি মদীনাবাসী এবং এ পথে যারা আসেন তাদের মীকাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মীকাত থেকে হজের ইহরাম বেঁধেছেন। বাংলাদেশী হাজীগণও যারা আগে মদীনা শরীফ যাবেন, তারা মদীনার কাজ সমাপ্ত করে মক্কা যাবার পথে এ মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবেন।

২. জুহফা। রাবেগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি নিশ্চিহ্ন জনপদ, যা মক্কা থেকে ১৮৭ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। এটি সিরিয়া, মিসর ও মরক্কো অধিবাসীদের মীকাত। জুহফার নিদর্শনাবলি বিলীন হয়ে যাবার কারণে বর্তমানে লোকেরা মক্কা থেকে ২০৪ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত রাবেগ নামক স্থান থেকে ইহরামের নিয়ত করে।

৩. ইয়ালামলাম। যা সা'দিয়া নামেও পরিচিত। মক্কা থেকে ১২০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিতপ্ন এটি ইয়ামানবাসী ও পাক-ভারত-বাংলাদেশসহ প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্য থেকে আগমনকারীদের মীকাত।

৪. কারনুল মানাযিল। যা আস-সাইলুল কাবীর নামেও পরিচিত। মক্কা থেকে ৭৫ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। এটি নজদ ও তায়েফবাসী এবং এ পথে যারা আসেন তাদের মীকাত।

৫. যাতু ইর্ক। বর্তমানে একে দারিবাহ নামেও অভিহিত করা হয়। মক্কা থেকে পূর্ব দিকে ১০০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। এটি প্রাচ্যবাসী তথা ইরাক, ইরান এবং এর পরবর্তী দেশগুলোর অধিবাসীদের

মীকাত। বর্তমানে এ মীকাতটি পরিত্যক্ত। কারণ, ঐ পথে বর্তমানে কোনো রাস্তা নেই। স্থল পথে আসা পূর্বাঞ্চলীয় হাজীগণ বর্তমানে সাইলুল কাবীর অথবা যুল-হুলাইফা থেকে ইহরাম বাঁধেন।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে এই মীকাতসমূহের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহফা, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম এবং নজদবাসীদের জন্য কার্নকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।"[159]

অনুরূপভাবে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাকবাসীদের জন্য যাতু ইর্ককে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।"[160]

স্থান বিষয়ক মীকাত সম্পর্কে কিছু বিধান ও সতর্কিকরণ

১. হজ ও উমরা আদায়কারীর জন্য ইহরামের নিয়ত না করে মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নয়। যদি কেউ ইহরাম না বেঁধে মীকাত

---

[159] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮১।

[160] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৩৯।

অতিক্রম করে ভেতরে চলে আসে তার উচিৎ হবে মীকাতে ফিরে গিয়ে ইহরামের নিয়ত করা। এমতাবস্থায় তার ওপর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ‘দম’ দেওয়া ওয়াজিব হবে না। যদি সে মীকাতে ফিরে না গিয়ে যেখানে আছে সেখান থেকে ইহরামের নিয়ত করে, তাহলে তার হজ-উমরা হয়ে যাবে বটে তবে তার ওপর ‘দম’ দেওয়া ওয়াজিব হবে। কেননা সে অন্তরে হজ বা উমরা অথবা উভয়টার ইচ্ছা রেখেই মীকাত অতিক্রম করেছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا

“কেউ যদি তার হজের কোনো আমল ভুলে যায় বা ছেড়ে দেয় সে যেন পশু যবেহ করে।”[161]

২. মীকাত থেকে ইহরামের নিয়ত করার বিধান মীকাত অতিক্রমকারী সবার জন্য প্রযোজ্য। তারা সেখানকার অধিবাসী হোক বা না হোক। কেননা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»

“এগুলো তাদের জন্য এবং যারা অন্যত্র থেকে ঐ পথে আসে হজ ও উমরা আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে তাদের জন্য।”[162]

৩. যদি কারো পথে দু’টি মীকাত পড়ে, তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তিনি দ্বিতীয় মীকাতে পৌঁছে ইহরাম বাঁধতে পারবেন। বাংলাদেশ থেকে মদীনা হয়ে মক্কায় গমনকারী হাজীগণ এই মাসআলার আওতায়

---

[161] মুআত্তা মালেক (১/৪১৯); দারাকুতনী : (২/২৪৪); বাইহাকী : (৫/১৫২)।

[162] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮১।

পড়েন। তারা জেদ্দা বিমান বন্দরের পূর্বে যে মীকাত আসে সেখান থেকে ইহরাম না বেঁধে মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে যে মীকাত পড়ে (যুল হুলায়ফা) সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে থাকেন।

৪. যদি কোনো ব্যক্তি এমন পথ দিয়ে যায় যেখানে কোনো মীকাত নেই, তবে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী মীকাত বরাবর পৌঁছলে তার ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। বসরা ও কুফা জয় লাভের পর এই দুই শহরের অধিবাসীরা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিলকে মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু এটা আমাদের পথ থেকে অনেক দূরে। যদি আমরা সেখানে যেতে চাই তবে আমাদের অনেক কষ্ট হবে। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ.

“তোমরা তোমাদের পথে কারনুল মানাযিল বরাবর ইহরাম বাঁধার স্থান দেখ, এরপর তিনি ‘যাতু ইরক’ কে তাদের মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করে দিলেন।”[163]

৫. যখন কোনো হজ বা উমরাকারী বিমান বা জাহাজে সফর করবেন, তখন নিকটতম মীকাতের বরাবর হওয়ার সাথে সাথে তার ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ, বিশেষ করে যারা বিমান আরোহী। কারণ, বিমানের গতি অনেক বেশি।

---

[163] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩১।

৬. যদি কোনো মুহরিম স্থানবিষয়ক মীকাতে আসার পূর্বেই ইহরাম বাঁধে, তাহলে তার ইহরাম সহীহ হবে, তবে তা হবে সুন্নাত পরিপন্থী। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম করেন নিপ্ম উম্মতকেও এ রকম শিক্ষা দেন নি। এ থেকে বুঝা যায়, মীকাতে আগমনের পূর্বেই ইহরাম বাঁধা কোনো সাওয়াব বা ফযীলতের কাজ নয়।

৭. যে ব্যক্তি মীকাত না চিনেই জেদ্দায় পৌঁছে এদিকে তার পক্ষে আবার মীকাতে ফিরে আসাও সম্ভব নয়, তার জন্য জেদ্দাতেই ইহরাম বেঁধে নেওয়া যথেষ্ট হবে।

৮. হজ ও উমরা পালন করবে না- এমন ব্যক্তি যদি ইহরাম বাঁধা ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল হজ ও উমরা পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্যই মীকাত অতিক্রমের পূর্বে ইহরাম বাঁধা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এগুলো তাদের জন্য এবং যারা অন্যত্র থেকে হজ ও উমরা আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে ঐ পথে আসে তাদের জন্য।'[164]

৯. যদি কোনো হাজী মুআল্লিমের কথা অনুযায়ী প্রথমে মদীনা যাওয়ার ইচ্ছা করেন, কিন্তু জেদ্দায় অবতরণের পর তার কাছে প্রতীয়মান হয়, হজের আগে তার পক্ষে মদীনায় যাওয়া সম্ভব নয়, তাহলে তিনি জেদ্দা থেকেই হজের ইহরাম বাঁধবেন। এ কারণে তাকে দম দিতে হবে না।

---

[164] প্রাগুক্ত।

১০. যাদের আবাস মীকাতের সীমারেখার ভেতর, যেমন 'বাহরাহ' ও 'শারায়ে' এর অধিবাসীগণ, তারা নিজ নিজ আবাসস্থল থেকেই হজ ও উমরার ইহরাম বাঁধবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ.»

"যে ব্যক্তি মীকাতসমূহের ভেতরে থাকে তার আবাসস্থলই তার ইহরামের স্থান।"[165]

১১. যিনি মক্কায় অবস্থান করছেন, তিনি হজ করতে ইচ্ছে করলে মক্কা থেকেই হজের ইহরাম বাঁধবেন। চাই তিনি মক্কার অধিবাসী হোন বা না হোন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا».

"এমনকি মক্কাবাসীরা মক্কা থেকেই হজের ইহরাম বাঁধবে।"[166]

তাছাড়া 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় তাঁর সাথে আসা সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে তাদের অবস্থানস্থল 'আবতাহ' থেকেই ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[167] তারা তামাত্তু হজ করেছিলেন। উমরার জন্য তারা বাইরে থেকে ইহরাম বাঁধলেও হজের জন্য মক্কায় তাদের আবাসস্থল থেকে ইহরাম বেঁধেছেন।

---

[165] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮১।

[166] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮১।

[167] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৪।

১২. মক্কায় অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তির জন্য হারামের সীমারেখার ভেতর থেকে উমরার ইহরাম বাঁধা জায়েয হবে না। তাকে হারামের সীমানার বাইরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন উমরা করতে চাইলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর ভাই আবদুর রহমানকে বললেন,

«اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ».

"তুমি তোমার বোনকে হারামের বাইরে নিয়ে যাও, যাতে সে উমরার ইহরাম বাঁধতে পারে।"[168]

১৩. বাইরের লোক যদি হজ করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে ইহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করে ফেলে, তাহলে তারা মীকাতের ভেতরে ঢুকে 'তান'ঈমে' অবস্থিত মসজিদে আয়েশায় গিয়ে হজের ইহরাম বাঁধলে চলবে না। কেননা মসজিদে আয়েশা হারাম এলাকার অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের উমরার মীকাত। বাইরের লোকদের জন্য হজের মীকাত নয়।

১৪. ইহরাম বাঁধার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। তাই হায়েয ও নিফাসবতী মহিলা বা অনুরূপ যে কেউ অপবিত্র অবস্থায় থাকলেও নির্দ্বিধায় হজ বা উমরার ইহরাম বাঁধতে পারবেন।

ইহরামের সুন্নাতসমূহ

ইহরাম বাঁধার পূর্বে নিচের বিষয়গুলো সুন্নাত:

---

[168] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১১।

১. নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, বগল ও নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ».

“পাঁচটি জিনিস ফিতরাতের অংশ: খাতনা করা, ক্ষৌরকার্য করা, বগলের চুল উপড়ানো, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা।”[169]

ফিকহবিদগণ বলেছেন, এই আমলগুলো ইবাদতের মনোরম পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الإِبْطِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা ও বগলের চুল উপড়ানোর সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমরা যেন চল্লিশ দিনের বেশি এসব কাজ ফেলে না রাখি।”[170]

মাথার চুল ছোট না করে যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দিন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম ইহরামের পূর্বে মাথার চুল কেটেছেন বা মাথা মুণ্ডন করেছেন বলে কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, ইহরামের আগে বা পরে কখনো দাড়ি কামানো যাবে না।

---

[169] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৭।

[170] নাসাঈ, হাদীস নং ১৪; তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৫৯।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ».

“তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচারণ করো। দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ ছোট করো।”[171]

২. গোসল করা। যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ».

“তিনি দেখেছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পাল্টিয়েছেন এবং গোসল করেছেন।”[172]

এই গোসল পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য, এমনকি নিফাস ও হায়েযবতীর জন্যও সুন্নাতপ্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যুল-হুলায়ফায় সন্তান প্রসবের পর বলেন,

«اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي».

“তুমি গোসল কর, কাপড় দিয়ে পট্টি বাঁধ এবং ইহরাম বাঁধো।”[173]

গোসল করা সম্ভব না হলে অযু করা। অযু-গোসল কোনোটিই যদি করার সুযোগ না থাকে তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে হবে না। কেননা গোসলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিচ্ছন্নতা

---

[171] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৫।

[172] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৩০।

[173] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

অর্জন ও দুর্গন্ধমুক্ত হওয়া। তায়াম্মুম দ্বারা এই উদ্দেশ্য হাসিল হয় না।

৩. ইহরাম বাঁধার পূর্বে শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে এসেছে,

كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং কুরবানীর দিন বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফের পূর্বে মিশকযুক্ত সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।"[174]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুগন্ধি তাঁর মাথা ও দাড়িতে অবশিষ্ট থাকত, যেমনটি অনুমিত হয় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার উক্তি থেকে। তিনি বলেন,

كُنْتُ أُطَيِّبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيب فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ».

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কাছে থাকা উত্তম সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম এমনকি আমি তাঁর মাথা ও দাড়িতে সুগন্ধির

---

174 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯১। কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার আগেই হাজীগণ হালাল হয়ে সাধারণ পবিত্র পোশাক পরে থাকেন। এ সময় ইহরাম অবশিষ্ট থাকে না বিধায় সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত। জ্ঞাতব্য যে, ইহরাম থাকা অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না।

চকচকে ভাব দেখতে পেতাম।”[175] তিনি আরো বলেন,

«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» .

“আমি যেন মুহরিম অবস্থায় রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিঁথিতে মিশকযুক্ত সুগন্ধির চকচকে ভাব লক্ষ্য করছি।”[176]

লক্ষণীয়, ইহরাম বাঁধার পর শরীরের কোনো অংশে সুগন্ধির প্রভাব রয়ে গেলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা কোনোভাবেই জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিমকে সুগন্ধিযুক্ত কাপড় পরিধান পরিহার করতে বলেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘ইহরাম অবস্থায় কাপড় পরতে আমাদের কী করণীয়? উত্তরে তিনি বলেন, ‘তোমরা জাফরান এবং ওয়ারস (এক প্রকার সুগন্ধি) লাগানো কাপড় পরিধান করো না।’[177]

৪. সেলাইবিহীন সাদা লুঙ্গি ও সাদা চাদর পরা এবং এক জোড়া জুতো বা স্যান্ডেল পায়ে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ، وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ».

“তোমাদের প্রত্যেকে যেন একটি লুঙ্গি, একটি চাদর এবং এক জোড়া

[175] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯২৩।

[176] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯০।

[177] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭৭।

চপ্পল পরিধান করে ইহরাম বাঁধে।"[178]

সাদা কাপড় পুরুষের সর্বোত্তম পোশাক। তাই পুরুষের ইহরামের জন্য সাদা কাপড়ের কথা বলা হয়েছে। ইহরামের ক্ষেত্রে মহিলার আলাদা কোনো পোশাক নেই। শালীন ও ঢিলে-ঢালা, পর্দা বজায় থাকে এ ধরনের যেকোনো পোশাক পরে মহিলা ইহরাম বাঁধতে পারে। ইহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরা ও মাথা আবৃত করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ হলেও মহিলার জন্য নিষিদ্ধ নয়।[179]

তবে ইহরাম অবস্থায় নিকাব বা অনুরূপ কোনো পোশাক দিয়ে সর্বক্ষণ চেহারা ঢেকে রাখা বৈধ নয়। হাদীসে এসেছে, 'মহিলা যেন নেকাব না লাগায় ও হাতমোজা না পরে।'[180] তবে এর অর্থ এ নয় যে, বেগানা পুরুষের সামনেও মহিলা তার চেহারা খোলা রাখবে। এ ক্ষেত্রে আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মাথার উপর থেকে চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে চেহারা ঢেকে মহিলাগণ বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করবে।[181]

৫. সালাতের পর ইহরাম বাঁধা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের পর ইহরাম বেঁধেছেন। জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে

---

[178] মুসনাদ, হাদীস নং ৪৮৯৯; ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২৬০১।

[179] এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল মুনযির ও ইবন আবদিল বার ইমামদের ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। আল-ইজমা : ১৮, আত-তামহীদ, (১৫/১০৪)।

[180] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮।

[181] আত-তামহীদ : (১৫/১০৮)।

সালাত আদায় করে উটের পিঠে আরোহণ করলেন এবং তাওহীদের বাণী: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক) বলে ইহরাম বাঁধলেন।'[182]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলাইফাতে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। এরপর উটটি যখন তাঁকে নিয়ে যুল-হুলাইফার মসজিদের পাশে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি সেই কালেমাগুলো উচ্চারণ করে ইহরাম বাঁধলেন।'[183]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকীক উপত্যকায় বলতে শুনেছি,

«أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ».

"আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক রাতের বেলায় আমার কাছে এসে বলল, এই বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন, একটি হজের মধ্যে একটি উমরা।"[184]

এসব হাদীসের আলোকে একদল আলেম বলেন, ইহরাম বাঁধার পূর্বে দুই রাকাত ইহরামের সালাত আদায় করা সুন্নাতপ্ন আরেকদল আলেমের মতে ইহরামের জন্য কোনো বিশেষ সালাত নেই। তারা বলেছেন, ইহরাম বাঁধার সময় যদি ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়,

---

[182] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[183] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৫১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮৪।

[184] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৪।

তাহলে হজ ও উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ফরয সালাত আদায়ের পর ইহরাম বাঁধা উত্তম। অন্যথায় সালাত ছাড়াই ইহরাম বাঁধবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয সালাতের পর ইহরাম বেঁধেছিলেন। আর তাঁর সালাতে এমন কোনো লক্ষণ ছিল না, যা ইহরামের বিশেষ সালাতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

তবে সঠিক কথা হচ্ছে, ইহরামের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো সালাত নেই। তাই ইহরাম বাঁধার সময় যদি ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তাহলে ফরয সালাত আদায়ের পর ইহরাম বাঁধবে। অন্যথায় সম্ভব হলে তাহিয়্যাতুল অযু হিসেবে দুই রাকাত সালাত পড়ে ইহরামে প্রবেশ করবে।[185]

৬. তালবিয়ার শব্দগুলো বেশি বেশি উচ্চারণ করা। কেননা তালবিয়া হজের শ্লোগান। তালবিয়া যত বেশি পাঠ করা যাবে, তত বেশি সাওয়াব অর্জিত হবে।

তালবিয়াহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত তালবিয়ার ভাষ্য হলো,

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ

---

[185] ইবন বায, ফাতাওয়া মুহিম্মাহ তাতাআল্লাকু বিল হাজ্জি ওয়াল উমরা : পৃ. ৭; ইবন তাইমিয়া, মাজমু‘ ফাতাওয়া : (২৬/১০৮); শারহু উমদাতুল ফিকহ : (১/৪১৭); ইবন উসাইমিন, আল-মানহাজ লিমুরীদিল উমরাতি ওয়াল হাজ্জ : পৃ. ২৩।

شَرِيكَ لَكَ».

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারীকা লাক)।

“আমি হাযির, হে আল্লাহ, আমি হাযির। তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা ও নি‘আমত তোমার এবং রাজত্বও, তোমার কোনো শরীক নেই।”[186]

উপর্যুক্ত তালবিয়াটিই ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শব্দমালায় আর কিছু যোগ করতেন না।’[187]

পক্ষান্তরে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা মতে, তালবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ (লাব্বাইকা ইলাহাল হক্কি লাব্বাইক) ‘আমি হাযির, সত্য ইলাহ! আমি হাযির’।[188] বিদায় হজে কোনো কোনো সাহাবী উপর্যুক্ত তালবিয়ার পরে لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ (লাব্বাইকা যাল মা‘আরিজ) বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে কিছু বলেন নি।[189] আবার

---

[186] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৯।

[187] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯১৫।

[188] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯২০; নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৫২।

[189] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৪৭৫।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন,[190]

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

(লাব্বাইক আল্লহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইক, ওয়াল খইরু বিইয়াদাইক, লাব্বাইকা ওয়ার রগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমল।)

"আমি হাযির হে আল্লাহ আমি হাযির। আমি হাযির একমাত্র তোমারই সন্তুষ্টিকল্পে। কল্যাণ তোমার হাতে, আমল ও প্রেরণা তোমারই কাছে সমর্পিত।"

উপরোক্ত তালবিয়াগুলি পাঠ করাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের ব্যবহৃত শব্দমালার বাইরে যাওয়া যাবে না।

তালবিয়া পড়ার নিয়ম:

পুরুষগণ ইহরাম বাঁধার সময় ও পরে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ - أَوْ قَالَ - بِالتَّلْبِيَةِ».

"আমার নিকট জিবরীল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম[191] এসে আদেশ দিলেন। আমি যেন আমার সাথিদেরকে তালবিয়া দ্বারা তাদের

---

[190] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮৪।

[191] এখানে হাদীসে জিবরীল নামের পরে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছে।

কণ্ঠস্বর উচুঁ করতে নির্দেশ দিই।”[192]

পুরুষ-মহিলা সকলের ক্ষেত্রেই তালবিয়া পাঠ ও অন্যান্য যিক্‌রসমূহের গুরুত্ব সমান। পার্থক্য এতটুকু যে, মহিলারা পুরুষের মত উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে না। নিজে শুনতে পারে এতটুকু আওয়াযে মহিলারা তালবিয়া পাঠ ও অন্যান্য যিকিরসমূহ করবে। ইবন আবদুল বার বলেন, আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মহিলাদের ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর উঁচু না করাই সুন্নাতপ্ম মহিলারা এমনভাবে তালবিয়া পাঠ করবেন যেন তারা শুধু নিজেরাই শুনতে পান। তাদের আওয়াযে ফিতনার আশঙ্কা আছে বিধায় তাদের স্বর উচুঁ করাকে অপছন্দ করা হয়েছে। এ কারণে তাদের জন্য আযান ও ইকামাত সুন্নাত নয়। সালাতে ভুল শুধরে দেওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সুন্নাত হলো তাছফীক তথা মৃদু তালি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।[193] অথচ পুরুষদের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে, তাসবীহ বা সুবহানাল্লাহ্ বলে ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মহিলারা স্বর উচ্চ করে তালবিয়া পাঠ করবে না।[194]

উমরাকারী ব্যক্তি বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে। আর হজ পালনকারীগণ ব্যক্তি কুরবানীর দিন জামরাতুল ‘আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্তে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে। ফযল ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

---

[192] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮১৪।

[193] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৪।

[194] সাঈদ আবদুল কাদীর : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

«لَمْ يَزَلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল ‘আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতেন।”[195]

তালবিয়ার পাঠের ফযীলত

১. তালবিয়া পাঠ হজ-উমরার শ্লোগান। কেননা তালবিয়া পাঠের মধ্য দিয়ে হজ ও উমরায় প্রবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَمَرَنِيْ جِبْرِيْلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فِي الإِهْلاَلِ، فَإِنَّهُ مِنْ شِعَارُ الْحَجِّ».

“তালবিয়াতে স্বর উঁচু করার জন্য জিবরীল আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, এটি হজের বিশেষ শ্লোগান।”[196]

যায়েদ ইবন খালিদ জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ لِيْ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ أَنْ يَّرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بَالتَّلْبِيَّةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِالْحَجِّ».

“জিবরীল আমার নিকট আসলেন অতঃপর বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন আপনি আপনার সাথীদেরকে নির্দেশ প্রদান

[195] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৮১।

[196] ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ২৬৩০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৩১৪।

করেন যে, তারা যেন তালবিয়া দ্বারা স্বর উঁচু করে। কারণ, এটি হজের শ্লোগানভুক্ত।”[197]

২. তালবিয়া পাঠ হজ-উমরার শোভা বৃদ্ধি করে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَعَنَ اللهُ فُلاَنًا عَمَدُوْا إِلَى أَعْظَمَ أَيَّامِ الْحَجِّ فَمَحَوْا زِيْنَتَهُ وَإِنَّمَا زِيْنَةُ الْحَجِّ التَّلْبِيَّةُ»

“অমুকের ওপর আল্লাহর অভিশাপ! তারা হজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনের ইচ্ছা করে তার শোভা মিটিয়ে দিল। আর নিশ্চয় হজের শোভা হলো তালবিয়া।”[198]

৩. যে হজে উচ্চস্বরে তালবিয়া করা হয় সেটি সর্বোত্তম হজ। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো হজটি সবচেয়ে উত্তম? অন্য বর্ণনায় এসেছে, জিজ্ঞেস করা হলো,

أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «الْعَجُّ ، وَالثَّجُّ».

“হজের মধ্যে কোনো আমলটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা এবং পশুর রক্ত প্রবাহিত করা।”[199]

---

[197] তাবরানী ফিল কাবীর, হাদীস নং ৫১৭২; অনুরূপ ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯২৩।

[198] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৮৭০।

[199] তিরমিযী, হাদীস নং ৮২৭।

৪. তালবিয়া পাঠকারীর সাথে পৃথিবীর জড় বস্তুগুলোও তালবিয়া পড়তে থাকে। সাহল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا ، عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ».

"প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি যে তালবিয়া পড়ে তার সাথে তার ডান-বামের গাছ-পাথর থেকে নিয়ে সবকিছুই তালবিয়া পড়তে থাকে। যতক্ষণ না ভূ-পৃষ্ঠ এদিক থেকে ওদিক থেকে অর্থাৎ ডান থেকে এবং বাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"[200]

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

হজ ও উমরার ইহরামের ফলে যেসব বৈধ কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায় সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ।

কেবল পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ।

কেবল মহিলার জন্য নিষিদ্ধ।

পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ বিষয় সাতটি

প্রথমত. মাথার চুল ছোট করা বা পুরোপুরি মুণ্ডানোপ্ঃআল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[200] মুস্তাদরাক হাকেম, হাদীস নং ১৬৫৬।

﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“আর তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না, যতক্ষণ না পশু তার যথাস্থানে পৌঁছে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

তবে অসুস্থতা কিংবা ওযরের কারণে ইহরাম অবস্থায় মাথার চুল ফেলতে বাধ্য হলে কোনো পাপ হবে না, তবে তার ওপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে। কা‘ব ইবন ‘উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন আমার মুখে উঁকুন গড়িয়ে পড়ছিল। তা দেখে তিনি বললেন, তুমি এতটা কষ্ট পাচ্ছ এটা আমার ধারণা ছিল না। তুমি কি ছাগল যবেহ করতে পারবে? আমি বললাম, না। অতঃপর নাযিল হলো,

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোনো কষ্ট থাকে তবে সিয়াম কিংবা সদকা অথবা পশু যবেহ এর মাধ্যমে ফিদয়া দিবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৯১] এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তাকে বলেন,

«احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ».

“তুমি তোমার মাথা মুণ্ডন কর এবং তিন দিন সিয়াম পালন কর, অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাবার দান কর, নতুবা একটি ছাগল যবেহ

কর।”[201]

এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ».

“তিন দিন সিয়াম পালন করতে হবে, কিংবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাতে হবে। প্রত্যেক মিসকীনের জন্য অর্ধ সা‘ (এক কেজি ২০ গ্রাম) খাবার।”[202]

সুতরাং মাথা মুণ্ডনের ফিদয়া তিনভাবে দেওয়া যায়: ছাগল যবেহ করা অথবা তিনটি সাওম পালন করা কিংবা ছয়জন মিসকীনকে পেট পুরে খাওয়ানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা‘ব ইবন উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন,

«أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً ، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ».

“সে যেন ছয়জন মিসকীনকে খাবার দিবে, কিংবা একটি ছাগল যবেহ করবে অথবা তিনদিন সাওম পালন করবে।”[203]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, সিয়ামের সংখ্যা হচ্ছে তিনটি। সদকার পরিমাণ হচ্ছে ছয় জন মিসকীনের জন্য তিন সা‘ (সাত কেজি ৩০ গ্রাম)। প্রতি মিসকীনের জন্য অর্ধ সা’ (এক কেজি ২০ গ্রাম)। আর পশু যবেহের ইচ্ছা করলে ছাগল বা তার চেয়ে বড়

---

[201] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০১।

[202] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০১; অনুরূপ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫১৭।

[203] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০১।

যেকোনো পশু যবেহ করতে হবে। এ তিনটির যে কোনো একটি ফিদয়া হিসেবে প্রদানের সুযোগ রয়েছে। শরী'আত বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে পশু যবেহ করার মাধ্যমে ফিদয়ার ক্ষেত্রে এমন ছাগল হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা কুরবানীর উপযুক্ত; যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত। আলেমগণ একে 'ফিদয়াতুল আযা' তথা কষ্টজনিত কারণে ফিদয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন, কারণ আল্লাহ তা'আলা একে কুরআনুল কারীমে ﴿أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ﴾ [البقرة: ١٩٦] বলে বর্ণনা করেছেন।[204]

বিশুদ্ধ মতানুসারে পরিপূর্ণরূপে মাথা মুণ্ডন করা ছাড়া উল্লিখিত ফিদয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা পরিপূর্ণ মাথা মুণ্ডন ছাড়া হলক বলা হয় না। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় নিজের মাথায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।"[205]

বলা বাহুল্য, মাথায় শিঙ্গা লাগানোর স্থান থেকে অবশ্যই চুল ফেলে দিতে হয়েছে; কিন্তু এ কারণে তিনি ফিদয়া দিয়েছেন এ রকম কোনো প্রমাণ নেই।

মাথা ছাড়া দেহের অন্য কোনো স্থানের লোম মুণ্ডন করলে অধিকাংশ আলেম তা মাথার চুলের ওপর কিয়াস করে উভয়টিকে একই

---

[204] খালেছুল জুমান : ৭৭।

[205] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০২।

হুকুমের আওতাভুক্ত করেছেন। কারণ, মাথা মুণ্ডন করার ফলে যেমন পরিচ্ছন্নতা ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয়, তেমনি দেহের লোম ফেললেও এক প্রকার স্বস্তি অনুভূত হয়। তবে তারা কিছু ক্ষেত্রে ফিদয়ার কথা বলেছেন, কিছু ক্ষেত্রে দমের কথা বলেছেন।[206] বস্তুত এ ক্ষেত্রে দম বা ফিদয়া দেওয়া আবশ্যক হওয়ার সপক্ষে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ নেই। কিন্তু হাজীদের উচিৎ ইহরাম অবস্থায় শরীরের কোনো অংশের চুল বা লোম যেন ছেড়া বা কাটা না হয়। তারপরও যদি কোনো চুল পড়ে যায়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই।

দ্বিতীয়ত. হাত বা পায়ের নখ উপড়ে ফেলা, কর্তন কিংবা ছোট করা।

ইহরাম অবস্থায় মহিলা-পুরুষ উভয়ের জন্য এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা যারা বলেছেন তারা চুল মুণ্ডন করার হুকুমের ওপর কিয়াস করেই বলেছেন। কুরআন বা হাদীসে এ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। ইবন মুনযির বলেন, আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নখ কাটা মুহরিমের জন্য হারাম। হাত কিংবা পায়ের নখ-উভয়ের ক্ষেত্রে একই হুকুম। তবে যদি নখ ফেটে যায় এবং তাতে যন্ত্রণা হয় তবে যন্ত্রণাদায়ক স্থানটিকে ছেঁটে দেওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই। এ কারণে কোনো ফিদয়া ওয়াজিব হবে না।[207]

তৃতীয়ত. ইহরাম বাঁধার পর শরীর, কাপড় কিংবা এ দু'টির সাথে সম্পৃক্ত অন্য কিছুতে সুগন্ধি জাতীয় কিছু ব্যবহার করা।

---

[206] খালেছুল জুমান : ৮৩।

[207] মানাসিকুল হজ ওয়াল উমরা : ৪৪।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায়, মুহরিমের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَلاَ تَلْبَسُواشَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلاَ وَرْسٌ».

"তোমরা জাফরান কিংবা ওয়ারস (এক জাতীয় সুগন্ধি) লাগানো কাপড় পরিধান করবে না।"[208]

অপর এক হাদীসে তিনি আরাফায় অবস্থানকালে বাহনে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণকারী এক সাহাবী সম্পর্কে বলেন,

«وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ».

"তার কাছে তোমরা সুগন্ধি নিও না। কারণ, তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, সে তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে।"[209] অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

«وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».

"আর তোমরা তাকে সুগন্ধি স্পর্শ করাবে না। কারণ, কিয়ামত দিবসে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাকে উঠানো হবে।"[210]

সুতরাং মুহরিমের জন্য সুগন্ধি বা এ জাতীয় কিছুর ব্যবহার বৈধ নয়। যেমন পানি মিশ্রিত জাফরান, যা পানীয়ের স্বাদে ও গন্ধে প্রভাব সৃষ্টি করে, অথবা চায়ের সাথে এতটা গোলাপ জলের মিশ্রণ, যা তার স্বাদে

---

[208] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭৭।

[209] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০৬।

[210] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬৭; নাসাঈ, হাদীস নং ২৪৫৪।

ও গন্ধে পরিবর্তন ঘটায়। তেমনি মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধি মিশ্রিত সাবান ব্যবহার করবেন না।[211] ইহরামের পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধির কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে,

«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ».

"ইহরাম অবস্থাতেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার সিঁথিতে যেন মিশকের চকচকে অবস্থার দিকে তাকাচ্ছিলাম।"[212] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের পূর্বে যে মিশক ব্যবহার করেছিলেন তার চিহ্ন ইহরামের পরেও তাঁর সিঁথিতে অবশিষ্ট ছিল।

চতুর্থত. বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ».

"মুহরিম বিবাহ করবে না, বিবাহ দিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও পাঠাবে না।"[213]

সুতরাং কোনো মুহরিমের জন্য বিয়ে করা, কিংবা অলী ও উকিল হয়ে কারো বিয়ের ব্যবস্থা করা অথবা ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়া অবধি

---

[211] মানসিকুল হজ ওয়াল উমরা : ৪৭।

[212] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯০।

[213] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪০৯।

কাউকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো বৈধ নয়। মহিলা মুহরিমের জন্যও একই হুকুম।

পঞ্চমত. ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা।

আলেমদের ঐকমত্যে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর মধ্যে কেবল সহবাসই হজকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: ١٩٧]

“যে ব্যক্তি এই মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে, তার জন্য হজের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]

আয়াতে উল্লিখিত الرَّفَثُ (আররাফাসু) শব্দটি একই সাথে সহবাস ও সহবাসজাতীয় যাবতীয় বিষয়কেই সন্নিবেশ করে। সুতরাং ইহরামের অবৈধ বিষয়গুলোর মধ্যে সহবাসই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: উকুফে আরাফা বা আরাফায় অবস্থানের পূর্বে মুহরিম ব্যক্তির স্ত্রী-সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া। এমতাবস্থায় সমস্ত আলেমের মতেই তার হজ বাতিল হয়ে যাবে। তবে তার কর্তব্য হচ্ছে, হজের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীকালে তা কাজা করা। তাছাড়া তাকে দম (পশু কুরবানী) দিতে হবে। পশুটি কেমন হবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, তিনি একটি ছাগল যবেহ করবেন।[214] অন্য ইমামগণের মতে, একটি উট যবেহ করবেন।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে, উমার, আলী ও আবূ হুরায়রা রা.-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে মুহরিম থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে। তারা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, সে আপন গতিতে হজ শেষ করবে। তারপর পরবর্তী বছর হজ আদায় করবে এবং হাদী যবেহ করবে। তিনি বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, পরবর্তী বছর যখন তারা হজের ইহরাম বাঁধবে, তখন হজ শেষ করা অবধি স্বামী-স্ত্রী একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে।'[215]

মোটকথা, সর্বসম্মত মত হলো, আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে হজ বাতিল হয়ে যায়। আর বড় জামরায় পাথর মারার পর এবং হজের ফরয তাওয়াফের পূর্বে যদি কেউ স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে সকলের মত হলো, তার হজ বাতিল হবে না তবে ফিদয়া দিতে হবে। আর যদি আরাফায় অবস্থানের পর এবং বড় জামরায় পাথর মারার পূর্বে সহবাস হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছাড়া অধিকাংশ ইমামের মতে হজ নষ্ট হয়ে যাবে।[216]

দ্বিতীয় অবস্থা: আরাফায় অবস্থানের পরে, বড় জামরায় পাথর মারা এবং হজের ফরয তাওয়াফের পূর্বে যদি সহবাস সংঘটিত হয়, তবে

---

[214] খালেছুল জুমান : ১১৪।

[215] মুআত্তা মালেক, হাদীস নং, হাদীস নং ১৫১।

[216] খালেছুল জুমান : ১১৪।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, তার হজ আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু তার ওপর একটি উট যবেহ করা কর্তব্য। এ ব্যাপারে তিনি হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য থেকেই তিনি দলীল গ্রহণ করেছেন। হাদীসে এসেছে الحَجُّ عَرَفَةُ (আল-হাজ্জু আরাফাতু) অর্থাৎ হজ হচ্ছে আরাফা।[217]

পক্ষান্তরে ইমাম মালেক, শাফে‘ঈ ও আহমদসহ অধিকাংশ ফকীহর মতে তার হজ ফাসেদ। এ অবস্থায় তাকে দু’টি কাজ করতে হবে: এক. তার ওপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে। আর সে ফিদয়া আদায় করতে হবে একটি উট বা গাভি দ্বারা, যা কুরবানী করার উপযুক্ত এবং তার সব গোশত মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে; নিজে কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। দ্বিতীয়. সহবাসের ফলে হজটি ফাসিদ বলে গণ্য হবে। তবে এ হজটির অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা তার কর্তব্য এবং বিলম্ব না করে পরবর্তী বছরেই ফাসিদ হজটির কাযা করতে হবে।

তৃতীয় অবস্থা: বড় জামরায় পাথর মারা ও মাথা মুণ্ডনের পর এবং হজের ফরয তাওয়াফের পূর্বে সহবাস সংঘটিত হলে, হজটি সহীহ হিসেবে গণ্য হবে। তবে প্রসিদ্ধ মতানুসারে তার ওপর দু’টি বিষয় ওয়াজিব হবে। এক. একটি ছাগল ফিদয়া দিবেন, যার সব গোশত গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। ফিদয়া দানকারী কিছুই গ্রহণ করবে না। দুই. হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে নতুন করে ইহরাম বাঁধবেন এবং মুহরিম অবস্থায় হজের ফরয তাওয়াফের জন্য

[217] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৪৯; নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৬।

লুঙ্গি ও চাদর পরে নিবেন।[218]

ষষ্ঠত. ইহরাম অবস্থায় কামোত্তেজনাসহ স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা। যেমন চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: ١٩٧]

“যে ব্যক্তি এ মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে, তার জন্য হজের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]

আয়াতে উল্লিখিত الرَّفَثُ শব্দটি একই সাথে নানা অর্থের সন্নিবেশ করে: ১. সহবাস বা সম্ভোগ ২. সহবাস পূর্ব মেলামেশা -যেমন কামোত্তেজনার সাথে চুম্বন, স্পর্শ ও আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি। সুতরাং মুহরিমের জন্য কামোত্তেজনার সাথে স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন, স্পর্শ, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি কোনোটিই বৈধ নয়। এমনিভাবে মুহরিম অবস্থায় স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে সুযোগ করে দেয়াও বৈধ নয়। কামভাব নিয়ে স্ত্রীর প্রতি নজর করাও নিষিদ্ধ। ৩. সহবাস সম্পর্কিত কথপোকথন।[219]

আয়াতে উল্লিখিত الْفُسُوقُ (আল-ফুসুক) শব্দটি একই সাথে আল্লাহর আনুগত্যের যাবতীয় বিষয় থেকে বের হয়ে যাওয়া বুঝায়।[220]

সপ্তমত. ইহরাম অবস্থায় শিকার করা।

---

[218] মানাসিকুল হজ্জি ওয়াল উমরা : ৪৯।

[219] খালেছুল জুমান : ৭৬।

[220] খালেছুল জুমান : ৭৬।

হজ বা উমরা- যেকোনো অবস্থাতেই মুহরিমের জন্য স্থলভাগের প্রাণী শিকার নিষিদ্ধ-এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ ﴾ [المائدة: ٩٦]

"আর স্থলের শিকার তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৯৬] অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ ﴾ [المائدة: ٩٥]

"হে মুমিনগণ, ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯৫]

সুতরাং শিকারকৃত জন্তু ইহরাম অবস্থায় হত্যা করা বৈধ নয়। তবে আলেমগণ প্রাণী শিকার বলতে এমন সব প্রাণী বলে একমত পোষণ করেছেন, যার গোশত মানুষের খাদ্য এবং যা বন্য প্রাণীভুক্ত। তাই 'শিকার' বলতে এমন সব প্রাণী বুঝায়, যা স্থলভাগে বাস করে, হালাল ও প্রকৃতিগতভাবেই বন্য। যেমন হরিণ, খরগোশ ও কবুতর ইত্যাদি।

উল্লিখিত প্রাণীসমূহের শিকার যেমন নিষিদ্ধ তেমনি সেগুলোকে হত্যা করা এবং হত্যার সহায়তা করাও নিষিদ্ধ। যেমন দেখিয়ে দেওয়া, ইশারা করা বা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা। আবূ কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلٍ

فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ ، وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا ، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي ، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ ، وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ . فَقَالُوا لاَ وَاللَّهِ ، لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ . فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ، ثُمَّ رَكِبْتُ ، فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ ، وَهُمْ حُرُمٌ ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي ، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ». فَقُلْتُ نَعَمْ . فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا ، حَتَّى نَفَّدَهَا وَهْوَ مُحْرِمٌ .

“আবূ কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবীর সাথে মক্কার পথে এক জায়গায় বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আমাদের অগ্রভাগে। সাহাবীগণ ছিলেন মুহরিম আর আমি ছিলাম হালাল। তারা একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আমি তখন জুতো সেলাইয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তারা আমাকে বিষয়টি অবহিত করেন নিপ্মতবে তারা চাচ্ছিলেন যেন আমি তা দেখতে পাই। অতঃপর আমি তাকালাম এবং সেটাকে দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি আমার ঘোড়ার দিকে গেলাম এবং তার মুখে লাগাম পরালাম। তারপর আমি ঘোড়ায় চড়লাম; কিন্তু তীর-ধনুক ভুলে গেলাম। আমি তাদের বললাম, আমাকে তীর ধনুক দাও। তারা বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে এ কাজে কোনরূপ সাহায্য করতে পারব না। এতে আমি রাগান্বিত হয়ে নেমে এলাম। অতঃপর তীর-ধনুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়লাম এবং গাধার ওপর আক্রমণ করলাম। এমনকি বন্য গাধাটিকে

যবেহ করে নিয়ে এলাম। ইতোমধ্যে সেটি মরে গিয়েছিল। সকলে তা থেকে আহার করতে লেগে গেলেন। যেহেতু তারা ছিলেন মুহরিম সেহেতু পরে তাদের গাধাটি আহারের ব্যাপারে সন্দেহ হল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমি তার সামনের পা লুকিয়ে আমার সাথে নিলাম। অতঃপর আমরা তাঁকে পেয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি ইঙ্গিত করেছ বা কোনো কিছুর নির্দেশ দিয়েছ? আমি উত্তর দিলাম, না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামনের পায়াটি দিলাম। তিনি তা খেলেন। এমনকি শেষ করে ফেললেন। অথচ তিনি মুহরিম ছিলেন।”[221]

মুহরিম ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করে, তবে এর জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ

[221] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯৬। জ্ঞাতব্য, মুহরিমের সংশ্লিষ্টতায় শিকারকৃত জন্তুর ব্যাপারে তিন ধরনের বিধান হবে : প্রথম এমন জন্তু যা মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করেছে কিংবা হত্যায় শরীক হয়েছে। এমন জন্তু খাওয়া মুহরিম ও অন্য সকলের জন্য হারাম। দ্বিতীয় মুহরিমের সাহায্য নিয়ে কোনো হালাল ব্যক্তি একটি জন্তুকে হত্যা করেছে, যেমন মুহরিম ব্যক্তি শিকার দেখিয়ে দিয়েছে অথবা শিকারের অস্ত্র এগিয়ে দিয়েছে -এমন জন্তু কেবল মুহরিমের জন্য হারাম; অন্য সবার জন্য হালাল। তৃতীয় হালাল ব্যক্তি যে জন্তু মুহরিমের জন্য হত্যা করেছে, এমন জন্তুও মুহরিমের জন্য হারাম। অন্য সবার জন্য হালাল। (খালেসুল জুমান : ১২৩-১৩৬) বি.দ্র. এই রিওয়ায়েতের তরজমা বুখারী-মুসলিম মিলিয়ে করা হয়েছে।

مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ ٩٥ [المائدة: ٩٥]

"আর যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে তার বিনিময় হলো, যা হত্যা করেছে তার অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক- কুরবানীর জন্তু হিসাবে কা'বায় পৌঁছতে হবে অথবা মিসকীনকে খাবার দানের কাফফারা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন, যাতে সে নিজ কর্মের শাস্তি আস্বাদন করে। যা গত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। যে পুনরায় করবে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।'[222]

ইহরামের কারণে বৃক্ষ কর্তন মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ নয়। কারণ, এতে ইহরামে কোনো প্রকার প্রভাব সৃষ্টি হয় না। তবে তা যদি হারাম শরীফের নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে হয়, তবে মুহরিম হোক কিংবা হালাল-সকলের জন্য হারাম। এই মৌলনীতির ভিত্তিতে আরাফায় মুহরিম কিংবা হালাল, উভয়ের জন্য বৃক্ষ কর্তন বৈধ; মক্কা, মিনা ও

---

[222] সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৯৫। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি কবুতর হত্যা করে তবে তার বিনিময় হচ্ছে একটি ছাগল যবেহ করা, যা দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিবে কিংবা ছাগলর মূল্য নির্ধারণ করে সমপরিমাণ খাদ্য মিসকীনদের দিয়ে দিবে। প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' আহার প্রদান করবে অথবা প্রত্যেক মিসকীনের খাদ্যের পরিবর্তে একদিন সাওম পালন করবে। এ তিন পদ্ধতির যেকোনো একটি অবলম্বন করা যাবে। (দ্রষ্টব্য: মানাসিকুল হাজ্জি ওয়াল উমরা : ৫১।)

মুযদালিফা অবৈধ। কারণ, আরাফা হারাম শরীফের বাইরে, মক্কা, মিনা ও মুযদালিফা হারামের সীমাভুক্ত। উপরোক্ত সাতটি বিষয় মহিলা-পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ।

পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ আরো দু'টি বিষয় রয়েছে:

১. মাথা আবৃত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফায় বাহনে পিষ্ট মুহরিম ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন,

«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ.»

"তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও, তাকে দুইটি কাপড়ে কাফন দাও; কিন্তু তার মাথা আবৃত করো না।"[223]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে,

«وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ».

"তার মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করো না।"[224]

সুতরাং পুরুষ মুহরিমের জন্য পাগড়ি, টুপি ও রুমাল জাতীয় কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করা বৈধ নয়, যা তার দেহের সাথে লেগে থাকে। তেমনি মুখ আবৃত করাও নিষিদ্ধ।

২. পুরো শরীর ঢেকে নেওয়ার মতো পোশাক কিংবা পাজামার মতো অর্ধাঙ্গ ঢাকে এমন পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। যেমন জামা বা পাজামা পরিধান করা। মোটকথা, স্বাভাবিক অবস্থায় যে পোশাক

---

[223] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০৬।

[224] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০৬।

পরিধান করা হয়, তা পরিধান করা পুরুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মুহরিমের পরিধেয় পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সে জামা, পাগড়ি, মস্তকাবরণীযুক্ত লম্বা কোট, পাজামা, মোজা এবং এমন কাপড় পরিধান করতে পারবে না, যাতে জাফরান ও ওয়ারস (এক প্রকার সুগন্ধি) ব্যবহার করা হয়েছে।[225]

তবে যদি লুঙ্গি কেনার মতো টাকা না থাকে, তাহলে পাজামাই পরিধান করবে। জুতো কেনার মতো সঙ্গতি না থাকলে মোজা পরবে, সাথে অন্য কিছু পরবে না। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফার ময়দানে খুতবায় বলতে শুনেছি,

«السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الإِزَارُ وَالْخُفَافُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ».

“যে লুঙ্গি পাবে না, সে যেন পাজামা পরে নেয়। যে জুতো পাবে না, সে যেন মোজা পরে নেয়।”[226]

মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়গুলো:

মহিলারা তাদের মাথা আবৃত রাখবে। তাছাড়া তারা ইহরাম অবস্থায় যেকোনো ধরনের পোশাকই পরতে পারবে। তবে অত্যধিক সাজ-সজ্জা করবে না। ইহরাম অবস্থায় তাদের জন্য যা নিষিদ্ধ তা হচ্ছে,

১. হাত মোজা ব্যবহার করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[225] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭৭।

[226] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭৮।

ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ».

“আর মহিলারা হাত মোজা পরবে না।”[227]

২. নেকাব পরবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ»

“আর মুহরিম মহিলারা নেকাব পরবে না।”[228] অর্থাৎ এমনভাবে মুখ ঢাকবে যাতে সহজেই সে আবরণ উঠানো যায় এবং নামানো যায়। পর পুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখবে। কারণ, মাহরাম ছাড়া পর-পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা মহিলাদের জন্য বৈধ নয়।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজে কখন গুনাহ হবে আর কখন হবে না

মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পারে তিনভাবে:

প্রথমত: হয়তো সে তা ভুলে, না জেনে, বাধ্য হয়ে কিংবা নিদ্রিত অবস্থায় করবে। এ ক্ষেত্রে তার কোনো পাপ হবে না। তার ওপর কোনো কিছু ওয়াজিবও হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ﴾ [الاحزاب: ٥]

---

[227] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮।

[228] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮।

“আর এ বিষয়ে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো পাপ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ০৫] অন্য এক আয়াতে এসেছে,

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

“হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦﴾ [النحل: ١٠٦]

“যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফুরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه».

“নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল করা ও ভুলে যাওয়া জনিত এবং যার ওপর তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে এমন গুনাহ ক্ষমা করে

দিয়েছেন।”[229]

তিনি আরো বলেন,

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ».

“তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে- ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে যতক্ষণ সে ঘুমিয়ে থাকে।”[230]

এসব আয়াত ও হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মাণ হয় যে, উপর্যুক্ত অবস্থায় যদি কারো ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয় সংঘটিত হয়ে যায়, তবে তা হুকুম ও শাস্তির আওতাভুক্ত হবে না; বরং তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তবে যখন ওযর দূর হবে এবং অজ্ঞাত ব্যক্তি জ্ঞাত হবে, বিস্মৃত ব্যক্তি স্মরণ করতে সক্ষম হবে, নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত হবে, তৎক্ষণাৎ তাকে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে হবে এবং দূরে রাখতে হবে। ওযর দূর হওয়ার পরও যদি সে ঐ কাজে জড়িত থাকে, তবে সে পাপী হবে এবং যথারীতি তাকে ফিদয়া প্রদান করতে হবে। উদাহরণত, ঘুমন্ত অবস্থায় মুহরিম যদি মাথা ঢেকে নেয়, তাহলে যতক্ষণ সে নিদ্রিত থাকবে, ততক্ষণ তার ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তার কর্তব্য হলো মাথা খুলে রাখা। যদি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরও জেনে-বুঝে মাথা আবৃত রেখে দেয়, তবে সেজন্য তাকে ফিদয়া প্রদান করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: নিষিদ্ধ বিষয় ওযর সাপেক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত করা,

---

[229] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২০৪৩।

[230] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪৪০২।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে পাপী হবে না, তবে তাকে ফিদয়া প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

"আর তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না, যতক্ষণ না পশু তার যথাস্থানে পৌঁছে। আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোনো কষ্ট থাকে তবে সিয়াম কিংবা সদাকা অথবা পশু জবাইয়ের মাধ্যমে ফিদয়া দিবে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

তৃতীয়ত: নিষিদ্ধ বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে বৈধ কোনো ওযর ছাড়া সংঘটিত করা। এ ক্ষেত্রে তাকে ফিদয়া প্রদান করতে হবে এবং সে পাপীও হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো অপরাধের দরুণ কী ফিদয়া দিতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

ইহরাম অবস্থায় অনুমোদিত কাজ ও বিষয়

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ ও মাকরূহ কাজগুলো ছাড়া মুহরিমের জন্য সব কাজ করার অনুমতি রয়েছে। যেমন,

১. পানি দিয়ে গোসল করা।

২. সুগন্ধিমুক্ত সাবান ব্যবহার করা।

৩. ইহরামের কাপড় ধোয়া এবং এর বদলে অন্যটি পরিধান করা।

৪. বেল্ট বা অন্য কিছু দিয়ে লুঙ্গি বাঁধা। যদিও তাতে সেলাই থাকে।

৫. শিঙ্গা লাগানো। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।[231]

৬. সেলাইযুক্ত চাদর পরা।

৭. পোষা প্রাণী যবেহ করা। কারণ, এটি শিকারের আওতায় পড়ে না। যেমন, হাঁস, মুরগী ও ছাগল ইত্যাদি।

৮. মিসওয়াক করা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্তহীনভাবেই বেশি বেশি মেসওয়াক করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।[232] মিসওয়াকের স্থলে এ জাতীয় অন্য কিছু যেমন ব্রাশ ইত্যাদি ব্যবহারেরও অবকাশ রয়েছে। এতে যদি সুগন্ধি থাকে, তাতেও অসুবিধা নেই যদি না তা কেবল সুবাস পেতেই ব্যবহার করা হয়।

৯. চশমা, ঘড়ি বা আংটি পরা কিংবা শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করা অথবা আয়নায় মুখ দেখা।

১০. ব্যবসা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ﴾ [البقرة: ١٩٨]

"তোমাদের ওপর কোনো পাপ নেই যে, তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৮] সকল তাফসীর বিশারদের মতে আয়াতে 'অনুগ্রহ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে ব্যবসায়িক মুনাফা।

১১. স্বাভাবিকভাবে মাথার চুল আচড়ানো বা চুলকানো। যদিও এতে

---

[231] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০২।

[232] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৮৮।

কোনো চুল পড়ে। বিশেষ করে মানুষের মাথা থেকে যেসব চুল পড়ে সেগুলো আসলে মরা চুল। তবে এমন জোরে চিরুনি ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিৎ সাধারণত যাতে চুল পড়ে।

১২. যা মাথার সাথে লেগে থাকে না। যেমন ছাতা, গাড়ির হুড, তাঁবু ইত্যাদি ব্যবহার করা। উম্মে হাসীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহর সাথে হজ পালন করলাম। তিনি আকা'বার কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তিনি বাহনে চড়ে প্রত্যাবর্তন করলেন, তার সাথে ছিলেন বিলাল ও উসামা। তাদের একজন বাহন চালাচ্ছিলেন, অন্যজন রাসূলুল্লাহর মাথার উপর কাপড় উঁচু করে ধরে রেখেছিলেন, যা তাকে সূর্য থেকে ছায়া দিচ্ছিল।[233] অপর এক বর্ণনা মতে, 'যা তাঁকে তাপ থেকে রক্ষা করছিল, যতক্ষণ না তিনি আকা'বার কঙ্কর নিক্ষেপ সমাপ্ত করলেন।'

১৩. মাথায় আসবাব-পত্র বহন করা, যদিও তা মাথার কিছু অংশ ঢেকে রাখে। কারণ, সাধারণত এর মাধ্যমে কেউ মাথা আবৃত করার উদ্দেশ্য করে না, বরং বোঝা বহন করাই মূল উদ্দেশ্য থাকে।

১৪. পানিতে ডুব দেয়াতে কোনো অসুবিধা নেই, যদিও এর ফলে সম্পূর্ণ মাথা আবৃত হয়ে যায়।

১৫. পরিধান না করে জামা শরীরের সাথে জড়িয়ে রাখা।

১৬. স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে লম্বা জামা পরিধান করা হয়, সেভাবে পরিধান না করে চাদর হিসেবে ব্যবহার করাতে কোনো দোষ নেই।

---

[233] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৮।

১৭. তালি যুক্ত চাদর বা লুঙ্গি পরিধানে কোনো বাধা নেই।

১৮. গলায় পানির মশক বা পানপাত্র ঝুলাতে পারবে।

১৯. যদি চাদর খুলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তা বেঁধে রাখতে পারবে। কারণ, এসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো স্পষ্ট কিংবা ইঙ্গিতসূচক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নিপ্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মুহরিমের পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, সে জামা, পাগড়ি, মস্তকাবরণীযুক্ত লম্বা কোট, পাজামা এবং মোজা পরিধান করবে না। পরিধেয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর যখন রাসূলুল্লাহ পরিধানের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বস্ত্রগুলো সম্পর্কে জানালেন, তখন প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া অন্য যাবতীয় পোশাক মুহরিম ব্যক্তি পরিধান করতে পারবে।

২০. জুতো না থাকলে পায়ের সুরক্ষার জন্য মুহরিম ব্যক্তির জন্য মোজা ব্যবহার বৈধ।

২১. ক্ষতিকর পোকা-মাকড় কিংবা হিংস্র প্রাণীকে শিকার-জন্তু হিসেবে গণ্য করা হবে না। সুতরাং হারাম শরীফের এলাকা কিংবা অন্য যেকোনো স্থানে মুহরিম বা হালাল ব্যক্তি, সকলের জন্য তা হত্যা করা বৈধ। আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিমের জন্য হত্যা করা বৈধ এমন সব প্রাণীর উল্লেখ করে বলেন, সাপ, বিচ্ছু, ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ, চিল, পাগলা কুকুর,

হিংস্র পশু।[234]

তেমনি, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হারাম কিংবা হালাল উভয় এলাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ প্রকার প্রাণীকে হত্যা করা বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন: কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর। অন্য বর্ণনায় আছে 'সাদা কাক'।[235]

অপর বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় এক মুহরিমকে সাপ হত্যা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।'[236]

---

[234] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৩৮; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৪৮; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১০৯৯০।

[235] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯৮।

[236] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩৫।

চয়নিকা

‘বিলক্ষণ সত্য জেনো, পৃথিবীতে যত খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় তথা ভোগ-উপকরণ ও সম্পদের সুখ রয়েছে, তার কোনোটির স্বাদই হজে আস্বাদিত হাজীদের স্বাদের বিন্দুরও তুল্য নয়। তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাদের কাউকে এ নি‘আমত থেকে বঞ্চিত না করেন। বল, আমীন।’

-**শায়খ আলী তানতাবী রহ.**

চতুর্থ অধ্যায়: নবীজী ও তাঁর সাহাবীগণের হজ-উমরা

- **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে সাহাবীগণ যেভাবে হজ-উমরা করেছেন**[237]

[237] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর মোট চার বার উমরা করেছেন। ১ম বার : হুদায়বিয়ার উমরা, ৬ষ্ট হিজরীতে যা পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সম্পন্ন করতে পারেন নি। মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যান। ২য় বার : উমরাতুল কাযা ৭ম হিজরীতে। ৩য় বার : জিয়িররানা থেকে ৮ম হিজরীতে। ৪র্থ বার : বিদায় হজের সাথে ১০ হিজরীতে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে হারাম এলাকার বাইরে বের হয়ে উমরা করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। [বিস্তারিত দেখুন : যাদুল মা'আদ : (২/৯২-৯৫)]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে হজ-উমরা করেছেন

হজ বিষয়ক সর্ববৃহৎ একক হাদীস:

হজ বিষয়ক যত হাদীস রয়েছে তার মধ্যে হাদীসু জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু নামে খ্যাত এই হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ একমত হয়েছেন। হাদীসটিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হজের সফরের শুরু থেকে হজের সমাপ্তি পর্যন্ত হজ সম্পর্কিত যাবতীয় কাজের ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে।

হাদীসটি রয়েছে মূলত মুসলিম শরীফে[238]প্ল তবে এই হাদীসের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হজ সংক্রান্ত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত অন্যসব হাদীস যা অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে রয়েছে এমনকি মুসলিম শরীফেরও অন্য অধ্যায়ে রয়েছে, সেগুলো এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে যথাযথ সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।[239]

১- জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু[240] বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[238] সহীহ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮, অধ্যায় : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ।

[239] এই অধ্যায়টি শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. সংকলিত ‘হিজ্জাতুন নবী’ থেকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে।

[240] জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন একজন সাহাবী। হজ সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় হাদীসটির বর্ণনাকারী।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম [মদীনায় বসবাসকালে[241]] দীর্ঘ নয় বছর পর্যন্ত হজ করেন নি।[242]

২- দশম বছরে চারিদিকে ঘোষণা দেওয়া হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [এ বছর[243]] হজ করবেন।

৩- অসংখ্য লোক মদীনায় এসে জমায়েত হল। [বাহনে চড়া অথবা পায়ে হাঁটার সামর্থ রাখে এরকম কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট রইল না[244]] [সকলেই এসেছে রাসূলের সাথে বের হওয়ার জন্য[245]] সকলেরই উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে তাঁর মতোই হজের আমল সম্পন্ন করা।

৪- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন[246] এবং বললেন,

«مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَ [مُهَلُّ أَهْلِ] الطَّرِيقُ الآخَرُ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

---

241 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৪০।

242 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬১। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হিজরী ৯ম অথবা ১০ম সালে হজ ফরয হয়। হজ ফরয হওয়ার পর বিলম্ব না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ হজ করেন। দ্রইবনুল কাইয়্যেম ., যাদুল মা'আদ।

243 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৪০।

244 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬১।

245 নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬১।

246 বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদের বর্ণনা অনুসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভাষণ দিয়েছিলেন মসজিদে নববীতে। সময়টা ছিল মদীনা থেকে হজের সফরে বের হওয়ার পূর্বে।

“মদীনাবাসিদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে, যুল হুলাইফা। অন্যপথের [লোকদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে] আল-জুহফা, আর ইরাকবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে, যাতু ইরক। নাজদবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে করন। ইয়ামানবাসীদের স্থান হচ্ছে, ইয়ালামলাম।”[247]

৫- [তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলকদ মাসের পাঁচ দিন অথবা চার দিন অবশিষ্ট থাকতে বের হলেন।[248]]

৬- [এবং হাদীর পশু পাঠিয়ে দিলেন।[249]]

৭- আমরা তাঁর সাথে বের হলাম। [আমাদের সাথে ছিল মহিলা ও শিশু।[250]]

৮- যখন আমরা যুল-হুলাইফাতে[251] পৌঁছলাম। তখন আসমা বিন্ত উমায়েস মুহাম্মাদ ইবন আবূ বকর নামক সন্তান প্রসব করলেন।

৯- অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, আমি কী করব?

১০- তিনি বললেন,

«اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي»

---

[247] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮৩।

[248] নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৪০।

[249] নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৪৩।

[250] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৩।

[251] যুলহুলাইফা মসজিদে নববী থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

“তুমি গোসল কর, রক্তক্ষরণের স্থানে একটি কাপড় বেঁধে নাও এবং ইহরাম বাঁধ।”[252]

১১- এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে সালাত আদায় করলেন [এবং চুপচাপ রইলেন।[253]]

ইহরাম

১২- অতঃপর কাসওয়া নামক উটে সওয়ার হলেন। উটটি তাঁকে নিয়ে বাইদা নামক জায়গায় গেলে [তিনি ও তাঁর সাথীগণ হজের তালবিয়া পাঠ করলেন।[254]]

১৩- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার দৃষ্টিপথে যতদূর যায় তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর সামনে কেবল আরোহী ও পায়ে হেঁটে যাত্রারত মানুষ আর মানুষ। তাঁর ডানে অনুরূপ, তাঁর বামেও অনুরূপ তাঁর পেছনেও অনুরূপ মানুষ আর মানুষ। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর ওপর পবিত্র কুরআন নাযিল হয়। তিনিই তো তার ব্যাখ্যা জানেন। আর যে আমল তিনি করছিলেন আমরা তা হুবহু আমল করছিলাম।

১৪- তিনি তাওহীদ সম্বলিত[255] তালবিয়া পাঠ করেন,

---

[252] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[253] নাসাঈ, ২৭৫৬।

[254] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪।

[255] তাওহীদ ও শির্ক বিপরীতমুখী দু’টি বিষয় যা কোনো দিন একত্রিত হতে পারে না। এ দুয়ের একটির উপস্থিতির অর্থ অন্যটির বিদায়, ঠিক রাত-দিন অথবা আগুন-পানির বৈপরিত্বের মতোই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ،[256] إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَشَرِيكَ لَكَ.

১৫- আর মানুষেরাও যেভাবে পারছিল এই তালবিয়া পাঠ করছিল। তারা কিছু বাড়তি বলছিল। যেমন,

---

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"তোমরা হজ ও ওমরাহ আল্লাহর জন্য সম্পন্ন করো।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে তাওহীদ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি তাওহীদকে তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়েছেন। হজে নিম্নবর্ণিত আমলসমূহ সম্পাদনে তাওহীদের প্রতি তাঁর গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, ১. তাঁর তালবিয়া পাঠ, ২. লোক-দেখানো ও রিয়া থেকে মুক্ত হজ পালনের জন্য আল্লাহর কাছে তাঁর দো'আ। ৩. তাওয়াফ শেষে দু'রাকাত সালাত আদায় করার সময় তাওহীদ সম্বলিত 'সূরা ইখলাস' ও 'সূরা আল-কাফিরুন' পাঠ। ৪. সাফা ও মারওয়ায় তাওহীদনির্ভর দো'আ পাঠ। ৫. আরাফার দো'আ ও যিকিরসমূহের তাওহীদ সম্বলিত বাণী উচ্চারণ। ৬. হাদী বা কুরবানীর পশু যবেহের সময় তাকবীর পাঠ। ৭. জামরাতে পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর পাঠ ইত্যাদি। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে, তাওহীদের হাকীকত সম্পর্কে সচেতন হওয়া। শির্ক ও বিদ'আত থেকে সতর্ক থাকা।

[256] ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তালবিয়া তাওহীদ সম্বলিত ছিল। সর্বপ্রথম আমর ইবন লুহাই খুযাঈ জাহেলী যুগে তালবিয়াতে শির্ক যুক্ত করে বলে,

إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ.

'কিন্তু একজন শরীক যার তুমিই মালিক এবং তার যা কিছু রয়েছে তারও।' [উমদাতুল কারী : (২৪/৬৫); আখবারে মক্কা, আযরাকী : (১/২৩২)]

তার অনুসরণে মুশরিকগণ হজ ও উমরার তালবিয়া পাঠে উক্ত শির্ক সম্বলিত বাক্য তালবিয়াতে যুক্ত করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়ায় তাওহীদের স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন এবং তা থেকে শির্কযুক্ত বাক্য সরিয়ে দিলেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮৫)

لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ, لَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ.

(লাব্বাইকা যাল মাআরিজি, লাব্বাইকা যাল ফাওয়াযিলি) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এটা রদ করতে বলেন নি।

১৬- তবে তিনি বার বার তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

১৭- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা বলছিলাম, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা) لَبَّيْكَ بِالحج (লাব্বাইকা বিলহাজ্জ)। আমরা খুব চিৎকার করে তা বলছিলাম। আর আমরা কেবল হজেরই নিয়ত করছিলাম। আমরা হজের সাথে উমরার কথা তখনও জানতাম না।[257]

১৮- আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উমরার নিয়ত করে এলেন। 'সারিফ'[258] নামক স্থানে এসে তিনি ঋতুবতী হয়ে গেলেন।[259]

মক্কায় প্রবেশ ও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ

১৯- এমনিভাবে আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ্ এসে পৌঁছলাম। সময়টা ছিল যিলহজের চার তারিখ ভোরবেলা।[260]

২০- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দরজার সামনে এলেন। অতঃপর তিনি তাঁর উট বসালেন। তারপরে মসজিদে প্রবেশ

---

[257] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯৮০।

[258] এই জায়গাটি তানঈমের কাছাকাছি বায়তুল্লাহ থেকে ১০ মাইল দূরে উত্তর দিকে অবস্থিত।

[259] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৩।

[260] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৬।

করলেন।

২১- তিনি হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন।

২২- [এরপর তিনি তাঁর ডান দিকে চললেন।][261]

২৩- অতঃপর তিনি তিন চক্করে রমল করলেন[262] [এমনকি তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে ফিরে আসলেন[263]] এভাবে তিন চক্কর শেষ করলেন। আর চার চক্কর [স্বাভাবিকভাবে[264]] হাঁটলেন।

২৪- এরপর মাকামে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এ পৌঁছে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (ওয়াত্তাখিযূ মিম মাক্বামি ইবরাহীমা মুসাল্লা)

[তিনি উচ্চস্বরে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন যাতে লোকেরা শুনতে পায়।][265]

২৫- এরপর মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহ’র মাঝখানে রেখে [দু’রাকাত সালাত আদায় করলেন।[266]]

২৬- [তিনি এ দু’রাকাত সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস

---

[261] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮; তিরমিযী, হাদীস নং ৮৫৬।

[262] রমল হচ্ছে, ঘন পদক্ষেপে বীরের মতো দ্রুত হাঁটা।

[263] মুসনাদে আহমাদ ১৪৬৬১।

[264] শারহু মা‘আনিল আসার, হাদীস নং ৩৮৩৬।

[265] নাসাঈ, হাদীস নং ২৯৬১।

[266] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৫৬। বায়হাকী, মুসনাদে আহমদ।

পড়েছিলেন।[267]]

২৭- [এরপর তিনি যমযমের কাছে গিয়ে যমযমের পানি পান করলেন এবং তাঁর নিজের মাথায় ঢাললেন।[268]]

২৮- এরপর তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট গিয়ে তা স্পর্শ করলেন।

সাফা ও মারওয়ায় অবস্থান

২৯- তারপর সাফা দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গেলেন। সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পাঠ করলেন:

«إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»

“নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন, আমিও তা দিয়ে শুরু করছি”প্ত্রঅতঃপর তিনি সাফা দিয়ে শুরু করলেন এবং কাবাঘর দেখা যায় এই রকম উঁচুতে উঠলেন।

৩০- অতঃপর তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও [প্রশংসা]-র কথা ঘোষণা করলেন এবং বললেন,

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْد [يُحْيِي وَيُمِيتُ] وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ [لاَ شَرِيكَ لَهُ] أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه».

---

[267] নাসাঈ, হাদীস নং ২৯৬০; তিরমিযী, হাদীস নং ৮৬৯।

[268] আহমদ, হাদীস নং ১৫২৮০।

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু [ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু] ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ্।)

“আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। [তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন।] আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। [তাঁর কোনো শরীক নেই।] তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।”[269] অতঃপর এর মাঝে তিনি দো‘আ করলেন এবং এরূপ তিনবার পাঠ করলেন।

৩১- এরপর মারওয়া পাহাড়ের দিকে [হেঁটে] চললেন। যখন তিনি বাতনুলওয়াদীতে পদার্পন করলেন, তখন তিনি দৌড়াতে লাগলেন। অবশেষে যখন তাঁর পদযুগল [উপত্যকার অপর প্রান্তে[270]] মারওয়ায় আরোহন করতে গেল, তখন তিনি স্বাভাবিক গতিতে চলতে লাগলেন। অবশেষে মারওয়ায় আসলেন। [অতঃপর তাতে চড়লেন এবং বায়তুল্লাহ’র দিকে তাকালেন।[271]]

৩২- অতঃপর সাফা পাহাড়ে যা করেছিলেন মারওয়া পাহাড়েও তাই করলেন।

---

[269] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[270] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৪৮০।

[271] নাসাঈ, হাদীস নং ২৯৮০।

হজকে উমরাতে পরিণত করার আদেশ

৩৩- মারওয়া পাহাড়ে শেষ চক্করকালে তিনি বললেন, [হে লোক সকল! [272]]

«أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً. »

"আমি আগে যা করে এসেছি তা যদি আবার নতুন করে শুরু করার সুযোগ থাকত, তাহলে হাদীর পশু সাথে নিয়ে আসতাম না এবং [অবশ্যই[273]] আমি হজকে উমরায় পরিণত করতাম। তোমাদের মধ্যে যার সাথে হাদী বা পশু নেই সে যেন হালাল হয়ে যায় এবং এটাকে উমরাতে পরিণত করে।"[274]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً».

"বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে তোমরা তোমাদের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাও এবং চুল ছোট করে

---

[272] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৪৪৪০।

[273] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৯০৫।

[274] সাহাবীগণের মধ্যে যারা হাদী সঙ্গে নিয়ে আসেন নি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উমরা করে হালাল হতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাদের হজ মুশরিকদের বিপরীত হয়। কেননা মুশরিকরা মনে করতো হজের মাসসমূহে উমরা পালন জঘন্যতম অপরাধ। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৩০)

ফেল[275]। অতঃপর হালাল অবস্থায় অবস্থান কর। এমনভাবে যখন তারবিয়া দিবস (যিলহজের আট তারিখ) হবে, তোমরা হজের ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ কর। আর তোমরা যে হজের ইহরাম করে এসেছ, সেটাকে তামাত্তুতে পরিণত কর।"[276]

৩৪- তখন সুরাকা ইবন মালিক ইবন জু'শুম মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, [আমাদের এ উমরায় রূপান্তর করা[277], অপর শব্দে এসেছে তিনি বলেছেন, এভাবে তামাত্তু করা কি[278]] শুধু আমাদের এ বছরের জন্য নাকি সব সময়ের জন্য? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বললেন,

«دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ [إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ] ، لاَ بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ، [لاَ بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ]»

"হজের ভেতরে উমরা কিয়ামত দিন পর্যন্ত প্রবিষ্ট হয়েছে, না বরং তা সব সময়ের জন্য, না বরং তা সব সময়ের জন্য' এ কথাটি তিনি

---

[275] আর এটিই হচ্ছে উত্তম। অর্থাৎ তামাত্তু হাজী উমরার পরে মাথার চুল ছোট করবে, কামাবে না। যাতে করে পরে দশ তারিখ মাথা কামাতে পারে। যারা মাথা কামাবে তাদের জন্য রাসূল যে দো'আ করেছেন তা হজের পরের হালাল হওয়া বা শুধু উমরার জন্য আসার পর তা সম্পাদন করার পর হালাল হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

[276] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৬।

[277] নাসাঈ, হাদীস নং ২৮০৫।

[278] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৭৮৭।

তিনবার বললেন।”[279]

৩৫- সুরাকা ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদেরকে দীনের ব্যাখ্যা দিন, আমাদেরকে যেন এখনই সৃষ্টি করা হয়েছে (অর্থাৎ আমাদেরকে সদ্যভূমিষ্ট সন্তানের ন্যায় দীনের তালীম দিন)। আজকের আমল কিসের ওপর ভিত্তি করে? কলম যা লিখে শুকিয়ে গিয়েছে এবং তাকদীর যে বিষয়ে অবধারিত হয়ে গিয়েছে, তার ভিত্তিতে? না কি ভবিষ্যতের নতুন কোনো বিষয়ের ভিত রচিত হবে?[280] তিনি বললেন,

«لَا، بَل فِيمَا جَفَّت بِه الأَقلَامَ وَجَرَت بِه المَقَادِيرُ».

“না, বরং যা লিখে কলম শুকিয়ে গিয়েছে এবং যে ব্যাপারে তাকদীর নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে, তা-ই তোমরা আমল করবে।”[281] তিনি বললেন, তাহলে আর আমলের দরকার কি? [তখন] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ [لِمَا خُلِقَ لَهُ]»

“তোমরা আমল করে যাও, তোমাদের কেউ যে জন্য সৃষ্ট হয়েছে তার

---

[279] মু‘জামুল কাবীর লিত তাবারানী, হাদীস নং ৬৫৮৬; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; ইবনুল জারূদ, হাদীস নং ৪৬৫।

[280] অর্থাৎ আমাদের কর্মকাণ্ড কি আগেই নির্ধারিত নাকি আমরা সামনে যা করব সেটাই চূড়ান্ত?

[281] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪১৪৮।

জন্য সে কাজটা করা সহজ করে দেওয়া হয়েছে[282]।”[283]

৩৬- (জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি আমাদেরকে আদেশ দিলেন, আমরা হালাল হয়ে গেলে যেন হাদীর ব্যবস্থা করি।[284]) [আমাদের মধ্য থেকে এক উটে সাতজন অংশ নিতে পারে।[285]] [যার সাথে হাদী নেই সে যেন হজের সময়ে তিনদিন সাওম পালন করে, আর যখন নিজ পরিবারের নিকট অর্থাৎ দেশে ফিরে যাবে তখন যেন সাতদিন সাওম পালন করে।[286]]

৩৭- [অতঃপর আমরা বললাম, কী হালাল হবে? তিনি বললেন,

“সব কিছু হালাল হয়ে যাবে।”[287]]

৩৮- [বিষয়টি আমাদের কাছে কঠিন মনে হল এবং আমাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে গেল।[288]]

---

282 অর্থাৎ তাকদীর যদি ভালো লিখা হয়ে থাকে, তাহলে ভালো কাজ করা তার জন্য সহজ হবে। আর যদি তাকদীরে খারাপ লিখা থাকে, তবে খারাপ কাজ করা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে।

283 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪১৪৮।

284 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩১৮; মুসনাদে আহমদ।

285 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪১৪৮।

286 মুয়াত্তা, হাদীস নং ১৫৯২; বায়হাকী, হাদীস নং ৮৮৫৭।

287 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৫২৮১।

288 মুসলিম, হাদীস নং ১২১৬; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪২৭৬; নাসাঈ, হাদীস নং ২৯৯৪।

বাতহা নামক জায়গায় অবস্থান

৩৯- [জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা বের হয়ে বাতহা[289] নামক জায়গায় গেলাম। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় একজন লোক বলতে লাগল,

عَهْدِي بِأَهْلِي الْيَوْمَ

"আজকে আমার পরিবারের সাথে আমার সাক্ষাতের পালা।"[290]]

৪০- [জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতে লাগলাম। অতঃপর আমরা বললাম, আমরা হাজী হিসেবে বের হয়েছিলাম। হজ ছাড়া আমরা অন্য কিছুর নিয়ত করি নি। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে আরাফা দিবস আসতে যখন আর মাত্র চার দিন বাকী।[291]] (এক বর্ণনায় এসেছে, পাঁচ [রাত্রি], তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হই। অতঃপর আমরা আমাদের আরাফার উদ্দেশ্যে (মিনাতে) গমন করব, অথচ আমাদের লিঙ্গসমূহ সবে মাত্র বীর্য স্খলিত করেছে। [অর্থাৎ এটা কেমন কাজ হবে?] বর্ণনাকারী বললেন, আমি যেন জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথার সাথে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখানোর ব্যাপারটি দেখতে পাচ্ছি। [মোটকথা, তারা বললেন, আমরা কীভাবে তামাত্তু করব অথচ

---

[289] বায়তুল্লাহ'র পূর্বদিকে অবস্থিত।

[290] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৯৬৫।

[291] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৯৮৫।

আমরা শুধু হজের উল্লেখ করেছি।[292]]

৪১- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, [বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছল। আমরা জানি না এটা কি আসমান থেকে তাঁর নিকট পৌঁছল নাকি মানুষের নিকট থেকে পৌঁছল।[293]]

হজকে উমরায় পরিণত করতে রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান সাহাবীগণের সাড়া

৪২- [অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে[294]] [মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করে বললেন,[295]]

«أَبَاللَّهِ تُعَلِّمُونِي أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ»

"হে মানুষ, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছ? তোমরা জানো নিশ্চয় আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তোমাদের চেয়ে অধিক সত্যবাদি, তোমাদের চেয়ে অধিক সৎকর্মশীল।"[296]

«افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّون وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي

---

[292] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৬।

[293] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৬।

[294] শারহু মা'আনিল আসার, হাদীস নং ৩৮৮২।

[295] ত্বা-হাবী, হাদীস নং ৩৮৮২।

[296] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৮।

حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ فَحِلُّوا»

“[আমি তোমাদেরকে যা নির্দেশ করছি তা পালন কর।[297]] আমার সাথে যদি হাদী (যবেহের জন্য পশু) না থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম যেরূপ তোমরা হালাল হয়ে যাচ্ছ। [কিন্তু যতক্ষণ না হাদী তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে, (অর্থাৎ দশ তারিখ হাদী যবেহ না হবে) ততক্ষণ আমার পক্ষে হারামকৃত বিষয়াদি হালাল হবে না।[298]] যদি আমি যা পিছনে রেখে এসেছি এমন কাজগুলো আবার নতুন করে করার সুযোগ থাকত, তাহলে হাদী সাথে নিয়ে আসতাম না। অতএব, তোমরা হালাল হয়ে যাও।”[299]

৪৩- [জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলাম এবং সুগন্ধি ব্যবহার করলাম। আমরা আমাদের স্বাভাবিক পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করলাম।[300]] [আমরা রাসূলের কথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।[301]]

৪৪- [অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং যাদের সাথে হাদী ছিল[302] তারা ব্যতিত সবাই হালাল হয়ে গেল এবং চুল

---

[297] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৬।

[298] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৪।

[299] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৬; ত্বা-হাবী, হাদীস নং ৩৮৮২।

[300] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৩; নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬৩।

[301] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৬।

[302] যাদের সাথে হাদী ছিল তারা হলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তালহা, আবূ বকর, উমার, যুল ইয়াসারা ও যুবাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম।

ছোট করল।][303]

৪৫- [তিনি আরো বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তালহা ব্যতীত কারো কাছে হাদী ছিল না।[304]]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ইহরাম বেঁধে ইয়ামান থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আগমন

৪৬- এদিকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু [তার কর্মস্থল] ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের উটগুলো নিয়ে আগমন করলেন।[305]

৪৭- তিনি ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাদের মধ্যে পেলেন যারা হালাল হয়েছেন। [এমনকি তিনি মাথা আঁচড়িয়েছেন,[306]] রঙ্গীন পোশাক পরেছেন এবং সুরমা ব্যবহার করেছেন। তিনি ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে এই অবস্থায় দেখে তা অপছন্দ করলেন। [তিনি বললেন, তোমাকে এ রকম করার জন্য কে নির্দেশ দিয়েছে?[307]] ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার পিতা আমাকে এ রকম

সুতরাং তারা কিরান হজ করেছেন। এরা ছাড়া সবাই তামাত্তু হজ করেছেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

[303] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪; ত্বা-হাবী, হাদীস নং ৩৮৭৭।

[304] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪; ত্বা-হাবী, হাদীস নং ৩৮৭৭।

[305] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[306] ইবনুল জারূদ ৪৬৯।

[307] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; বায়হাকী, হাদীস নং ৮৮২৭।

করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪৮- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে থাকা অবস্থায় বলতেন, ফাতেমার কৃতকর্মের ওপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য তাঁর কাছে গেলাম, ফাতেমা যা রাসূলের বরাত দিয়ে বলেছেন সে সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম যে, আমি ফাতেমার এই কাজকে অপছন্দ করেছি; [কিন্তু সে আমাকে বলেছে, আমার পিতা আমাকে এরকম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[308]] তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ أَنَا أَمَرْتُهَا بِهِ»

"সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে, [সে সত্য বলেছে,][309] 'আমিই তাকে এ রকম করতে নির্দেশ দিয়েছি।"[310]

৪৯- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ আলীকে বললেন, হজের নিয়ত করার সময় তুমি কি বলেছিলে? তিনি বললেন, আমি বলেছি,

«مَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

---

[308] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; বায়হাকী, হাদীস নং ৮৮২৭।

[309] নাসাঈ, হাদীস নং ২৭১২, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৪৪০।

[310] নাসাঈ, হাদীস নং ২৭১২, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৪৪০।

“হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি এভাবে ইহরাম বাঁধছি যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বেঁধেছেন”।

৫০- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ»

“তাহলে আমার সাথে হাদী রয়েছে। সুতরাং তুমি হালাল হয়ো না। [তুমি হারাম অবস্থায়ই থাকো যেমন আছ।”[311]]

৫১- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়ামান থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আনিত হাদী এবং [মদীনা থেকে[312]] রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনিত হাদীর [মোট সংখ্যা ছিল একশত উট।[313]]

৫২- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সাথে হাদী ছিল তারা ছাড়া সব মানুষ হালাল হয়ে গেল এবং চুল ছোট করল।

৮ যিলহজ ইহরাম বেঁধে মিনা যাত্রা

৫৩- অতঃপর যখন তারবিয়া দিবস (যিলহজের আট তারিখ) হলো, তারা [তাদের আবাসস্থল বাতহা থেকে[314]] হজের ইহরাম বেঁধে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হলো।

---

[311] নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৪৪।

[312] ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৩০৭৪।

[313] দারেমী, হাদীস নং ১৮৯২।

[314] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৬।

৫৪- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার কাছে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, আয়েশা কাঁদছে। রাসূল বললেন,

مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ: شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ. فَقَالَ «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّي»

"তোমার কি হয়েছে? আয়েশা বললেন, আমার হায়েয এসে গেছে। লোকজন হালাল হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমি হালাল হতে পারি না। বায়তুল্লাহর তাওয়াফও করি না। অথচ সব মানুষ এখন হজে যাচ্ছে। রাসূল বললেন, এটা এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ আদমের মেয়ে সন্তানদের ওপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি গোসল করে নাও। অতঃপর হজের তালবিয়া পাঠ কর। [তারপর তুমি হজ কর এবং হজকারী যা করে তুমি তা কর। কিন্তু বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করো না এবং সালাত আদায় করো না[315,316]] [সুতরাং তিনি তাই

---

[315] এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয। নিঃসন্দেহে হজের সফরে কুরআন তিলাওয়াত করা অন্যতম উত্তম আমল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে তাওয়াফ ও সালাত আদায় ছাড়া সব আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। যদি ঋতু অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত জায়েয না হত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তাকে তা নিষেধ করতেন। হাদীস বিশারদগণ 'নাপাক ও ঋতুবতী মহিলা কুরআন পড়বে না।' হাদীসটি দুর্বল বলেছেন...।

করলেন[317]।] অপর বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর তিনি হজের যাবতীয় কাজ সমাধা করলেন, কিন্তু বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ করলেন না।[318]

৫৫- আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে আরোহন করলেন। তিনি সেখানে[319] (অর্থাৎ মিনাতে) অপর বর্ণনায়, [আমাদেরকে নিয়ে মিনাতে[320]] যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন।

৫৬- অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এমনকি সূর্য উদয় হলো।

৫৭- তিনি নামিরা নামক স্থানে [তাঁর জন্য[321]] একটি পশমের তাবু স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন।

আরাফায় যাত্রা ও নামিরাতে অবস্থান

৫৮- এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হলেন। কুরাইশরা সন্দেহাতীতভাবে মনে করছিল যে, তিনি মাশ‘আরে হারাম (অর্থাৎ) [মুযদালিফাতেই[322]] অবস্থান করবেন [এবং সেখানেই তাঁর অবস্থানস্থল হবে।] কেননা কুরাইশরা জাহেলী যুগে এরকম

---

[316] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৮৬।

[317] মুস্তাখরাজে আবী আওয়ানাহ, ৩১৭১।

[318] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৪২৭৯।

[319] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[320] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৭৯।

[321] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪।

[322] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪।

করত।[323] কিন্তু রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশ‘আরে হারাম অতিক্রম করে আরাফার নিকট উপনীত হলেন এবং নামিরা নামক স্থানে তাঁর জন্য তাবু তৈরি করা অবস্থায় পেলেন। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন।

৫৯- অতঃপর যখন সূর্য হেলে পড়ল, তিনি কাসওয়া নামক উট আনতে বললেন এবং [তাতে সাওয়ার হয়ে] উপত্যকার কোলে এসে থামলেন[324]।

আরাফার ভাষণ

৬০- অতঃপর মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন,

«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا».

“নিশ্চয় তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য সম্মানিত। যেমন তোমাদের এই শহরে, তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই দিন সম্মানিত।”

---

[323] হজ পালনকারী সাহাবীগণ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দানে অবস্থান করলেন এবং এ ক্ষেত্রেও মুশরিকদের বিপরীত করলেন, কেননা মুশরিকরা মুযদালিফায় অবস্থান করতো এবং বলতো আমরা হারাম এলাকা ছাড়া অন্য জায়গায় যাব না এবং সেখান থেকে প্রস্থান করব না। উল্লেখ্য, আরাফা হারাম এলাকার বাইরে অবস্থিত।

[324] এই উপত্যকার নাম হচ্ছে ‘উরনা’। এটা আরাফার এলাকার বাইরে অবস্থিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উরনা উপত্যকা থেকে আরাফার ভাষণ দিয়েছেন।

أَلاَ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ مَوْضُوعٌ.

"জেনে রাখো! নিশ্চয় জাহিলিয়্যাতের প্রত্যেকটি বিষয় আমার এই দুই পায়ের তলে রাখা হয়েছে।"

وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا دَمُ. دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ)

"জাহিলী যুগের যাবতীয় রক্তের দাবী রহিত করা হলো। আমাদের রক্তের দাবীসমূহের মধ্যে প্রথম রক্তের দাবী যা রহিত করা হলো, তা ইবন রবী'আ ইবনুল-হারিসের রক্তের দাবী। সে সা'দ গোত্রে দুধ পানরত অবস্থায় ছিল। হুযাইল গোত্র তাকে হত্যা করেছিল।"

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

"জাহেলী যুগের সুদ রহিত করা হল। সর্বপ্রথম যে সুদের দাবী রহিত করছি তা হলো আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তা পরিপূর্ণরূপে রহিত করা হলো।"

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

"আর তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং তাদের

লজ্জাস্থানসমূহকে আল্লাহর বাণী[325] দ্বারা হালাল করে নিয়েছ।”

 وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

“নিশ্চয় তোমাদের ব্যাপারে তাদের ওপর দায়িত্ব হচ্ছে, তারা যেন তোমাদের বিছানাসমূহকে এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা পদদলিত না করে যাকে তোমরা অপছন্দ কর (অর্থাৎ তারা যেন পরপুরুষদেরকে তাদের কাছে আসার অনুমতি না দেয়)। যদি তারা তা করে, তোমরা তাদেরকে মৃদুভাবে প্রহার কর।”

 وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“আর তাদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর দায়িত্ব হচ্ছে, উত্তম পন্থায় তাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা।”

 وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ

“আমি তোমাদের মধ্যে রেখে গেলাম আল্লাহর কিতাব। যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর এরপরে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।”

 وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ.

“আমার ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তখন তোমরা কি বলবে? তারা বলল, আমরা সাক্ষী দিচ্ছি, নিশ্চয় আপনি আপনার

---

[325] আল্লাহর বাণীটি হচ্ছে, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ “তাহলে তোমরা বিয়ে কর মহিলাদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩]

রবের বাণীসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, অর্পিত দায়িত্ব আদায় করেছেন, উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন।”

 ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكِبُهَا إِلَى النَّاسِ «اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ».

“অতঃপর তিনি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলী আকাশের দিকে তুলে মানুষের দিকে ইশারা করে বললেন, হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।”

দুই ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় ও আরাফায় অবস্থান

৬১- [এরপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আযান দিলেন।[326]]

৬২- অতঃপর ইকামত দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সবাইকে নিয়ে) যোহরের সালাত আদায় করলেন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় ইকামত দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাতও আদায় করলেন।

৬৩- তিনি উভয় সালাতের মাঝখানে অন্য কোনো সালাত আদায় করেন নি।

৬৪- অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [কাসওয়া নামক উটের[327]] পিঠে আরোহন করলেন। এমনকি তিনি উকুফের স্থানে এলেন। তাঁর বাহন কসওয়ার পেট বড় বড় পাথরের দিকে ফিরিয়ে রাখলেন এবং যারা পায়ে হেঁটে তাঁর সাথে এসেছিলেন, তিনি

---

[326] দারেমী, হাদীস নং ১৮৯২।

[327] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৭৯।

তাদের সকলকে তাঁর সামনে রাখলেন। অতঃপর কিবলামুখী হলেন।[328]

৬৫- তিনি সেখানেই উকূফ করতে থাকলেন, এমনকি সূর্য ডুবে গেলে। (পশ্চিম আকাশের) হলুদ আভা ফিকে হয়ে গেল এমনকি লালিমাও দূর হয়ে গেল[329]।

৬৬- আর তিনি বললেন,

«قَدْ وَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»

"আমি এখানে উকুফ করলাম কিন্তু আরাফার পুরো এলাকা উকূফের স্থান।"[330]

৬৭- এরপর তিনি উসামা ইবন যায়েদকে তাঁর উটের পেছনে বসালেন।

আরাফা থেকে প্রস্থান

৬৮- অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হলেন। 'আর তিনি তখন ছিলেন শান্ত-সুস্থির।'[331]

---

[328] অন্য হাদীসে এসেছে, তিনি উকূফ করেছেন, উভয় হাত তুলে দো'আ করেছেন। হাজ্জাতুন নাবী, পৃ. ৩৭।

[329] সূর্যাস্তের পর আরাফাহ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্থান মুশরিকদের আচারের সাথে ভিন্নতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই ছিল। কেননা মুশরিকরা সূর্যাস্তের আগেই আরাফা ত্যাগ করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের আদর্শ তাদের থেকে ভিন্ন।

[330] আবূ দাঊদ, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ।

[331] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯২০; নাসাঈ, হাদীস নং ৩০২১।

কাসওয়া নামক উটের লাগাম শক্তভাবে টেনে ধরলেন, এমনকি উটের মাথা তাঁর হাওদার[332] সাথে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আর তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ»

"হে লোক সকল! শান্ত হও শান্ত হও, ধীর-স্থিরভাবে এগিয়ে চল"।

৬৯- যখনই তিনি কোনো বালুর টিলায় পৌঁছতেন, তখনই তা অতিক্রম করার সুবিধার্থে উটের রশি ঢিলা করে দিতেন। এমনিভাবে এতে উঠে তা অতিক্রম করতেন।

মুযদালিফায় দুই সালাত একসাথে আদায় এবং সেখানে রাত্রি যাপন

৭০- অবশেষে তিনি মুযদালিফায় এলেন। অতঃপর এক আযান ও দুই ইকামতসহ মাগরিব ও এশার সালাত একসাথে আদায় করলেন।

৭১- এ দু'সালাতের মাঝখানে তিনি কোনো তাসবীহ বা নফল সালাত আদায় করলেন না।

৭২- এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে পড়লেন। তিনি শোয়া অবস্থায় ফজর (সুবহে সাদিক) উদয় হলো।

৭৩- ফজরের সময় নিশ্চিত হওয়ার পর (আওয়াল ওয়াক্তে) আযান ও ইকামতের পর ফজরের সালাত আদায় করেন।

---

[332] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯০৫।

মাশ‘আরে হারাম তথা মুযদালিফায় অবস্থান

৭৪- অতঃপর তিনি কাসওয়ায় আরোহন করে মাশ‘আরে হারামে এলেন। [তিনি তাতে চড়লেন।[333]]

৭৫- এরপর তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দো‘আ করলেন।[334] [অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করলেন।[335]] তাঁর মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন।

৭৬- পূর্ব আকাশ পূর্ণ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন।

৭৭- [তিনি বললেন,

«قَدْ وَقَفْتُ هَهُنَا وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»

“আমি এখানে অবস্থান করেছি কিন্তু মুযদালিফার পুরোটাই অবস্থানস্থল।”[336]]

জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা

৭৮- অতঃপর তিনি সূর্য উঠার পূর্বেই [মুযদালিফা[337]] থেকে মিনার

---

[333] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯০৫।

[334] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯০৫।

[335] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯০৫।

[336] নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৪৫।

[337] বাইহাকী, আসসুনানুল কুবরা, হাদীস নং ৯৫২০।

দিকে রওয়ানা হলেন।[338] [আর তিনি ছিলেন শান্ত ও সুস্থির।[339]]

৭৯- তিনি ফযল ইবন আব্বাসকে নিজের উটের পেছনে বসালেন। আর সে ছিল সুন্দর চুল, উজ্জ্বল ফর্সার অধিকারী ব্যক্তি।

৮০- রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর কাছ দিয়ে কতিপয় মহিলা চলতে লাগল, আর ফযল তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ফযলের চেহারায় রাখলেন। আর ফযল তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত অন্য দিক থেকে সরিয়ে ফযলের চেহারার উপর আবার রেখে যেদিকে সে দেখছিল সেদিক থেকে তার চেহারা ঘুরিয়ে দিলেন।

৮১- অবশেষে তিনি মুহাস্সার উপত্যকার কোলে[340] পৌঁছলে উটের গতি কিছুটা বাড়িয়ে দিলেন [এবং বললেন, «عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» “তোমরা শান্ত ও সুস্থিরভাবে চল।”[341]]

---

[338] সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে প্রস্থান মুশরিকদের আচারের সাথে ভিন্নতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই ছিল। কেননা মুশরিকরা মুযদালিফা ত্যাগ করতো সূর্যোদয়ের পর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমাদের আদর্শ ওদের থেকে ভিন্ন।’

[339] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৪৪।

[340] এই জায়গাতে আবরাহার হস্তি বাহিনীকে আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংশ করে দিয়েছিলেন। ইবনুলবলেন .কাইয়্যেম রহ-, মুহাস্সর মিনা ও মুযদালিফার মাঝখানে অবস্থিত। এটা মিনা ও মুযদালিফার অন্তর্ভুক্ত নয়।

[341] দারেমী, হাদীস নং ১৯৩৩।

বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ

৮২- তারপর তিনি মাঝপথ ধরে চলতে থাকলেন, যা তোমাকে বড় জামরার নিকট দিয়ে বের করে দেয়।[342] অবশেষে তিনি গাছের সন্নিকটে অবস্থিত জামরায় এসে পৌঁছলেন।

৮৩- অতঃপর [সূর্য পূর্ণ আলোকিত হওয়ার পর[343]] তিনি বড় জামরাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন।

৮৪- প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বললেন। বুটের ন্যায় ছিল প্রত্যেকটি কঙ্কর।

৮৫- তিনি তাঁর বাহনে আরোহন অবস্থায় উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন 'আর তিনি'[344] বলছিলেন,'

«لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ»

'তোমরা যেন তোমাদের হজের বিধি-বিধান শিখে নাও। কেননা আমার জানা নেই, হয়ত আমি এই হজের পরে আর হজ করতে পারব না।'[345]

৮৬- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

342 নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৫৪; আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯০৫।

343 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৯; সহীহ ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ২৯৬৭; বাইহাকী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, হাদীস নং ১০২৩৮।

344 নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৬২।

345 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৭৯; আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯৭০।

ওয়াসাল্লাম [তাশরীকের সকল দিনে[346]] [সূর্য হেলে যাওয়ার পরে[347]] কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন[348]।

৮৭- [তিনি আকাবা তথা বড় জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপরত অবস্থায় সুরাকা তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। অতঃপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ এটা কি খাস করে আমাদের জন্য? তিনি বললেন,

«لاَ بَلْ لأَبَدٍ»

“না। বরং সবসময়ের জন্য।”[349]]

পশু যবেহ ও মাথা মুণ্ডন

৮৮- অতঃপর তিনি পশু যবেহের স্থানে গেলেন। নিজ হাতে তেষট্টিটি [উট[350]] যবেহ করলেন।

৮৯- অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবশিষ্টগুলো যবেহ করার দায়িত্ব দিলেন তিনি তাকে নিজের হাদীতে শরীক রাখলেন।

৯০- এরপর প্রত্যেক যবেহকৃত জন্তু থেকে এক টুকরো করে নিয়ে রান্না করতে হুকুম দিলেন। সবটুকরোগুলো এক পাতিলে রেখে রান্না করা হল। অতঃপর দু’জনে গোশত খেলেন এবং শুরবা পান করলেন।

---

[346] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৫২৯১।

[347] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৯।

[348] যিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে বলা হয় আইয়্যামে তাশরীক।

[349] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৩০।

[350] ইবন মাজাহ্‌, হাদীস নং ৩০৭৪।

৯১- [এক বর্ণনায় এসেছে, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে একটি গাভী যবেহ করেছেন।[351]]

৯২- [অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট যবেহ করেছেন। আর সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গাভী যবেহ করেছেন।[352]] সুতরাং আমরা সাতজন উটে শরীক হলাম। একজন লোক রাসূলকে বললেন, আপনি কি মনে করেন, গাভিতেও শরীক হওয়া যাবে? তখন তিনি বললেন,

«مَا هِيَ إِلاَّ مِنَ الْبُدْنِ»

“গাভীতো উটের (বিধানের) অন্তর্ভুক্ত।”[353]

৯৩- অপর বর্ণনায় জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা মিনায় তিনদিন উটের গোশত খেয়ে বিরত রইলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুমতি দিয়ে বললেন,

«كُلُوا وَتَزَوَّدُوا»

“তোমরা খাও এবং পাথেয় হিসেবে রেখে দাও[354]”[355] [জাবের

---

[351] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩১৯।

[352] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৩।

[353] সহীহ বুখারী ফিত তারীখ।

[354] মুশরিকরা তাদের যবেহকৃত হাদীর গোশত ভক্ষণ করত না। তা তারা নিজেদের জন্য হারাম মনে করত। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা খাওয়ার আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে জাহেলী কু-প্রথাগুলোর বিলুপ্তি ঘটান।

[355] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৪১২।

রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আমরা খেলাম এবং জমা করে রাখলাম।[356]] [এমনকি এগুলো নিয়ে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম।[357]]

১০ যিলহজের আমলসমূহে ধারাবাহিকতা রক্ষা না হলে অসুবিধা নেই

৯৪- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশু যবেহ করলেন, [অতঃপর মাথা মুণ্ডন করলেন।[358]]

৯৫- [কুরবানীর দিন মিনাতে[359]] মানুষের প্রশ্নোত্তরের জন্য বসলেন, [সে দিনের[360]] আমলগুলোতে [আগে পরে হয়েছে[361]] এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন,

«لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ»

“কোনো সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই”।

এমনকি এক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«وَلاَ حَرَجَ»

“কোনো সমস্যা নেই।”

---

356 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭১৯; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৪১২।

357 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৪১২।

358 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৬৩৯১।

359 ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৩০৫২।

360 ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৩০৫২।

361 ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৩০৫২।

৯৬- অন্য একজন এসে বললেন, ‘আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«لاَ حَرَجَ»

“কোনো সমস্যা নেই।”

৯৭- এরপর আরেক জন বললেন, আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে তাওয়াফ করেছি, তিনি বললেন,

«لاَ حَرَجَ»

“কোনো সমস্যা নেই।”[362]

৯৮- [অন্য আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমি পশু যবেহের আগে তাওয়াফ করেছি। তিনি বললেন, যবেহ কর।

«لاَ حَرَجَ»

‘কোন সমস্যা নেই।’[363]]

৯৯- [অন্য আরেক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে পশু যবেহ করেছি। তিনি বললেন,

«ارْمِ، وَلاَ حَرَجَ»

“নিক্ষেপ কর। কোনো সমস্যা নেই।”[364]]

---

[362] দারেমী, হাদীস নং ১৯২১।

[363] দারেমী, হাদীস নং ১৯২১।

[364] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৬৮০০।

১০০- [অতঃপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«قَدْ نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ»

"আমি এখানে যবেহ করলাম, আরা মিনা পুরোটাই যবেহের স্থান।"[365]]

১০১- «وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ» ["মক্কার প্রতিটি অলিগলি, চলার পথ এবং যবেহের স্থান।"[366]]

১০২- فانحروا في رحالكم ["অতএব, তোমরা তোমাদের অবস্থানস্থলে পশুসমূহ থেকে যবেহ কর।"[367]]

ইয়াউমুন-নহর তথা ১০ তারিখের ভাষণ

১০৩- জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন,

 «أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟» فَقَالُوْا: يَوْمُنَا هَذَا

"সম্মানের দিক থেকে কোনো দিনটি সবচেয়ে বড় ? তারা বললেন, আমাদের এই দিনটা।"

 قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟» قالوا: شَهْرُنَا هَذَا

---

[365] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৪৪০।

[366] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯৩৭।

[367] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

“তিনি বললেন, কোনো মাস সম্মানের দিক থেকে সবচেয়ে বড়? তারা বললেন, আমাদের এই মাস।”

 قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟» فَقَالُوْا: بَلَدُنَا هَذَا

“তিনি বললেন, কোনো শহর সম্মানের দিক থেকে সবচেয়ে বড়? তারা বললেন, আমাদের এই শহর।”

 قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا»

“তিনি বললেন। নিশ্চয় তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ আজকের এই দিন, এই শহর, এই মাসের ন্যায় সম্মানিত।”

 «هَلْ بَلَّغْتُ ؟ » قَالُوْا: نَعَمْ . قَالَ: «اَللَّهُمَّ اشْهَدْ».

“আমি কি পৌঁছাতে পেরেছি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।”[368]

তাওয়াফে ইফাযা তথা বায়তুল্লাহর ফরয তাওয়াফ আদায়

১০৪- ‘অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে সাওয়ার হয়ে মক্কায় গেলেন। তিনি তাওয়াফা ইফাযা (তথা বায়তুল্লাহর ফরয তাওয়াফ) করে নিলেন। [সাহাবীগণও তাওয়াফ করে নিলেন।]

১০৫- [রাসূলের সাথে যারা কিরান হজ করেছিলেন তারা সাফা ও

---

[368] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭১৪।

মারওয়ায় সাঈ করেন নি।[369]]

১০৬- অতঃপর তিনি মক্কায় যোহরের সালাত আদায় করলেন।

১০৭- তারপর আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের সন্তানদের নিকট এলেন, [আর তারা[370]] যমযমের পানি পান করাচ্ছিল তিনি বললেন,

«انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ»

“হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ! বালতি ভর্তি করে পানি তুলে তা হাজীদেরকে পান করাও। তোমাদের কাছ থেকে পানি পান করানোর দায়িত্ব কেড়ে নেওয়ার ভয় না থাকলে আমিও নিজ হাতে তোমাদের সাথে বালতি ভরে পানি তুলে তা পান করাতাম।”

১০৮- অতঃপর তারা তাঁকে বালতি ভরে পানি দিলেন, আর তিনি তা পান করলেন।

হজের পর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উমরা পালন

১০৯- [জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঋতুবতী হলেন, তিনি হজের সমস্ত আমল সম্পন্ন করলেন। কিন্তু বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ করেন নি।[371]]

১১০- [তিনি বললেন, যখন তিনি পবিত্র হলেন, কা‘বার তাওয়াফ

---

[369] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৭৮৮; ত্বা-হাবী, হাদীস নং ২৪৩৬।

[370] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯০৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪।

[371] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৮৫; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৪৯৩২।

করলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا»

“তুমি তো তোমার হজ ও উমরা উভয় থেকে হালাল হয়েছে।”[372]]

১১১- [আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, তোমরা সবাই হজ ও উমরা করে যাবে আর আমি কি শুধু হজ করে যাব?[373]] তিনি বললেন,

«إِنَّ لَكِ مِثْلَ مَا لَهُمْ»

[তোমারও তো তাদের মতো হজ ও উমরা হয়ে গিয়েছে।[374]]

১১২- [আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি মনে কষ্ট পাচ্ছি, কেননা আমি তো শুধু হজের পরে বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ করেছি।[375]]

১১৩- [জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নরম স্বভাবের লোক ছিলেন। যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা কিছু কামনা করতেন, তিনি সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন।[376]]

---

[372] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৩; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৮৫।

[373] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৮৫; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪২৭৯।

[374] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৯৪৩।

[375] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৩; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৮৫; নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৩২২।

[376] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৩।

১১৪- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ»

“হে আব্দুর রহমান তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং তাকে তানঈম থেকে উমরা করাও।”[377]

১১৫- [অতএব, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হজের পরে উমরা করলেন।[378]] [এরপর ফিরে এলেন।[379]] [এই ঘটনাটি ছিল হাসবার রাতে[380,381]]

---

[377] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন ‘আল্লাহর শপথ মুশরিকদের প্রথা বাতিল করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে যিলহজ মাসে উমরা করিয়েছেন। কুরাইশ গোত্র ও তাদের অনুসারীরা বলতো, ’যখন উটের লোম গজিয়ে বেশি হবে এবং পৃষ্ঠদেশ সুস্থ হবে এবং সফর মাস প্রবেশ করবে তখনই উমরাকারীর উমরা সহীহ হবে’। তারা যিলহজ ও মুহররম শেষ হওয়ার পূর্বে উমরা হারাম মনে করত।’ (আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৮৭)

[378] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৪৯৩৩।

[379] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৯৪২।

[380] সেটি হচ্ছে আইয়ামে তাশরীকের পরের রাত্রী। অর্থাৎ ১৪ তারিখের রাত। এটাকে মুহাস্সাবের রাতও বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ ১৪ তারিখের রাতে এই জায়গায় রাত যাপন করেছিলেন। যেসব জায়গায় পূর্বে শির্ক বা কুফর কর্ম অথবা আল্লাহর শত্রুতা প্রকাশ করা হয়েছে সেসব জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেছেন। এই মর্মে তিনি মীনায় বলেন, ‘আমরা আগামীকাল বনু কিনানার খায়ফে (অর্থাৎ মুহাস্সব তথা হাসবা নামক জায়গায়) যেতে যাচ্ছি, যেখানে তারা কুফরকর্মের ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল, আর তা

১১৬- [জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী হজে নিজের বাহনে আরোহন করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন আর নিজের বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন, যাতে মানুষেরা তাঁকে দেখতে পায় এবং উপরে হয়ে তাদের তত্বাবধান করতে পারেন। আর যাতে তারা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করতে পারে। কেননা মানুষেরা তাঁকে ঘিরে রাখছিল।[382]]

১১৭- [জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'একজন মহিলা তার একটি বাচ্চা তাঁর সামনে উঁচু করে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই বাচ্চা কি হজ করতে পারবে? তিনি বললেন, «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» "হ্যাঁ। আর তোমার জন্য রয়েছে পুরস্কার।"[383]]

ছিল এই যে কুরাইশ ও কিনানাহ, বনু হাশীম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব এর বিরুদ্ধে এই মর্মে শপথ করেছিল যে, তাদের সাথে তারা বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করবে না, বেচাকেনা করবে না, যতক্ষণ না নবীকে তাদের কাছে সোপর্দ করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৯০।) ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, 'এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস যে তিনি কুফরের নিদর্শনের স্থানসমূহে তাওহীদের নিদর্শন প্রকাশ করতেন। (যাদুল মা'আদ)

[381] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৩; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৮৫।

[382] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৭৩।

[383] তিরমিযী, হাদীস নং ৯২৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯১০।

পঞ্চম অধ্যায়: উমরা

- প্রথম. ইহরাম
- দ্বিতীয়. মক্কায় প্রবেশ
- তৃতীয়. মসজিদে হারামে প্রবেশ
- চতুর্থ. বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ
- পঞ্চম. সাঈ
- ষষ্ঠ. মাথার চুল ছোট বা মুণ্ডন করা

উমরা

বাংলাদেশী হাজীদের অধিকাংশই তামাত্তু হজ করে থাকেন। আর তামাত্তু হজের প্রথম কাজ উমরা আদায় করা। তাই নিম্নে উমরা আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

উমরার পরিচয়:

ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ করা, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো এবং মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা- এই ইবাদত সমষ্টির নাম উমরা। এসবের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রথম. ইহরাম:

যেভাবে ফরয গোসল করা হয় মীকাতে পৌঁছার পর সেভাবে গোসল করা সুন্নাতপ্ম যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে যেমন উল্লিখিত হয়েছে:

«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ».

"তিনি দেখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের জন্য আলাদা হলেন এবং গোসল করলেন।"[384]

ইহরাম-পূর্ব এই গোসল পুরুষ-মহিলা সবার জন্য এমনকি হায়েয ও নিফাসবতী মহিলার জন্যও সুন্নাতপ্ম কারণ, বিদায় হজের সময় যখন আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর পুত্র মুহাম্মাদ ইবন আবূ

[384] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৩০; ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২৫৯৫; বাইহাকী, হাদীস নং ৮৯৪৪।

বকর জন্ম গ্রহণ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশ্যে বলেন,

«اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي».

“তুমি গোসল করো, কাপড় দিয়ে রক্ত আটকাও এবং ইহরাম বেঁধে নাও।”[385]

অতঃপর নিজের কাছে থাকা সর্বোত্তম সুগন্ধি মাথা ও দাড়িতে ব্যবহার করবেন। ইহরামের পর এর সুবাস অবশিষ্ট থাকলেও তাতে কোনো সমস্যা নেই। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে যেমনটি জানা যায়, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের প্রস্তুতিকালে তাঁর কাছে থাকা উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। ইহরামের পরও আমি তাঁর চুল ও দাড়িতে এর তেলের উজ্জ্বলতা দেখতে পেতাম।”[386]

প্রয়োজন মনে করলে এ সময় বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করবেন; নখ ও গোঁফ কর্তন করবেন। ইহরামের পর যাতে এসবের প্রয়োজন না হয়- যা তখন নিষিদ্ধ থাকবে। এসব কাজ সরাসরি সুন্নাত নয়। ইবাদতের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে এসব করা উচিৎ৷ইহরাম

---

[385] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮; নাসাঈ, হাদীস নং ২৯১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪।

[386] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯০।

বাঁধার অল্পকাল আগে যদি এসব কাজ করে ফেলা হয় তাহলে ইহরাম অবস্থায় আর এসব করতে হবে না। এ থেকে আবার অনেকে ইহরামের আগে মাথার চুল ছোট করাও সুন্নাত মনে করেন। ধারণাটি ভুল। আর এ উপলক্ষে দাড়ি কাটার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, দাড়ি কাটা সবসময়ই হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ».

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচারণ করো। দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ ছোট করো।"[387]

গোসল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধি ব্যবহার -এসব পর্ব সমাপ্ত করার পর ইহরামের পোশাক পরবেন। সম্ভব হলে কোনো নামাজের পর এটি পরিধান করবেন। যদি এসময় কোনো ফরয সালাত থাকে তাহলে তা আদায় করে ইহরাম বাঁধবেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। নয়তো দু'রাকাত 'তাহিয়্যাতুল অযু' সালাত পড়ে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন।

জেনে নেওয়া ভালো, পুরুষদের ইহরামের পোশাক হলো, চাদর ও লুঙ্গি। তবে কাপড় দু'টি সাদা ও পরিষ্কার হওয়া মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে মহিলারা ইহরামের পোশাক হিসেবে যা ইচ্ছে তা পরতে পারবেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে পোশাকটি যেন ছেলেদের পোশাক সদৃশ না হয় এবং তাতে মহিলাদের সৌন্দর্যও প্রস্ফুটিত না হয়। অনুরূপভাবে তারা নেকাব দ্বারা চেহারা আবৃত করবেন না। হাত মোজাও পরবেন

---

[387] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৯।

না। তবে পর পুরুষের মুখোমুখি হলে চেহারায় কাপড় টেনে দিবেন। ইহরাম অবস্থায় জুতোও পরতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْعَقِبَيْنِ».

“তোমাদের প্রত্যেকে যেন একটি লুঙ্গি, একটি চাদর ও একজোড়া জুতো পরে ইহরাম বাঁধে। যদি জুতা না থাকে তাহলে মোজা পরবে। আর মোজা জোড়া একটু কেটে নিবে যেন তা পায়ের গোড়ালীর চেয়ে নিচু হয়।”[388]

উল্লিখিত সবগুলো কাজ শেষ হবার পর অন্তর থেকে উমরা শুরুর নিয়ত করবেন। আর বলবেন, لَبَّيْكَ عُمْرَةً ('লাব্বাইকা উমরাতান') অথবা لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً ('লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান')প্ল উত্তম হলো, বাহনে চড়ার পর ইহরাম বাঁধা ও তালবিয়া পড়া। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাত থেকে রওনা হবার উদ্দেশ্যে বাহনে চড়ে বসেছেন তারপর সেটি নড়ে উঠলে তিনি তালবিয়া পড়া শুরু করেছেন।

আর যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধবে সে যদি রোগ বা অন্য কিছুর আশংকা করেন, যা তার উমরার কাজ সম্পাদনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাহলে উমরা শুরুর প্রাক্কালে এভাবে নিয়ত করবেন,

---

[388] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৪৮৯৯; ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২৬০১।

«اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

(আল্লাহুম্মা মাহাল্লী হায়ছু হাবাসতানী।)

“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যেখানে আটকে দিবেন, সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।”[389] অথবা বলবেন,

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، وَمَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي».

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ওয়া মাহাল্লী মিনাল আরদি হায়ছু তাহবিসুনী)

“লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। আর যেখানে আপনি আমাকে আটকে দিবেন, সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।”[390] কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুবা‘আ বিনতে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এমনই শিক্ষা দিয়েছেন।

এসব কাজ সম্পন্ন করার পর অধিকহারে তালবিয়া পড়তে থাকুন। কারণ, তালবিয়া হজের শব্দগত নিদর্শন। বিশেষত স্থান, সময় ও অবস্থার পরিবর্তনকালে বেশি বেশি তালবিয়া পড়বেন। যেমন, উচ্চস্থানে আরোহন বা নিম্নস্থানে অবতরণের সময়, রাত ও দিনের পরিবর্তনের সময় (সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে), কোনো অন্যায় বা অনুচিত কাজ হয়ে গেলে এবং সালাত শেষে- ইত্যাদি সময়ে।[391] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া পড়তেন এভাবে:

---

[389] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০৭।

[390] নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৬৬।

[391] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৮১।

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ».

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারীকা লাক।)[392] কখনো এর সাথে একটু যোগ করে এভাবেও পড়তেন:[393]

لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ ، لَبَّيْكَ.

(লাব্বাইক ইলাহাল হাক্ক লাব্বাইক)।

ইহরাম পরিধানকারী যদি لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ (লাব্বাইকা যাল মা‘আরিজ) তালবিয়ায় যোগ করেন, তাও উত্তম। বিদায় হজে সাহাবীরা তালবিয়ায় নানা শব্দ সংযোজন করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব শুনেও তাদের কিছু বলেন নি।[394]

যদি তালবিয়ায় এভাবে সংযোজন করে:

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

(লাব্বাইক, লাব্বাইকা ওয়া সা‘দাইকা ওয়াল খইরা বিইয়াদাইকা, লাব্বাইকা ওয়ার রগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমাল)। তবে তাতেও কোনো অসুবিধে নেই। কারণ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ ধরনের বাক্য সংযোজনের

---

[392] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৯, ৫৯১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৮৪।

[393] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯২০; নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৫২।

[394] মুসনাদ, হাদীস নং ১৪৭৫।

প্রমাণ রয়েছে।[395]

পুরুষদের জন্য তালবিয়া উচ্চস্বরে বলা সুন্নাতপ্ন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ .بِالإِهْلاَلِ - أَوْ قَالَ – بِالتَّلْبِيَةِ».

"আমার কাছে জিবরীল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। তিনি আমাকে (উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়তে) নির্দেশ দিলেন এবং এ মর্মে আমার সাহাবী ও সঙ্গীদের নির্দেশ দিতে বললেন যে, তারা যেন ইহলাল অথবা তিনি বলেছেন তালবিয়া উঁচু গলায় উচ্চারণ করে।"[396]

তাছাড়া তালবিয়া জোরে উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শনের প্রকাশ ঘটে, একত্ববাদের দীপ্ত ঘোষণা হয় এবং শির্ক থেকে পবিত্রতা প্রকাশ করা হয়। পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য সকল আলেমের ঐকমত্যে তালবিয়া, যিকির ও দো'আ ইত্যাদি শাব্দিক ইবাদতে স্বর উঁচু না করা সুন্নাতপ্নএটাই পর্দা রক্ষা এবং ফিতনা দমনে সহায়ক।

ইহরামের আগে ও পরে হজ-উমরাকারীরা যেসব ভুল করে থাকেন

১. সমুদ্র বা আকাশ পথে মীকাতের সমান্তরাল হলে ইহরাম না বেঁধে বিমান অবতরণ করা পর্যন্ত দেরি করা। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[395] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮৪।

[396] আবু দাঊদ, হাদীস নং ১৮১৪।

«هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.»

"এই মীকাতগুলো এসবের অধিবাসী এবং এসব স্থানে পদার্পণকারী বহিরাগত প্রতিটি হজ ও উমরাকারীর জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান।"[397]

অতএব, বিমানে বা জাহাজে আগমনকারীর কর্তব্য হলো, মীকাতে পৌঁছার আগেই ইহরামের পোশাক পরে নিবে কিংবা ইহরামের কাপড় হাতে নিয়ে রাখবে, যাতে মীকাতে পৌঁছা মাত্র তা পরে নিতে পারে। যে বিমানে ইহরামের পোশাক পরার কথা ভুলে যায় কিংবা তার পক্ষে ব্যাগ থেকে কাপড় বের করা সম্ভব না হয়, সে তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে একটি চাদর ও একটি লুঙ্গি পরে নিবেপ্যযদি লুঙ্গি পরার সুযোগ না পায় তাহলে আপাতত পাজামা বা প্যান্ট পরেই লজ্জাস্থান ঢাকবে। তারপর যখন সুযোগ পাবে, পাজামা খুলে ইহরামের কাপড় পরে নিবেপ্যএ জন্য তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ»

"যার লুঙ্গি নেই সে পাজামা পরে নিবে।"[398]

২. অনেক মহিলা ধারণা করেন, ইহরামের জন্য কালো, সবুজ বা সাদা এ জাতীয় বিশেষ পোশাক রয়েছে। এর কোনো ভিত্তি নেই। মহিলারা যেকোনো কাপড় পরিধান করতে পারবেন। তবে পোশাকটি সৌন্দর্য প্রদর্শনে সহায়ক কিংবা পুরুষ বা অমুসলিমদের সাথে

---

[397] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮১।

[398] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৪৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭৮।

সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারবে না।

৩. অনেকের ধারণা, ইহরামের পোশাক ময়লা হলে বা ছিঁড়ে গেলেও পরিবর্তন করা যায় না। এটা ঠিক নয়। সঠিক হলো, মুহরিমের জন্য ইহরামের পোশাক খোলা এবং যখন ইচ্ছা পরিবর্তন করার অনুমতি রয়েছে।

৪. অনেক মহিলা তার চেহারা ও নেকাবের মধ্যস্থানে কাঠ বা এ জাতীয় কিছু রাখেন। যাতে নেকাব তার চেহারা স্পর্শ না করে। এও এক ভিত্তিহীন লৌকিকতা। ইসলামের সূচনা যুগের কোনো মুসলিম মহিলা এমন করেন নি; বরং মহিলারা পরপুরুষ সামনে এলে মুখে নেকাব না দিয়ে ওড়না ঝুলিয়ে চেহারা আড়াল করবে। পরপুরুষ না থাকলে মুখ খোলা রাখবেন। ওড়না তার চেহারা স্পর্শ করলেও কোনো সমস্যা নেই।

৫. উমরা বা হজ করার নিয়ত করেও অনেক মহিলা হায়েয বা নিফাস অবস্থায় মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধেন না। এ এক প্রকাশ্য ভুল। নিফাস বা হায়েযবতী মহিলার জন্যও মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা ফরয। উপরন্তু নিফাস বা হায়েযবিহীন স্বাভাবিক মহিলাদের মতো তাদের জন্যও গোসল ও পবিত্রতা অর্জন করার বিধান রাখা হয়েছে। নিফাস ও হায়েযবতী মহিলারা অন্যসব হজ ও উমরাকারীর ন্যায় সবই করতে পারবেন। কেবল পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করতে পারবেন না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতে উমাইসকে মীকাতে (বাচ্চা প্রসব করার পর) নিফাস শুরু হলে বলেন,

«اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي».

“গোসল করো, কাপড় দিয়ে রক্ত আটকাও আর ইহরাম বেঁধে নাও।”[399] আর ইহরাম অবস্থায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার ঋতুস্রাব শুরু হলে তাঁর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

«إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ».

“এটি এমন এক বিষয় যা আল্লাহ তা‘আলা আদম কন্যাদের ওপর লিখে দিয়েছেন। (এটা তো হবেই) সুতরাং তুমি অন্য হাজীদের মতো সবই করতে পারবে, কেবল বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করবে না।”[400]

৬. ইহরামের সময় দুই রাকাত সালাত পড়া ওয়াজিব মনে করা।

৭. অনেকে ইহরামের পোশাক পরলেই ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে বলে মনে করেন; কিন্তু সঠিক হলো, বান্দা ইহরাম বাঁধার নিয়ত করলেই কেবল ঐসব কাজ নিষিদ্ধ হয়। চাই তিনি তার আগে ইহরামের পোশাক পরুন বা তার পরে।

৮. অনেকে শিশু-কিশোরদের ইহরামের পর তাদেরকে ক্লান্ত দেখে হজ ভেঙ্গে দেয়। এটিও ভুল। বরং শিশুর অভিভাবকের উচিৎ, তাকে হজের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থন ও সহযোগিতা করা। যেগুলো সে আদায় করতে পারবে না, অভিভাবক তার পক্ষে সেগুলো আদায় করবেন।

---

[399] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[400] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১১।

৯. সমবেত কণ্ঠে তালবিয়া পড়া শরী‘আত কর্তৃক অনুমোদিত নয়। কারণ, তালবিয়া এমন একটি ইবাদত যা কেবল সেভাবেই করা যায় যেভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সমবেতকণ্ঠে তালবিয়া পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১০. অনর্থক কথা বা কাজ এবং যা পরে করলেও চলে এমন কাজে লিপ্ত হয়ে তালবিয়া পড়া থেকে বিরত থাকা। এর চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার হলো, গীবত, চোগলখোরি কিংবা গান বা অনর্থক কোনো কাজে মূল্যবান সময় নষ্ট করা।

দ্বিতীয়. মক্কায় প্রবেশ:

পবিত্র মক্কায় প্রবেশের সময় প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কথা স্মরণ করা। মনকে নরম করা। আল্লাহর কাছে পবিত্র মক্কা যে কত সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ তা স্মরণ করা। পবিত্র মক্কায় থাকা অবস্থায় পবিত্র মক্কার যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা। হজ ও উমরাকারী ব্যক্তির ওপর পবিত্র মক্কায় প্রবেশের পর নিম্নরূপে আমল করা মুস্তাহাব।

১. উপযুক্ত কোনো স্থানে বিশ্রাম নেয়া, যাতে তাওয়াফের পূর্বে সফরের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। শরীরের স্বতস্ফূর্ততা ফিরে আসে। বিশ্রাম নিতে না পারলেও কোনো সমস্যা নেই। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«بَاتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজের সফরে) যী-তুয়ায় এসে

রাত যাপন করলেন। সকাল হওয়ার পর তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন।”[401] ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মক্কায় আসলে যী-তুয়ায় রাত যাপন করতেন। ভোর হলে গোসল করতেন। তিনি বলতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করতেন।[402] বর্তমানে মক্কায় হাজীদের বাসস্থানে গিয়ে গোসল করে নিলেও এ সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

২. মুহরিমের জন্য সবদিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশের অবকাশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ».

“মক্কার প্রতিটি অলিগলিই পথ (প্রবেশের স্থান)।”[403]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতহার মুয়াল্লার দিক থেকে, যা বর্তমানে হাজূন নামক উঁচু জায়গায় অবস্থিত ‘কাদা’ নামক পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং নিচু জায়গা অর্থাৎ ‘কুদাই’ নামক পথ দিয়ে বের হন।[404]

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে কারো পক্ষে মক্কায় প্রবেশ ও প্রস্থান করা সম্ভব হলে তা হবে উত্তম।

---

[401] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৭৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫৯। (বর্তমানে জারওয়াল এলাকায় অবস্থিত প্রসূতি হাসপাতালের জায়গাটির নাম ছিল যী-তুয়া।)

[402] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫৯।

[403] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯৩৭।

[404] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৭৬, অনুরূপ, হাদীস নং ১৫৭৭, ১৫৭৮, ১৫৭৯, ১৫৮০, ১৫৮১।

কিন্তু বর্তমান-যুগে মোটরযানে করে আপনাকে মক্কায় নেওয়া হবে। আপনার বাসস্থানে যাওয়ার সুবিধামত পথেই আপনাকে যেতে হবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেছেন, সেদিন থেকে প্রবেশ করা আপনার জন্য সম্ভব নাও হতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। আপনার গাড়ি সুবিধামত যে পথ দিয়ে যাবে, সেপথে দিয়েই আপনি যাবেন। আপনার বাসস্থানে মালপত্র রেখে, বিশ্রাম নিয়ে উমরার প্রস্তুতি নিবেন।

মুহরিম যেকোনো সময় মক্কায় প্রবেশ করতে পারে। তবে দিনের প্রথম প্রহরে প্রবেশ করা উত্তম। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যী-তুয়ায় রাতযাপন করেন। সকাল হলে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন।'[405]

মক্কা নগরীর মর্যাদা

বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে রয়েছে পবিত্র মক্কা নগরীর প্রতি গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ। যিনি হজ বা উমরা করতে চান, অবশ্যই তাকে এ পবিত্র ভূমিতে গমন করতে হবে। তাই এ সম্মানিত শহর সম্পর্কে জানা প্রতিটি মুসলিমের উপর একান্ত কর্তব্য। নিম্নে এই মহান নগরীর কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

ক. কুরআন কারীমে পবিত্র মক্কা নগরীর কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ১- মক্কা[406]; ২- বাক্কা[407]; ৩- উম্মুল কুরা (প্রধান

---

[405] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৭৪।

[406] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৪।

[407] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৬।

শহর)[408]; ৪- আল-বালাদুল আমীন (নিরাপদ শহর)[409]। বস্তুত কোনো কিছুর নাম বেশি হওয়া তার মাহাত্মের পরিচায়ক।

খ. আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে হারামের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। জিবরীল আলাইহিস সালাম কা‘বা ঘরের নির্মাতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে হারামের সীমানা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তার দেখানো মতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তা নির্ধারণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হারামের সীমানা সংস্কার করা হয়।[410]

ইমাম নববী রহ. বলেন, হারামের সীমানা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর সাথে প্রচুর বিধি-বিধানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।[411]

গ. মক্কা নগরীতে আল্লাহ তা‘আলার অনেক নিদর্শন রয়েছে: যেমন, আল্লাহ তা‘আলা এ মর্মে বলেন,

﴿فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ ﴾ [ال عمران: ٩٧]

“তাতে (মক্কা নগরীতে) রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন যেমন মাকামে ইবরাহীম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭] কাতাদা ও মুজাহিদ

---

408 সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৭।

409 সূরা আত-তীন, আয়াত: ৩।

410 আল-ইসাবা : (১/১৮৩)।

411 তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত : (৩/৮২)।

রহ. বলেন, ‘প্রকাশ্য নিদর্শনগুলোর একটি হলো মাকামে ইবরাহীম।’[412]

মূলত মক্কা নগরীর একাধিক নাম, তার সীমারেখা সুনির্ধারিত থাকা, তার প্রাথমিক পর্যায় ও নির্মাণের সূচনা এবং তাকে হারাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ নগরীর সম্মান ও উঁচু মর্যাদার কথা ফুটে উঠেপ্ল

১. আল্লাহ তা‘আলা মক্কা নগরীকে হারাম (সম্মানিত) ঘোষণা করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা যেদিন যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই মক্কা ভূমিকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّمَآ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلۡبَلۡدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ [النمل: ٩١]

“আমিতো আদিষ্ট হয়েছি এ নগরীর মালিকের ইবাদত করতে যিনি একে সম্মানিত করেছেন।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৯১] মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

‘এ শহরটিকে আল্লাহ যমীন ও আসমান সৃষ্টির দিন থেকেই হারাম অর্থাৎ সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত এ শহরটি কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে।[413]

---

[412] তাফসীরে তাবারী : (৪/৮)।

[413] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৫৩।

আল্লাহর খলীল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে হারাম হওয়ার ঘোষণা দেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি আল্লাহর ঘর কা‘বা নির্মাণ করেন এবং একে পবিত্র করেন। অতঃপর মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি হজের ঘোষণা দেন এবং মক্কা নগরীর জন্য দো‘আ করেন। তিনি বলেন,

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا.»

“ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেন এবং শহরটির জন্য দো‘আ করেন।”[414]

২. আল্লাহ মক্কা নগরীর কসম খেয়ে তাকে সম্মানিত করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ ۝٣ ﴾ [التين: ١، ٣]

“কসম তীন ও যাইতূনের। কসম সিনাই পর্বতের এবং কসম এ নিরাপদ শহরের।” [সূরা আত-তীন, আয়াত: ১-৩] আয়াতে ‘এই নিরাপদ শহর’ বলে মক্কা নগরী বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿ لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ۝١ وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ۝٢ ﴾ [البلد: ١، ٢]

“আমি কসম করছি এ শহরের। আর আপনি এ শহরের অধিবাসী।” [সূরা আল-বালাদ, আয়াত: ১-২]

---

[414] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৩, ২১২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬০।

৩. মক্কা ও এর অধিবাসীর জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দো‘আ করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ٣٥﴾ [ابراهيم: ٣٥]

“আর (স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৫-৩৭]

৪. মক্কা নগরী রাসূলুল্লাহর প্রিয় শহর

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে বলেন,

«مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَمَا أَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِك أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ».

“কতই না পবিত্র শহর তুমি! আমার কাছে কতই না প্রিয় তুমি! যদি তোমার কাওম আমাকে তোমার থেকে বের করে না দিত তাহলে তুমি ছাড়া অন্য কোনো শহরে আমি বসবাস করতাম না।”[415]

৫. দাজ্জাল এ নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[415] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৯২৬।

«لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ».

"এমন কোনো ভূখণ্ড নেই যা দাজ্জালের পদভারে মথিত হবে না। তবে মক্কা ও মদীনায় সে প্রবেশ করতে পারবে না। সেখানকার প্রতিটি গলিতে ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে হেফাযতে নিয়োজিত রয়েছে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনটি ঝাঁকুনি খাবে। আল্লাহ (মদীনা থেকে) সকল কাফির ও মুনাফিককে বের করে দিবেন।"[416]

৬. ঈমানের প্রত্যাবর্তন

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا»

"ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত হিসেবে এবং সূচনা কালের মতই আবার তা অপরিচিত অবস্থার দিকে ফিরে যাবে। আর তা পুনরায় দু'টি মসজিদে ফিরে আসবে, যেমন সাপ নিজ গর্তে ফিরে আসে।"[417]

---

[416] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৪৩।

[417] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬।

ইমাম নববী রহ. বলেন, ‘দু’টি মসজিদ দ্বারা মক্কা ও মদীনার মসজিদকে বুঝানো হয়েছে।’[418]

৭. মসজিদুল হারামে সালাত আদায়ের সাওয়াব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ».

“আমার মসজিদে একবার সালাত আদায় মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে হাজার বার সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি উত্তম। তবে মসজিদুল হারামে একবার সালাত আদায় অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ গুণ বেশি।”[419]

মসজিদে হারাম বলতে কেউ কেউ শুধু কা‘বার চতুষ্পার্শ্বস্থ সালাত আদায় করার স্থান বা মসজিদকে বুঝেছেন; কিন্তু অধিকাংশ শরী‘আতবিদের মতে, হারামের সীমারেখাভুক্ত পূর্ণ এলাকা মসজিদে হারামের আওতাভুক্ত। প্রসিদ্ধ তাবেঈ ‘আতা ইবন আবী রাবাহ আল-মক্কী রহ. যিনি মসজিদে হারামের ইমাম ছিলেন। তাকে একবার রাবী‘ ইবন সুবাইহ প্রশ্ন করলেন, ‘হে আবূ মুহাম্মাদ! মসজিদে হারাম সম্পর্কে যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এটা কি কেবল মসজিদের জন্য, না সম্পূর্ণ হারাম এলাকার জন্য?’ জবাবে আতা’ রহ. বললেন, এর

---

[418] শরহু মুসলিম লিন নাওয়াওয়ী।

[419] মুসনাদে আহমাদ (২৩/৪৬), হাদীস নং ১৪৬৯৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৪০৬; সহীহ ইবন হিব্বান : ১৬২০।

দ্বারা সম্পূর্ণ হারাম এলাকাই বুঝানো হয়েছে। কারণ, হারাম এলাকার সবটাই মসজিদ বলে গণ্য করা হয়।'[420] অধিকাংশ আলেম এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[421]

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, পবিত্র মক্কা নগরীর হারাম এলাকার যেখানেই সালাত আদায় করা হবে, সেখানেই এক সালাতে এক লক্ষ সালাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

---

[420] মুসনাদুত ত্বায়ালিসী : ১৪৬৪।

[421] আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যা লি ইবন তাইমিয়া : পৃ. ১১৩; ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মা'আদ (৩/৩০৩-৩০৪); মাজমূ' ফাতাওয়া ইবন বায : (৪/১৪০)।

মক্কা নগরীতে যেসব কাজ নিষিদ্ধ

১. মক্কা নগরীতে কোনো পাপের ইচ্ছা করা

মক্কা মুকাররমায় পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে কঠোর সাবধানবাণী এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۭ بِظُلۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ٢٥ ﴾ [الحج: ٢٥]

“আর এখানে যে সামান্যতম পাপাচারের ইচ্ছে পোষণ করবে তাকে আমি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করব।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তিন ধরনের লোক আল্লাহর কাছে বেশি ঘৃণিত। হারাম শরীফে অন্যায়কারী, ইসলামের ভেতরে জাহিলি রীতি-নীতি অন্তর্ভুক্তকারী এবং অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যাকারী।’[422]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে অন্যায় কর্মের নিছক ইচ্ছা পোষণ করার জন্য কঠিন শাস্তির হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে যদিও সে বাস্তবে সে ইচ্ছা পূরণ করে নিপ্ম তাহলে যে বাস্তবে অন্যায় করবে তার অবস্থা কেমন হবে? তাই আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ইয়ামানে অবস্থিত এডেন শহরে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি যদি হারামে কোনো

[422] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৮২।

ধরনের অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন![423]

২. মক্কাবাসিদের কষ্ট দেওয়া ও সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ مَثَابَةٗ لِّلنَّاسِ وَأَمۡنٗا﴾ [البقرة: ١٢٥]

“আর স্মরণ করুন, যখন আমি কা‘বা ঘরকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং শান্তির আলোয় করলাম।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৫] তিনি আরো বলেন,

﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ ۝٣ ﴾ [التين: ١، ٣]

“তীন, যাইতুন, তূর পর্বত এবং এ নিরাপদ শহরের শপথ।” [সূরা আত-তীন, আয়াত: ১-৪] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿ أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا جَعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنٗا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنۡ حَوۡلِهِمۡۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ يَكۡفُرُونَ ۝٦٧ ﴾ [العنكبوت: ٦٧]

“তারা কি দেখে না যে, আমি (মক্কাকে) নিরাপদ পবিত্র অঞ্চল বানিয়েছি, অথচ তাদের আশপাশ থেকে মানুষদেরকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়? তাহলে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নি‘আমতকে অস্বীকার করবে?” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৭] এ কারণেই মক্কা নগরীতে বিনা প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[423] মুসনাদে আহমাদ (৪২৮/১), হাদীস নং ৪০৭১; তাবারী ।(৬০১/১৮) :

«لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ السِّلاَحَ بِمَكَّةَ».

“মক্কা নগরীতে কারো জন্য অস্ত্র বহন করা বৈধ নয়।”[424]

অতএব, হারাম শরীফে অবস্থানকারী ও আগমনকারী সকলকে সাবধান থাকতে হবে যে, হারাম শরীফের পবিত্রতা যেন নষ্ট না হয়, আর এখানকার কোনো লোকের কষ্ট ও যেন না হয়। এমনকি কোনো ধরনের ভীতিপ্রদর্শনও অবৈধ। এগুলো জঘন্য অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

৩. মক্কা নগরীতে কাফির ও মুশরিকদের প্রবেশ করা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَاۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٢٨﴾ [التوبة: ٢٨]

“হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় তাদের এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্রকে ভয় কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৮]

মহান আল্লাহর এ নির্দেশটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরী সালে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মক্কায় পাঠালেন এ ঘোষণা দেওয়ার জন্যে যে,

---

[424] সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩৭১৪।

« أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ».

“যেনে নাও যে, এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না এবং কেউ উলঙ্গাবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।”[425]

৪. হারাম এলাকায় শিকার করা, গাছ কাটা বা পড়ে থাকা জিনিস উঠানো

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনতার সামনে বক্তব্য রাখলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর হাম্দ ও সানা বর্ণনা করেন, অতঃপর বললেন,

«إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ ....»

“আল্লাহ হস্তিদল থেকে মক্কাকে রক্ষা করেছেন এবং সে মক্কার ওপর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের বিজয় দান করেছেন। এ মক্কা আমার আগে কারো জন্য কখনো হালাল (লড়াই করার অনুমতি) ছিল না, তবে আজ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে আমার জন্য হালাল করা হয়েছে (এতে লড়াই করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে) এবং আজকের পর আর কখনো এটাকে কারো জন্য হালাল করা হবে না। অতএব, এখানকার কোনো পশুকে তাড়ানো যাবে না, এখানকার কোনো কাঁটা তোলা যাবে না। এখানকার পড়ে থাকা কোনো জিনিস

---

[425] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬২২।

হালাল হবে না। তবে ঘোষণাকারী (সঠিক মালিকের কাছে পৌঁছাবার লক্ষ্যে) ঘোষণা দেওয়ার জন্য সেটা উঠাতে পারে।”[426]

তবে কষ্টদায়ক জীব হত্যা করা বৈধ করা হয়েছে। তা হারাম এলাকায় হোক অথবা হারাম এলাকার বাইরে যমীনের যে কোনো জায়গায় হোক। এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

“পাঁচ ধরনের প্রাণীর সবগুলোই ক্ষতিকারক, যেগুলোকে হারামেও হত্যা করা যাবে: কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।”[427]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا».

“পাঁচটি প্রাণী ক্ষতিকারক। হিল্ল (মীকাত ও হারামের মধ্যবর্তী স্থান) অথবা হারামে যেখানেই পাওয়া যাবে সেগুলো হত্যা করা যাবে: সাপ, কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।”[428]

---

[426] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৫৫।

[427] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯৮।

[428] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯৮।

আলেমগণ বলেন, উল্লিখিত হাদীসসমূহে যেসব প্রাণীর নাম বলা হয়েছে। তাছাড়াও অন্যান্য ক্ষতিকারক প্রাণীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

মক্কায় প্রবেশের সময় হাজীগণ যেসব ভুল করেন

- এ সময় অনেক হাজী সাহেব অপরের সমালোচনা ও দোষ চর্চা করেন, এমন পবিত্র স্থানে যা একেবারেই পরিত্যাজ্য।

- অনেক হাজী সাহেব মক্কায় প্রবেশের পূর্বে তালবিয়া পাঠ করতে ভুলে যান। অথচ তখনি বেশি বেশি করে তালবিয়া পাঠ করার সময়।

- অনেক হাজী সাহেব একসাথে সমস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন। এটি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্নভাবে তালবিয়া পাঠ করেছেন।

- অনেক হাজী সাহেব মক্কায় প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট দো'আ পড়ে থাকেন। মক্কা প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট দো'আ নেই।

তৃতীয়. মসজিদে হারামে প্রবেশ:

তালবিয়া পড়তে পড়তে পবিত্র কা'বার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। যেকোনো দরজা দিয়ে ডান পা দিয়ে, বিনয়-নম্রতা ও আল্লাহর মাহাত্মের কথা স্মরণ করে এবং হজের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছার তাওফীক দান করায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন। প্রবেশের সময় আল্লাহ যেন তাঁর রহমতের সকল দরজা খুলে দেন সে আকুতি নিয়ে রাসূলল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ সম্বলিত নিম্নের দো‘আটি পড়বেন:[429]

«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

(আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া ওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কাদীমি মিনাশ শায়তানির রাজীম। বিসমিল্লাহ ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফির লি যুনুবী ওয়াফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিক।)

“আমি মহান আল্লাহর, তাঁর সম্মানিত চেহারার এবং তাঁর চিরন্তন কর্তৃত্বের মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের সকল দরজা খুলে দিন।”

মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় হাজী সাহেব যেসব ভুল করেন

১. অনেকে মনে করে, বাবুস সালাম বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। এটা নিছক ভুল ধারণা। কেননা মসজিদুল

---

[429] অন্যান্য দো‘আর সাথে এ দো‘আ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর দুরূদ ও সালামের পড়ার কথা এসেছে। আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪৬৫; ইবনুস সুন্নাহ, হাদীস নং ৮৮; সহীহুল জামে‘ (১/৫২৮)।

হারামের প্রতিটি দরজাই পরবর্তীযুগে বানানো হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব বা সুন্নাত হতে পারে না।

২. মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় সুনির্দিষ্ট কোনো দো‘আ নির্ধারণ করা। অথচ মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় সুনির্দিষ্ট কোনো দো‘আ নেই। বরং ওপরে যে দো‘আটি বর্ণিত হয়েছে, তা মসজিদে হারামসহ সব মসজিদে প্রবেশের দো‘আ।

চতুর্থ. বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ:

তাওয়াফের ফযীলত:

তাওয়াফের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস এসেছে। যেমন,

o আল্লাহ তা‘আলা তাওয়াফকারীর প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি করে নেকি লিখবেন এবং একটি করে গুনাহ মাফ করবেন। আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا يُحْصِيهِ، كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةٍ».

“যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের তওয়াফ সাত চক্কর যথাযথভাবে করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি নেকি লিখবেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।”[430]

[430] মুসনাদে ত্বায়ালিসি : ২০১২।

- তাওয়াফকারী শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ».

"তুমি যখন বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফ করলে, তখন পাপ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলে যেন আজই তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছে।"[431]

- তাওয়াফকারী দাসমুক্ত করার ন্যায় সাওয়াব পায়। আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ».

"যে ব্যক্তি কাবাঘরের সাত চক্কর তাওয়াফ করবে সে একজন দাসমুক্ত করার সাওয়াব পাবে।"[432]

---

[431] মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক : (৫/১৪), হাদীস নং ৮৮৩০; মু'জামুল কাবীর ১২/৪২৫; সহীহুল জামে': ১৩৬০।

[432] নাসাঈ, হাদীস নং ২৯১৯। দাসমুক্ত করার সাওয়াব অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কেউ কোনো মুমিন দাস-দাসীকে মুক্ত করবে, সেটা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে। (আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৩৪৫৩) অন্য হাদীসে এসেছে, কেউ কোনো দাসমুক্ত করলে আল্লাহ দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। (তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৬১)

o ফিরিশতার পক্ষ থেকে তাওয়াফকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ হওয়ার ঘোষণা আসে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ، يَأْتِي مَلَكٌ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ ثُمَّ يَقُولُ اعْمَلْ لِمَا تُسْتَقْبَلُ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى».

"আর যখন তুমি বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে বিদা) করবে, তখন তুমি তো নিষ্পাপ। তোমার কাছে একজন ফিরিশতা এসে তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে হাত রেখে বলবেন, তুমি ভবিষ্যতের জন্য (নেক) আমল কর; তোমার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।"[433]

সঠিকভাবে তাওয়াফ করতে নিচের কথাগুলো অনুসরণ করুন

১.সকল প্রকার নাপাকি থেকে পবিত্র হয়ে অযু করুন তারপর মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে কা'বা শরীফের দিকে এগিয়ে যান।[434]

---

[433] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২।

[434] মনে রাখবেন, কাবা শরীফ দেখার সময় সুনির্দিষ্ট কোনো দো'আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নেই। তবে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন বাইতুল্লাহ'র দিকে তাকাতেন তখন নিচের দো'আটি পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ.

(আল্লহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিন্কাস সালাম ফাহায়্যিনা রব্বানা বিস সালাম।) 'হে আল্লাহ, আপনিই সালাম (শান্তি), সালাম (শান্তি) আপনার কাছ থেকেই আসে। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সালাম (শান্তি)-এর মাধ্যমে সাদ সম্ভাষণ জানান।' দ্র. বাইহাকী, সুনানে কুবরা : (৫/৭৩); আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জি

যদি আপনি তখনই তাওয়াফের ইচ্ছা করেন তাহলে দু' রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া ছাড়াই তাওয়াফ শুরু করতে যাবেন। কেননা বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফই আপনার জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যিনি সালাত বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করছেন, তিনি বসার আগেই দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নিবেন। যেমন, অন্য মসজিদে প্রবেশের পর পড়তে হয়। এরপর তাওয়াফের জন্য হাজরে আসওয়াদের দিকে যান। মনে রাখবেন:

 উমরাকারী বা তামাত্তু হজকারীর জন্য এ তাওয়াফটি উমরার তাওয়াফ। কিরান ও ইফরাদ হজকারীর জন্য এটি তাওয়াফে কুদূম বা আগমনী তাওয়াফ।

 মুহরিম ব্যক্তি অন্তরে তাওয়াফের নিয়ত করে তাওয়াফ শুরু করবে। কেননা অন্তরই নিয়তের স্থান। উমরাকারী কিংবা তামাত্তুকারী হলে তাওয়াফ শুরু করার পূর্ব মুহূর্ত থেকে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবেপ্ন

তাওয়াফের জন্য হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছার পর সেখানকার আমলগুলো নিম্নরূপে করার চেষ্টা করবেন।

ক. ভিড় না থাকলে হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তা চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করবেন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের পদ্ধতি হলো,

---

ওয়াল উমরা : ১৯। সুতরাং কেউ সাহাবীর অনুসরণে দো'আটি পড়লে কোনো অসুবিধা নেই।

হাজরে আসওয়াদের ওপর দু'হাত রাখবেন। 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে আলতোভাবে চুম্বন করবেন।[435] কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস রাখতে হবে, হাজরে আসওয়াদ উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। লাভ ও ক্ষতি করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তা চুমো খেয়ে বলেন,

وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ، مَا قَبَّلْتُكَ.

"আমি নিশ্চিত জানি, তুমি কেবল একটি পাথর। তুমি ক্ষতি করতে পার না এবং উপকারও করতে পার না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমায় চুম্বন করতাম না।"[436]

হাজরে আসওয়াদে চুমো দেওয়ার সময় اللَّهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলবেন[437] অথবা بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার) বলবেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এ রকম বর্ণিত

---

435 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১০, ১৬১১, ১৬১৩। তাছাড়া আল্লাহকে সম্মানপ্রদর্শন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদের উপর সাজদাও করতে পারেন। যেমনটি বিভিন্ন সহীহ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। দ্র. মুসনাদ আত-তায়ালিসী : (১/২১৫-২১৬)।

436 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৭০।

437 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১৩।

আছে।[438]

খ. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা কষ্টকর হলে ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবেন এবং হাতের যে অংশ দিয়ে স্পর্শ করেছেন সে অংশ চুম্বন করবেন। নাফে রহ. বলেন, 'আমি ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে দেখেছি, তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন তারপর তাতে চুমো দিলেন এবং বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে করতে দেখার পর থেকে আমি কখনো তা পরিত্যাগ করি নি।'[439]

গ. যদি হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, লাঠি দিয়ে তা স্পর্শ করবেন এবং লাঠির যে অংশ দিয়ে স্পর্শ করেছেন সে অংশ চুম্বন করবেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে উটের পিঠে বসে তাওয়াফ করেন, তিনি বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন।'[440]

ঘ. হজের সময়ে বর্তমানে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ও স্পর্শ করা উভয়টাই অত্যন্ত কঠিন এবং অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। তাই এমতাবস্থায় হাজরে আসওয়াদের বরাবর এসে দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডান হাত উঁচু করে, اللَّهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বা بِسْمِ اللَّهِ،اللَّهُ أَكْبَرُ 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' (আল্লাহু আকবার) বলে

---

[438] আত-তালখিসুল হাবীর : (২/২৪৭)।

[439] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৬৮।

[440] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬০৮।

ইশারা করবেন।[441] পূর্বে হাজরে আসওয়াদ বরাবর যমীনে একটি খয়েরি রেখা ছিল বর্তমানে তা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই হাজরে আসওয়াদ বরাবর মসজিদুল হারামের কার্নিশে থাকা সবুজ বাতি দেখে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসেছেন কি-না তা নির্ণয় করবেন। আর যেহেতু হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব হয় নি তাই হাতে চুম্বনও করবেন না। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের পিঠে বসে তাওয়াফ করলেন। যখন তিনি রুকন অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের বরাবর হলেন তখন এর দিকে ইশারা করলেন এবং তাকবীর দিলেন।[442] অপর বর্ণনায় রয়েছে, 'যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলেন তখন তাঁর হাতের বস্তুটি দিয়ে এর দিকে ইশারা করে তাকবীর দিলেন।[443] তারপর যখনই এর বরাবর হলেন অনুরূপ করলেন। সুতরাং যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে তাকবীর দিবেন। হাত চুম্বন করবেন না।

ঙ. প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে যদি পাথরটিকে চুমো দেওয়া বা হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে মানুষকে কষ্ট দিয়ে এ কাজ করতে যাবেন না। এতে খুশূ তথা বিনয়ভাব নষ্ট হয়ে যায় এবং তাওয়াফের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এটাকে কেন্দ্র করে কখনো কখনো ঝগড়া-বিবাদ এমনকি মারামারি পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন

---

[441] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১২।

[442] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৯৩।

[443] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩২।

করা উচিৎ।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাসহ বেশ কিছু সাহাবী তাওয়াফের শুরুতে বলতেন,[444]

اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ.

(আল্লহুম্মা ঈমানাম বিকা, ওয়া তাছদীকাম বিকিতাবিকা, ওয়া ওয়াফায়াম বি'আহদিকা, ওয়াত- তিবা'আন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন।)

'আল্লাহ, আপনার ওপর ঈমানের কারণে, আপনার কিতাবে সত্যায়ন, আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং আপনার নবী মুহাম্মদের সুন্নাতের অনুসরণ করে তাওয়াফ শুরু করছি।'

সুতরাং কেউ যদি সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হওয়ার কারণে তাওয়াফের সূচনায় এই দো'আটি পড়েন, তবে তাও উত্তম।

২. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন, স্পর্শ অথবা ইশারা করার পর কা'বা শরীফ হাতের বাঁয়ে রেখে তাওয়াফ শুরু করবেন। তাওয়াফের আসল লক্ষ্য আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা এবং তাঁরই সামনে নিজকে সমর্পন করা। তাওয়াফের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণে বিনয়-নম্রতা ও হীনতা-দীনতা প্রকাশ পেত। চেহারায় ফুটে উঠত আত্মসমর্পনের আবহ। পুরুষদের

---

[444] তাবরানী : ৫৮৪৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ : ৩/২৪০। [তবে এর সনদ দুর্বল] তাই প্রখ্যাত ফকীহ্ 'আতাহ ইবন রাবাহ বলেন, এটা ইরাকীদের বিদ'আত। [আখবারু মাক্কাহ লিল ফাকেহী (১/১০০)][(১০০/১)

জন্য এই তাওয়াফের প্রতিটি চক্করে ইযতিবা এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাতপ্ম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযতিবা করলেন, হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করলেন এবং তাকবীর প্রদান করলেন। আর প্রথম তিন চক্করে রমল করলেন।"[445]

ইযতিবা হলো, গায়ের চাদরের মধ্যভাগ ডান বগলের নিচে রেখে ডান কাঁধ খালি রাখা এবং চাদরের উভয় মাথা বাম কাঁধের উপর রাখা।

আর **রমল হলো,** ঘনঘন পা ফেলে কাঁধ হেলিয়ে বীর-বিক্রমে দ্রুত চলা। কা'বার কাছাকাছি স্থানে রমল করা সম্ভব না হলে দূরে থেকেই রমল করা উচিৎ।

৩. রুকনে ইয়ামানী অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের আগের কোণের বরাবর এলে সম্ভব হলে তা ডান হাতে স্পর্শ করবেন।[446] প্রতি চক্করেই এর বরাবর এসে সম্ভব হলে এরকম করবেন।

---

[445] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৮৮৯; অনুরূপ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮, ১২৬২।

[446] রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার সময় بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর) বলা ভালো। কারণ, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এটি সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। দ্র. বাইহাকী : (৫/৭৯); ইবন হাজর, তালখীসুল হাবীর : (২/২৪৭)।

৪. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী কেন্দ্রিক আমলসমূহ প্রত্যেক চক্করে করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করেছেন। রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন,

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

(রববানা আতিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল-আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা ‘আযাবান নার।) [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]

“হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।”[447] সুতরাং এ দুই রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে প্রত্যেক চক্করে উক্ত দো‘আটি পড়া সুন্নাতপ্ম

তাওয়াফের অবশিষ্ট সময়ে বেশি বেশি করে দো‘আ করবেন। আল্লাহর প্রশংসা করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম পড়বেন। কুরআন তিলাওয়াতও করতে পারেন। মোটকথা, যে ভাষা আপনি ভালো করে বোঝেন, আপনার মনের আকুতি যে ভাষায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় সে ভাষাতেই দো‘আ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[447] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৯২।

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ»

“বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ায় সাঈ ও জামারায় পাথর নিক্ষেপের বিধান আল্লাহর যিকির কায়েমের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।”[448] দো‘আ ও যিকির অনুচ্চ স্বরে হওয়া শরী‘আতসম্মত।

৫. কা‘বা ঘরের নিকট দিয়ে তাওয়াফ করা উত্তম। তা সম্ভব না হলে দূর দিয়ে তাওয়াফ করবে। কেননা মসজিদে হারাম পুরোটাই তাওয়াফের স্থান। সাত চক্কর শেষ হলে, ডান কাঁধ ঢেকে ফেলুন, যা ইতিপূর্বে খোলা রেখেছিলেন। মনে রাখবেন, শুধু তাওয়াফে কুদূম ও উমরার তাওয়াফেই ইযতিবার বিধান রয়েছে। অন্য কোনো তাওয়াফে ইযতিবা নেই, রমলও নেই।

৬. সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হবেন,

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ﴾ [البقرة: ١٢٥]

(ওয়াত্তাখিযূ মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুসল্লা।)

“মাকামে ইবরাহীমকে তোমরা সালাতের স্থল বানাও।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৫] মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও বাইতুল্লাহ’র মাঝখানে রাখবেন। হোক না তা দূর থেকে। তারপর সালাতের

[448] তিরমিযী, হাদীস নং ৯০২; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৮৮; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৪৩৫১, তবে এর সনদ মরফূ‘ হিসেবে দুর্বল। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, এটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে মাওকূফ হিসেবে সাব্যস্ত।

নিষিদ্ধ সময় না হলে দু’ রাকাত সালাত আদায় করবেন।[449]

মাকামে ইবরাহীমে জায়গা না পেলে মসজিদুল হারামের যে কোনো স্থানে এমনকি এর বাইরে পড়লেও চলবে।[450] তবুও মানুষকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। পথে-ঘাটে যেখানে- সেখানে সালাত আদায় করা যাবে না। মাকরূহ সময় হলে এ দু’রাকাত সালাত পরে আদায় করে নিন। সালাতের পর হাত উঠিয়ে দো‘আ করার বিধান নেই।

৭. সালাত শেষ করে পুনরায় হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে ডান হাতে তা স্পর্শ করুন। এটা সুন্নাতপ্পস্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করবেন না। হজের সময়ে এরকম করা প্রায় অসম্ভব। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا»

“অতঃপর আবার ফিরে এসে রুকন (হাজরে আসওয়াদ) স্পর্শ

---

[449] এ সালাতের প্রথম রাকা‘আতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ‘কাফিরূন’ - قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস -قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - পড়া সুন্নত। (তিরমিযী, হাদীস নং ৮৬৯।) এ দুই রাকাত সালাতের সাওয়াব সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام

“তুমি যখন তাওয়াফের পর দুই রাকাত সালাত আদায় করবে, তা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের একজন গোলাম আযাদ করার সমতুল্য গণ্য হবে।” দ্র. সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং **১১১২**।

[450] এই সালাতটি হানাফী মাযহাবে ওয়াজিব, অন্যান্য মাযহাবে সুন্নাত।

করলেন। তারপর গেলেন সাফা অভিমুখে।”[451]

৮. এরপর যমযমের কাছে যাওয়া, তার পানি পান করা ও মাথায় ঢালা সুন্নাতপ্পজাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ».

“তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের কাছে গেলেন। যমযমের পানি পান করলেন এবং তা মাথায় ঢেলে দিলেন।”[452]

যমযমের পানির ফযীলত

- **যমযমের পানি সর্বোত্তম পানি:** ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

  «خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ»

  “যমীনের বুকে যমযমের পানি সর্বোত্তম পানি।”[453]

- **যমযমের পানি বরকতময়:** আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

451 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৫২৪৩; অনুরূপ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

452 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৫২৪৩।

453 তাবরানী ফিল কাবীর, হাদীস নং ১১১৬৭; সহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১৬১।

«إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ»

"নিশ্চয় তা বরকতময়।"[454]

- **যমযমের পানিতে রয়েছে খাদ্যের উপাদান:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ»

"নিশ্চয় তা বরকতময়, আর খাবারের উপাদানসমৃদ্ধ।"[455]

- **রোগের শিফা:** ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ»

"নিশ্চয় তা সুখাদ্য খাবার এবং রোগের শিফা।"[456]

- **যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করবেন তা পূর্ণ হয়:** জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»

"যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যেই পান করা হয় তা সাধিত হবে।"[457]

---

[454] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৭৩।

[455] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৭৩।

[456] মুসনাদে আবূ দাঊদ ত্বায়ালিসি, হাদীস নং ৪৫৯; তাবরানী ফিস সাগীর, হাদীস নং ২৯৫।

- **যমযমের পানি সবচেয়ে দামি হাদিয়া:** প্রাচীন যুগ থেকে হাজী সাহেবগণ যমযমের পানি বহন করে নিয়ে যেতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত:

«أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَحْمِلُهُ»

“তিনি যমযমের পানি বহন করে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা বহন করতেন।”[458]

যমযমের পানি পান করার আদব

- যমযমের পানি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে পান করবেন। নিয়ম হচ্ছে তিন শ্বাসে পান করা এবং পেট ভরে পান করা। পান করা শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করা। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَتَنَفَّسْ ثَلاَثًا، وَتَضَلَّعْ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ، فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ، إِنَّهُمْ لاَ يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ»

যখন তুমি যমযমের পানি পান করবে“, তখন কেবলামুখী হবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিন বার নিঃশ্বাস নিবে। তুমি তা পেট পুরে খাবে এবং শেষ হলে মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[457] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৬২।

[458] তিরমিযী, হাদীস নং ৯৬৩।

আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুনাফিকরা পেট ভরে যমযমের পানি পান করে না।”[459]

- ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যমযমের পানি পানের পূর্বে এই দো‘আ পড়তেন,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, বিস্তৃত সম্পদ ও সকল রোগ থেকে শিফা কামনা করছি।”[460]

পানি পান করার পর মাথায়ও কিছু পানি ঢালুন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।[461]

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا»

“অতঃপর আবার ফিরে এসে রুকন (হাজরে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন। তারপর গেলেন সাফা অভিমুখে।”[462]

৯. মহিলাদের তাওয়াফও পুরুষদের মতোই। তবে তারা রমল ও ইযতিবা করবে না। মহিলারা খালি জায়গা না পেলে তাদের জন্য

---

[459] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৬১। তবে এর সনদ দুর্বল।

[460] দারা কুতনী, হাদীস নং ২৭৩৮।

[461] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫২৪৩।

[462] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৫২৪৩; অনুরূপ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

পুরুষদের ভিড় ঠেলে হাজরে আসওয়াদ বা রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা জায়েয নেই। মহিলারা দো'আ ও যিকিরে স্বর উঁচু করা থেকে বিরত থাকবে। পর্দা লঙ্ঘন বা রূপ-লাবণ্য প্রকাশ করা যাবে না। কারণ তা ফিতনা বয়ে আনতে পারে। চেহারা যেহেতু সকল সৌন্দর্যের আধার, তাই তা প্রকাশ করা যাবে না। মুসলিম মহিলাদের আদর্শ হলেন উম্মাহাতুল মুমিনীন। আর উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এক প্রান্তে পুরুষশূন্য জায়গায় তাওয়াফ করতেন। পুরুষদের এড়িয়ে একাকী চক্কর দিতেন। এক মহিলা তাকে বললেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন, চলুন পাথর ছুয়ে আসি'প্ততিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, তুমি চলে যাও।[463] আতা রহ. উম্মাহাতুল মুমিনীনের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

«وَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ .وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ».

"তারা রাতের বেলা অপরিচিতরূপে বের হয়ে পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করতেন। তবে তারা যখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে চাইতেন, তখন পুরুষদের বের করে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। পুরুষরা বের হলে তারা প্রবেশ করতেন।"[464]

'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর এক দাসী সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং দু'বার বা তিনবার হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন, তা দেখে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন,

---

[463] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১৮।

[464] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১৮।

«لاَ آجَرَكِ اللَّهُ، لاَ آجَرَكِ اللَّهُ تُدَافِعِينَ الرِّجَالَ أَلاَ كَبَّرْتِ وَمَرَرْتِ».

"আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিবেন না, আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিবেন না। পুরুষদের সাথে তুমি ঠেলাঠেলি করছো? কেন তুমি তাকবীর দিয়ে অতিক্রম করো নি?"[465]

১০. তাওয়াফকালে যদি চক্করের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে যে সংখ্যার দিকে ধারণা প্রবল হবে সেটাকেই ধরে নিতে হবে। আর যদি কোনো সংখ্যার ব্যাপারেই ধারণা প্রবল না হয়, তাহলে কম সংখ্যাটাই ধর্তব্য হবে এবং সে অনুযায়ী চক্কর পুরো করবে। যেমন: তার যদি সন্দেহ হয়, ছয় চক্কর দিয়েছে না সাত চক্কর? তাহলে ছয় চক্কর হয়েছে বলেই গণনা করবে। পক্ষান্তরে এ সন্দেহ যদি তাওয়াফ শেষ করার পর দেখা দেয়, তাহলে একে আমলে নিবে না, যতক্ষণ না কম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা হয়। সুতরাং যদি কম হওয়ার ধারণাটি নিশ্চিত হয়, তাহলে ফিরে আসবে এবং সংখ্যা পূর্ণ করবে।

১১. যদি হাজীর পক্ষে অসুস্থতা বা বার্ধক্য হেতু চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্য অন্যের পিঠে বা বাহনে চড়ে তাওয়াফ করা জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের সমস্যার কথা জানালে তিনি বললেন,

«طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ».

---

[465] বাইহাকী : (৫/১৩১), হাদীস নং ৯২৬৮; মুসনাদে শাফেঈ, হাদীস নং ১২৭।

“বাহনে চড়ে লোকদের পেছনে পেছনে তাওয়াফ করো’![466] আরেক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন,

«إِذَا أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ».

“ফজরের সালাত শুরু হলে লোকেরা যখন সালাতে রত হবে, তুমি তখন উটের পিঠে বসে তাওয়াফ করবে।’ তিনি তাই করেন এবং লোকেরা বের হয়ে যাবার পর সালাত আদায় করে নেন।”[467]

১২. তাওয়াফ সহীহ হওয়ার জন্য জরুরী বিষয়গুলো হলো: পবিত্রতা অর্জন করা, সতর ঢাকা, হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে সেখানেই শেষ করা, সাত চক্কর দেওয়া, কা‘বাঘর বাঁ পাশে রাখা, পুরো কা‘বা ঘর ঘিরেই তাওয়াফ করা এবং ধারাবাহিকভাবে তাওয়াফ পূর্ণ করা। তবে মাঝখানে ফরয সালাত বা জানাযা হাজির হলে সালাতের পর চক্কর পূর্ণ করবেন।

তাওয়াফের কিছু ভুল-ত্রুটি

১. তাওয়াফের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা। যেমন, এরূপ বলা:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ نَوَيْتُ أَنْ أَطُوْفَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ .

স্মর্তব্য যে, কোনো ইবাদাতে নিয়ত উচ্চারণের কোনো নিয়ম নেই। একমাত্র হজ বা উমরা শুরু করার সময় প্রথমবার ‘লাব্বাইকা

---

[466] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬১৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৭৬।

[467] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬২৬।

হাজ্জান’ বা ‘লাব্বাইকা উমরাতান’ কিংবা ‘লাব্বাইকা হাজ্জান ওয়া উমরাতান’ উচ্চারণ করে নিয়ত করার ব্যাপারটি হাদীসে এসেছে; অন্য কোথাও নয়।

২. তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা বিশেষ দো‘আ পড়া, শুধু দুই রুকনের মাঝখানে ছাড়া অন্য কোথাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশেষ কোনো দো‘আ বর্ণিত নেই। তবে উত্তম হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসে যেসব মৌলিক দো‘আ এসেছে সেগুলো বলে দো‘আ করা। তেমনি নিজের ভাষায় দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ কামনায় যেকোনো পছন্দনীয় বিষয় প্রার্থনা করা।

৩. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে গিয়ে ভিড় বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেওয়া। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা সুন্নাতপ্মপক্ষান্তরে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম। আর কোনো মুসলিমের জন্য সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে হারামে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। তাই সহজে চুম্বন করা সম্ভব হলে করবেন, নয়তো ডান হাতে ইশারা করে তাকবীর দিয়ে তাওয়াফ পুরো করবেন।

৪. কা‘বা ঘরের পর্দা বা মাকামে ইবরাহীম স্পর্শ করা এবং এর জন্য নির্দিষ্ট দো‘আ পড়া। এ কাজ শরী‘আতসম্মত নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করেছেন বলে প্রমাণ নেই। সাহাবীরা কেউ করেছেন বলেও নজির নেই। কাজটি যদি উত্তম হত, তাহলে তারা আমাদের আগে অবশ্যই এসব করতেন। রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার পর হাত চুম্বন করা অথবা সরাসরি রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করা সুন্নাহ’র পরিপন্থি। রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা সম্ভব না হলে এর দিকে ইশারা করা ও তাকবীর দেওয়া

শরী‘আতসম্মত নয়। সুতরাং রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ ছাড়া বাইতুল্লাহ’র আর কিছুই স্পর্শ করবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু’টি ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করেন নি। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইতুল্লাহ’র সব রুকন অর্থাৎ সব কোণ স্পর্শ করলে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে বললেন, ‘আপনি সব রুকন স্পর্শ করছেন কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সব রুকন স্পর্শ করেন নি?’ মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কা‘বার কিছুই পরিত্যাগ করার মতো নয়।’ একথা শুনে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তিলাওয়াত করলেন,

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الاحزاب: ٢١]

“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” [সূরা আল-আহযাব: ২১] মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কথা মেনে নিয়ে বললেন, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন’।[468]

৫. অনেকে মনে করেন তাওয়াফের দুই রাকাত সালাত মাকামে ইবরাহীমের পেছনেই পড়তে হবে। মনে রাখবেন, সেখানে সহজেই আদায় করা সম্ভব না হলে মসজিদে হারামের যেকোনো জায়গায় এমনকি হারামের বাইরে পড়লেও হয়ে যাবে। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু

---

[468] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৮৭৭।

ও অন্য সাহাবীগণও এমন করেছেন।[469]

৬. তাওয়াফের সময় মহিলাদের চেহারার আবরণ খোলা রাখা এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা। এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কাজ। এমন পবিত্র জায়গায় ও মহান ইবাদতের সময় আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন কীভাবে করা সম্ভব?

৭. তাওয়াফের সময় কা'বাকে বামে না রাখা। তা যে কারণেই হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لتأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ».

“যাতে তোমরা তোমাদের হজ শিখে নাও।”[470]

সুতরাং তাওয়াফ সহীহ হওয়ার জন্য কা'বাকে বাঁমে রাখার কোনো বিকল্প নেই।

৮. হিজর অর্থাৎ কা'বাঘর সংলগ্ন ঘেরা দেওয়া স্থানের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে তাওয়াফ করলে তা সহীহ হবে না, কারণ তা কা'বা ঘরেরই অংশ। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আমি কা'বা ঘরে ঢুকে সালাত আদায় করতে পছন্দ করতাম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে হিজরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন,

«صَلِّ فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ».

“যদি কা'বা ঘরে ঢুকতে চাও তবে হিজরে সালাত আদায় কর।

---

[469] সহীহ বুখারী, হজ অধ্যায়।

[470] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৭।

কারণ এটি কা‘বারই অংশ। (জাহেলী যুগে) কা‘বা ঘর নির্মাণের সময় তোমার গোত্র (কুরাইশরা) একে ছোট করে ফেলেছে। তারা তা কা‘বার ঘর থেকে বাইরে রেখেছে।”[471]

৯. ইহরাম বাঁধার পর থেকে হজের সমাপ্তি পর্যন্ত ইযতিবা করতে হয় বলে যে কিছু লোক ধারণা করে, তা সঠিক নয়। অনেকে আবার সালাত আদায়ের সময়ও ইজতিবা অবস্থায় থাকেন, তাও সঠিক নয়। কেননা সালাত আদায়ের সময় কাঁধ ঢেকে রাখাই নিয়ম।

পঞ্চম. সাঈ:

সাফা ও মারওয়ায় সাঈর ফযীলত

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَعِتْقِ سَبْعِيْنَ رَقَبَةً»

“যখন সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করবে, তা সত্তরজন গোলাম আযাদ করার নেকী বয়ে আনবে।”[472]

সঠিকভাবে সাঈর কাজ সম্পন্ন করবেন নিচের নিয়মে

১. সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে বলবেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

---

[471] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৭৬; আরোও দেখুন : সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৮৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৩।

[472] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২।

(ইন্নাস্সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ। আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহী।)

“নিশ্চয় সাফা মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। আমি শুরু করছি আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন।”[473]

২. এরপর সাফা পাহাড়ে উঠে বাইতুল্লাহ’র দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন[474] এবং আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার ঘোষণা দিয়ে বলবেন,

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يحي ويميت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ্।)

“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান![475] আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের

---

[473] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[474] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[475] নাসাঈ, হাদীস নং ২৯৭২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৪৬২৮।

ওপর ক্ষমতাবান। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।"[476]

৩. দো'আ করার সময় উভয় হাত তুলে দো'আ করবেন।[477]

৪. উল্লিখিত দো'আটি এবং দুনিয়া-আখিরাতের জন্য কল্যাণকর যেকোনো দো'আ সামর্থ্য অনুযায়ী তিন বার পড়বেন। নিয়ম হলো: উপরের দো'আটি একবার পড়ে তার সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য দো'আ পড়বেন। তারপর আবার ঐ দো'আটি পড়ে তার সাথে অন্য দো'আ পড়বেন। এভাবে তিন বার করবেন।' কারণ, হাদীসে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে, 'তারপর তিনি এর মাঝে দো'আ করেছেন। অনুরূপ তিনবার করেছেন।[478] সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে সাফা-মারওয়ায় পাঠ করার বিবিধ দো'আ বর্ণিত হয়েছে।[479]

৫. সাফা পাহাড়ে দো'আ শেষ হলে মারওয়ার দিকে যাবেন। যেসব দো'আ আপনার মনে আসে এবং আপনার কাছে সহজ মনে হয় তা-ই পড়বেন। সাফা থেকে নেমে কিছু দূর এগোলেই ওপরে ও ডানে-বামে সবুজ বাতি জ্বালানো দেখবেন। একে বাতনে ওয়াদী (উপত্যকার

---

[476] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[477] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৭২।

[478] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯০৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭৪।

[479] উদাহরণস্বরূপ, দ্র. বাইহাকী : (৫/৪৯-৫০)।

কোল) বলা হয়। এই জায়গাটুকুতে পুরুষ হাজীগণ দৌড়ানোর মত করে দ্রুত গতিতে হেঁটে যাবেন। পরবর্তী সবুজ বাতির আলামত সামনে পড়লে চলার গতি স্বাভাবিক করবেন। তবে মহিলারা এই জায়গাটুকুতেও চলার গতি স্বাভাবিক রাখবেন। সবুজ দুই আলামতের মাঝে চলার সময় নিচের দো'আটি পড়বেন,

«رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ».

(রাব্বিগ্‌ফির্ ওয়ার্হাম্, ইন্নাকা আন্তাল আ'য়ায্যুল আকরাম্।)

"হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং রহম করুন। নিশ্চয় আপনি অধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত।"[480]

৬. এখান থেকে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে মারওয়া পাহাড়ে উঠবেন। মারওয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে, সাফায় পৌঁছার পূর্বে যে আয়াতটি পড়েছিলেন, তা পড়তে হবে না।

৭. মারওয়ায় উঠার পরে কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দুই হাত তুলে আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার ঘোষণাসহ সাফার মত এখানেও দো'আ করবেন।[481]

৮. মারওয়া থেকে নেমে সাফায় আসার পথে সবুজ বাতির কাছে পৌঁছলে সেখান থেকে আবার দ্রুত গতিতে চলবেন। পরবর্তী সবুজ বাতির কাছে পৌঁছলে চলার গতি স্বাভাবিক করবেন।

---

[480] ইবন আবী শাইবা : (৪/৬৮); বাইহাকী : (৫/৯৫); তাবারানী, আদ্ দো'আ : ৮৭০; আলবানী, হিজ্জাতুন নবী পৃ. ১২০।

[481] নাসাঈ, হাদীস নং ২৯৬১, ২৯৮৪।

৯. সাফা পাহাড়ে এসে কা‘বাঘরের দিকে মুখ করে উভয় হাত তুলে আগের মত যিকির ও দো‘আ করবেন। সাফা মারওয়া উভয়টি দো‘আ কবুলের জায়গা। তাই উভয় জায়গাতে বিশেষভাবে দো‘আ করার চেষ্টা করবেন।

১০. একই নিয়মে সাঈর বাকি চক্করগুলোও আদায় করবেন।

সাঈ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য:

- সাঈ করার সময় সালাতের জামা‘আত দাঁড়িয়ে গেলে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন।
- সাঈ করার সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লে বসে আরাম করবেন। এতে সাঈর কোনো ক্ষতি হবে না।
- শেষ সাঈ অর্থাৎ সপ্তম সাঈ মারওয়াতে গিয়ে শেষ করবেন।
- সাঈতে অযু শর্ত নয়। তবে অযু বা পবিত্র অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব।[482]
- তাওয়াফ শেষ করার পর যদি কোনো মহিলার হায়েয শুরু হয়ে যায়, তবে তিনি সাঈ করতে পারবেন।

হজ ও উমরাকারীরা সাঈতে যেসব ভুল করেন

১. কিছু লোক মনে করে, সাঈ সাফা থেকে শুরু হয়ে মারওয়া থেকে ফিরে সাফাতে এসেই এক চক্কর পুরো হয়। এটি সুস্পষ্ট ভুল। সঠিক হলো, সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত যাওয়া এক চক্কর এবং

---

[482] ফাতাওয়া ইবন বায : (৫/২৬৪)।

মারওয়া থেকে ঘুরে আবার সাফায় এলে তার দুই চক্কর পূর্ণ হয়।

২. সাফা পাহাড়ে উঠে দুই হাত তোলা এবং সালাতের তাকবীরের মতো কা‘বার দিকে দুই হাত তুলে ইশারা করা।

৩. সাফা ও মারওয়ায় প্রত্যেকবার উঠা-নামার সময় ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ﴾ [البقرة: ١٥٨] [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৮] এ আয়াত তিলাওয়াত করা। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি শুধু প্রথমবার সাফায় ওঠার সময়ই পড়েছেন।

৪. সাঈর প্রত্যেক চক্করের জন্য নির্দিষ্ট দো‘আ নির্ধারণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ধরনের কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নিপ্মতাই উত্তম হলো নির্ধারিত কিছু না পড়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত যেকোনো দো‘আ করা বা নিজ ভাষায় দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণে যা মনে চায় তা-ই প্রার্থনা করা। এটিই অধিক কবুলযোগ্য এবং সুন্নাতসম্মত আমল।

৫. সাঈতে ইযতিবা করা। সঠিক হলো তাওয়াফে কুদূম ছাড়া অন্য কোথাও ইযতিবার বিধান নেই। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

৬. সাঈ পূর্ণ করতে সাফা-মারওয়ার চূড়ায় ওঠাকে শর্ত মনে করা। অথচ এটি শর্ত নয়। সাফা-মারওয়া উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী দুর্বলদের হুইল চেয়ার ঘোরানোর যে স্থান রয়েছে, সেখানে বিচরণ করাই যথেষ্ট।

৭. তাওয়াফের মতো সাঈর জন্যও পবিত্রতা ও অযুকে শর্ত মনে করা। সাঈর জন্য পবিত্রতা ও অযু শর্ত নয়, তবে তা উত্তম।

৮. এমন ধারণা করা যে, প্রয়োজন থাকলেও সাঈর ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করা যাবে না। যেমন, ক্লান্তি অবসানের জন্য বিশ্রাম, পানি পান, মল-মূত্র ত্যাগ কিংবা সালাত বা জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি প্রয়োজনে বিরতি দেওয়া যাবে না। এটা ঠিক নয়; বস্তুত এগুলো করাতে কোনো দোষ নেই।

৯. তাওয়াফের পরপরই সাঈ না করলে তা সহীহ হবে না বলে ধারণা করা। সাঈ তো তাওয়াফের পরই করতে হবে; কিন্তু সেটা সাথেসাথেই করতে হবে তা জরুরী নয়। যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে তাওয়াফের পর যথাসম্ভব বিলম্ব না করে সাঈ করাই উত্তম।

১০. নফল তাওয়াফের মতো নফল সাঈ করা। কারণ সাঈ কেবল হজ সংশ্লিষ্ট বিশেষ ইবাদত। নফল হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে সাঈ করার কোনো বিধান নেই। তাই নফল সাঈতে কোনো সাওয়াবও নেই।

ষষ্ঠ. মাথার চুল ছোট বা মুণ্ডন করা:

সাঈ শেষ হওয়ার পর মাথার চুল ছোট বা মুণ্ডন করে নিবেন। বিদায় হজের সময় তামাত্তুকারী সাহাবীগণ চুল ছোট করেছিলেন। হাদীসে এসেছে,

«فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا»

“অতঃপর সমস্ত মানুষ হালাল হয়ে গেল এবং তারা চুল ছোট করে

নিল।”[483] সে হিসেবে তামাত্তু হাজীর জন্য উমরার পর মাথার চুল ছোট করা উত্তম। যাতে হজের পর মাথার চুল কামানো যায়। মাথায় যদি একেবারেই চুল না থাকে তাহলে শুধু ক্ষুর চালাবেন। চুল ছোট করা বা মুণ্ডন করার পর গোসল করে স্বাভাবিক সেলাই করা কাপড় পরে নিবেন। ৮ যিলহজ পর্যন্ত হালাল অবস্থায় থাকবেন। **আর মহিলারা মাথার প্রতিটি চুলের গোছার অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের কর পরিমাণ কর্তন করবেন; এর চেয়ে বেশি নয়।**[484]

উপরোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার মাধ্যমে মুহরিমের উমরা পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি যদি তামাত্তু হজকারী বা স্বতন্ত্র উমরাকারী হন, তবে তার জন্য ইহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ ছিল তার সব হালাল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কিরান বা ইফরাদ হজকারী হন, তাহলে এখন তিনি চুল ছোট বা মাথা মুণ্ডন করবেন না। বরং যিলহজের ১০ তারিখ (কুরবানীর দিন) পাথর মারার পর প্রথম হালাল না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবেন।

এ সময়ে বেশি বেশি তাওবা-ইস্তেগফার, সালাত, সাদাকা, তাওয়াফ ইত্যাদি নেক কাজে নিয়োজিত থাকবেন। বিশেষ করে যিলহজের প্রথম দশদিন, যেগুলোতে নেক কাজ করলে অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সাওয়াব হাসিল হয়।

---

[483] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[484] মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবা : (৩/১৪৭)।

হজ-উমরাকারীগণ চুল ছোট বা মাথা মুণ্ডন করতে গিয়ে যেসব ভুল করেন

১. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার সময় সম্পূর্ণ মাথা পরিব্যাপ্ত না করা। কেউ কেউ একাধিক উমরা আদায়ের লক্ষ্যে এরূপ করে থাকে যা সুন্নাত পরিপন্থী ও ভুল।

২. সাঈর পর বাসায় গিয়ে স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরে চুল ছোট করা বা মাথা মুণ্ডন করা। অথচ নিয়ম হলো, ইহরামের কাপড় পরিহিত অবস্থায় চুল ছোট করা বা মাথা মুণ্ডন করা।

৩. অনেক হাজী সাহেব মনে করেন, তারা একে অন্যের চুল ছোট বা মুণ্ডন করতে পারবেন না। এটি ভুল ধারণা। হাজী সাহেব নিজের ইহরাম না ছাড়লেও অন্যের মাথার চুল ছোট বা কামিয়ে দিতে পারবেন।

উমরা সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

১. উমরার কোনো রুকন ছুটে গেলে উমরা আদায় হবে না। তবে সেই রুকনটি আদায় করলে উমরা হয়ে যাবে।

২. উমরার কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে তা আবার করে নিলে উমরা হয়ে যাবে, তা সম্ভব না হলে দম দিয়ে তা শুধরে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

৩. উমরা অবস্থায় কেউ যৌন সঙ্গম করলে, যদি এ কাজটি বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফের পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উমরা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়ার সাঈ এর পূর্বে হয়, তাহলেও

অধিকাংশ আলেমদের নিকট তার উমরা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে তাকে সর্বাবস্থায় এ নষ্ট উমরাটির কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তারপর সেটার কাযা করতে হবে এবং হাদী যবেহ করতে হবে। আর যদি বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করার পর মাথার চুল ছোট বা মুণ্ডানোর পূর্বে সঙ্গম অনুষ্ঠিত হয়, তবে তার উমরা আদায় হয়ে গেলেও তাকে একটি ছাগল ফিদয়া হিসেবে যবেহ করতে হবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[485]

৪. হজের সফরে একাধিক উমরা:

হজের সফরে অনেক হাজী সাহেবকে ইহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে উমরা আদায়ের পর বারবার উমরা করতে দেখা যায়। অথচ এর সপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। তাই নিয়ম হলো, এক সফরে একাধিক উমরা না করা। একাধিক উমরা থেকে বরং বেশি বেশি তাওয়াফ করাই উত্তম। কারণ,

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে একাধিক উমরা করেন নিপ্ম
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামও এক সফরে একাধিক উমরা আদায় করেন নিপ্ম
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু

---

[485] বাইহাকী : (৫/১২৭); আদওয়াউল বায়ান (৫/৩৮৯); আল-ইস্তিযকার (১২/২৯০)।

হজকারীদেরকে উমরা আদায়ের পর হালাল অবস্থায় থাকতে বলেছেন।[486]

- তাছাড়া এক বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে মোট চার বার উমরা করেছেন।[487] কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার ভেতর থেকে হারামের সীমানার বাইরে বের হয়ে উমরা করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।[488]

- অবশ্য হজের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বছরে একাধিকবার উমরা করার প্রমাণ রয়েছে। মক্কায় ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে ইবন উমার বছরে দু'টি করে উমরা করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বছরে তিনটি পর্যন্ত উমরাও করেছেন।[489] তাছাড়া তাঁর থেকে মাস দু'টি উমরাও বর্ণিত আছে।[490] এক হাদীসে এসেছে, 'তোমরা বার বার হজ ও উমরা আদায় করো। কেননা এ দু'টি দারিদ্র্য ও গুনাহ

---

[486] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৬।

[487] প্রথমবার: হুদায়বিয়ার উমরা, যা পথে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সম্পন্ন করতে পারেননি। বরং সেখানেই মাথা মুন্ডানোর মাধ্যমে হালাল হয়ে যান। দ্বিতীয় বার: উমরাতুল কাজা। তৃতীয় বার : জিয়িররানা থেকে। চতুর্থবার : বিদায় হজের সাথে।

[488] যাদুল মা'আদ : (২/৯২-৯৫)।

[489] সাইয়িদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ : (৭/৭৪৯)।

[490] যাদুল মা'আদ : (২/৯৩)।

মোচন করে।’[491] সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে দেখা যেত, এক উমরা আদায়ের পর তাদের মাথার চুল কাল হয়ে যাওয়ার পর আবার উমরা করতেন, তার আগে করতেন না।[492] তাই যদি কেউ উমরা করতেই চায় তাহলে হজের পরে করা যেতে পারে, যেমনটি করেছিলেন আয়েশা রা.। কিন্তু রাসূল তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন -এমন কোনো প্রমাণ নেই।[493]

---

[491] তিরমিযী, হাদীস নং ৮১০; নাসাঈ, হাদীস নং ২৬৩০; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৮৭; মুসনাদ আহমদ (১/২৫)।

[492] যাদুল মা‘আদ : (২/৯০-৯৫)।

[493] যাদুল মা‘আদ : (২/৯২-৯৫)।

ষষ্ঠ অধ্যায়: হজের মূল পর্ব

- ৮ যিলহজ: মক্কা থেকে মিনায় গমন
- ৯ যিলহজ: আরাফা দিবস
- মুযদালিফায় রাত যাপন
- যিলহজের ১০ম দিবস
- ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ: আইয়ামুত তাশরীক
- বিদায়ী তাওয়াফ
- হজের পরিসমাপ্তি

৮ যিলহজ: (তারবিয়া দিবস) মক্কা থেকে মিনায় গমন

হজের মূল কাজ শুরু হয় ৮ যিলহজ থেকে। যিনি হজের নিয়তে এসেছেন তিনি তামাত্তুকারী হলে পূর্বেই উমরা সম্পন্ন করেছেন। এখন তাকে শুধু হজের কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে। তিনি পরবর্তী কাজগুলো নিচের ধারাবাহিকতায় সম্পন্ন করবেন।

১. তারবিয়া[494]র দিন অর্থাৎ ৮ যিলহজ তামাত্তু হজকারী এবং মক্কাবাসিদের মধ্য থেকে যারা হজ করতে ইচ্ছুক তারা হজের জন্য ইহরাম বেঁধে মিনায় গমন করবেন। পক্ষান্তরে যারা মীকাতের বাইরে থেকে ইফরাদ বা কিরান হজের জন্য ইহরাম বেঁধে এসেছেন তারা ইহরামে বহাল থাকা অবস্থায় মিনায় গমন করবেন।

২. নতুন করে ইহরাম বাঁধার আগে ইহরামের সুন্নাত আমলসমূহ যেমন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। যেমনটি পূর্বে মীকাত থেকে উমরার ইহরাম বাঁধার সময় করেছেন।

৩. অতঃপর নিজ নিজ অবস্থানস্থল থেকেই ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন।

---

[494] ৮ যিলহজকে ইয়াওমুত তারবিয়া বলা হয়। ইয়াওমুত-তারবিয়া অর্থ পানি পান করানোর দিন। মিনায় পানি ছিল না বলে এদিন হাজীরা পানি পান করে নিতেন, সাথেও নিয়ে নিতেন এবং তাদের বাহন জন্তুগুলোকেও পানি পান করাতেন। তাই এই দিনকে পান করানোর দিন বলা হয়। ইবন কুদামা, আল-মুগনী : ৩১৪।

৪. তারপর যদি কোনো ফরয সালাতের পর ইহরাম বাঁধা যায় তবে তা ভালো। আর যদি তখন কোনো সালাত না থাকে, তবে ওযু করা সম্ভব হলে ওযুর পর দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল ওযুর সালাত পড়ে ইহরাম বাঁধা ভালো। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই, শুধু নিয়ত করে নিলেই চলবে।

৫. তারপর মনে মনে হজের নিয়ত করে لَبَّيْكَ حَجًّا (লাব্বাইকা হাজ্জান্) বলে হজের কাজ শুরু করবেন।

৬. যদি হজ পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতার আশংকা করেন, তাহলে তালবিয়ার পরপরই বলবেন,

اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

(আল্লাহুম্মা মাহাল্লী হাইছু হাবাসতানী)

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যেখানে আটকে দিবেন, সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।"[495]

৭. যদি বদলী হজ হয় তাহলে মনে মনে তার নিয়ত করে বদলী হজকারীর পক্ষ থেকে বলবেন,

لَبَّيْكَ حَجًّا عن... (লাব্বাইকা হাজ্জান্ 'আন....) (উমুক পুরুষ/মহিলার পক্ষ থেকে লাব্বাইক পাঠ করছি।)[496]

৮. মিনায় গিয়ে যোহর-আসর, মাগরিব-এশা ও পরদিন ফজরের

---

[495] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০৭।

[496] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮১১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯০৩।

সালাত আদায় করবেন। এ কয়টি সালাত মিনায় আদায় করা সুন্নাতপ্লপ্রতিটি সালাতই তার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবেন। চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতকে দু'রাকাত করে পড়বেন। এখানে সালাত জমা করবেন না অর্থাৎ দুই ওয়াক্তের সালাত একসাথে আদায় করবেন না। কারণ, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় একসাথে দু'ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন নিপ্ল

৯. মুস্তাহাব হলো, এ দিন বিশ্রাম নিয়ে হজের প্রস্তুতি গ্রহণ করা, যিক্‌র ও ইস্তেগফার করা এবং বেশি করে তালবিয়া পড়া। সময়-সুযোগ পেলে হজের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে পড়াশোনা করবেন। বিজ্ঞ আলেমগণের ওয়াজ-নসীহত ও হজ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনবেন।

১০. ৯ যিলহজ রাতে মিনায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাতপ্ল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাত মিনায় যাপন করেছেন। কোনো কারণে রাত্রি যাপন করা সম্ভব না হলে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ তা'আলা নিয়ত অনুযায়ী সাওয়াব দিবেন ইনশাআল্লাহ।

মিনা যাওয়ার আগে বা পরে হাজীগণ যেসব ভুল করেন

১. নফল তাওয়াফের মাধ্যমে হজের অগ্রিম সাঈ করে নেওয়া

৮ যিলহজ হজের ইহরামের পর তাওয়াফ-সাঈ করা। অনেক তামাত্তু হজকারী হজের এই ইহরামের পর নফল তাওয়াফ করে সাঈ করে নেন। এরূপ করার কথা হাদীসে নেই। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও

কেউ এরূপ করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। যেহেতু হাদীসে এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনের যুগে এরূপ করার কোনো প্রমাণ নেই, তাই এ বিষয়টি অবশ্যই বর্জন করতে হবে। নতুবা সুন্নাতের জায়গায় বিদ‘আত কায়েম হবে। তাই ইহরাম বেঁধে বা ইহরাম বাদে কোনভাবেই সেদিন তাওয়াফ-সাঈ করতে যাবেন না। যেসব সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তামাত্তু করেছিলেন, তারা ৮ যিলহজ ইহরাম বাঁধার পূর্বে বা পরে কোনো প্রকার সাঈ করা তো দূরের কথা তাওয়াফও করেন নি। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘বিদায় হজের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম... যারা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন, তারা তাওয়াফ ও সাঈ করে হালাল হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর মিনা থেকে ফেরার পর তারা হজের জন্য তাওয়াফ করেন।’[497]

যদি ৮ তারিখের দিনে তাওয়াফ বা সাঈ করার সুযোগ থাকত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অবশ্যই সাহাবীগণকে জানাতেন। আর সাহাবীগণও এটা ত্যাগ করতেন না। হানাফী ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব বাদায়িউস্‌সানায়ে’তে লিখা হয়েছে:

وَإِذَا أَحْرَمَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْحَجِّ فَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا يَسْعَى فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ لِلْحَجِّ لِمَنْ قَدِمَ مَكَّةَ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ ، وَالْمُتَمَتِّعُ إِنَّمَا قَدِمَ مَكَّةَ بِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ لَا بِإِحْرَامِ الْحَجِّ ، وَإِنَّمَا يُحْرِمُ لِلْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، وَطَوَافُ الْقُدُومِ لَا يَكُونُ بِدُونِ الْقُدُومِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَطُوفُ ، وَلَا يَسْعَى أَيْضًا ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ

[497] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৫৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১১।

بِدُونِ الطَّوَافِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَلِأَنَّ الْمَحَلَّ الْأَصْلِيَّ لِلسَّعْيِ مَا بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ فَرْضٌ ، وَالْوَاجِبُ يَصْلُحُ تَبَعًا لِلْفَرْضِ ، فَأَمَّا طَوَافُ الْقُدُومِ فَسُنَّةٌ . وَالْوَاجِبُ لَا يَتْبَعُ السُّنَّةَ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ تَقْدِيمَهُ عَلَى مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ فَصَارَ وَاجِبًا عَقِيبَهُ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ طَوَافُ الْقُدُومِ يُؤَخَّرُ السَّعْيُ إِلَى مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ فَلَا يَجُوزُ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ.

“তামাত্তু হজকারী যখন হজের ইহরাম বাঁধে তখন সে বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করবে না। সাঈও করবে না। এটা হল ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমত। কারণ, তাওয়াফে কুদূম ঐ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত যে হজের ইহরাম নিয়ে মক্কায় আগমন করল। পক্ষান্তরে তামাত্তু হজকারী উমরার ইহরাম নিয়ে মক্কায় আগমন করেছে। হজের ইহরাম নিয়ে আগমন করে নি। তামাত্তু হজকারী ব্যক্তি মক্কা থেকেই হজের ইহরাম বাঁধে। আর তাওয়াফে কুদূম বাইর থেকে আগমন ব্যতীত হয় না। তাওয়াফ-সাঈ এ জন্যেও করবে না যে, তাওয়াফ ব্যতীত সাঈ করা শরী‘আতসম্মত নয়। কেননা সাঈর মূল জায়গা তাওয়াফে যিয়ারতের পর। কেননা সাঈ হল ওয়াজিব। আর তাওয়াফে যিয়ারত হল ফরয। ওয়াজিব, ফরযের তাবে’ বা অনুবর্তী হতে পারে। পক্ষান্তরে তাওয়াফে কুদূম হচ্ছে সুন্নাতপ্ম আর ওয়াজিব সুন্নাতের তাবে’ বা অনুবর্তী হতে পারে না। তবে তাওয়াফে কুদূমের ক্ষেত্রে সাঈকে তার মূল জায়গা থেকে এগিয়ে নিয়ে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই অনুমতির কারণে তাওয়াফে কুদূমের পর ‘ওয়াজিব’ আদায়যোগ্য হয়েছে। তাই তাওয়াফে কুদূমের অনুপস্থিতিতে সাঈকে তার মূল জায়গায় পিছিয়ে নিতে হবে। সুতরাং

তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সা'ঈ আদায় করা জায়েয হবে না।"[498]

উক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, আমাদের বাংলাদেশী হাজীগণ মিনায় যাওয়ার সময় ইহরাম বেঁধে, নফল তাওয়াফ করে, যেভাবে হজের সাঈ অগ্রিম সেরে নেন, তা আদৌ শরী'আতসম্মত নয়। কেননা এর পেছনে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের আমল থেকে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। সুতরাং এ শরী'আতবিরোধী বিদ'আত কাজটি পরিত্যাগ করুন।

২. মসজিদে হারামে গিয়ে ইহরাম বাঁধা

মসজিদে হারামে গিয়ে ইহরাম বাঁধা।[499] বিদায় হজে সাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বেঁধেছিলেন। যদি মসজিদে হারামের ভেতরে বা বাইরের কোনো নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধার বিধান থাকতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন এবং সাহাবায়ে কেরাম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা আমলে নিতেন।

৩. ৮ তারিখ মিনায় পৌঁছা পর্যন্ত ইহরাম বিলম্বিত করা। এটি জায়েয; কিন্তু উত্তম নয়। কেননা বিদায় হজে সাহাবীগণ নিজ নিজ অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বেঁধেছেন। অতঃপর মিনার দিকে রওনা

---

[498] আল কাসানী : বাদায়িউস্সানায়ে': ২/৩৪৭।

[499] মনে রাখবেন, ইহরাম বাঁধার ক্ষেত্রে সুন্নাত হচ্ছে দু'টি। এক পবিত্র মক্কায় হারামের সীমারেখায় অবস্থিত আপনার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধা। দুই ৮ তারিখ সূর্যোদয়ের পর থেকে তা হেলে পড়ার পূর্বেই যেকোনো সময়ে ইহরাম বাঁধা।

হয়েছেন।[500]

৪. কোনো কোনো হাজী মনে করেন, উমরায় পরিহিত ইহরামের কাপড় না ধুয়ে হজের জন্য পরিধান করা বৈধ নয়। এটি ভুল ধারণা। কেননা ইহরামের কাপড় নতুন ও পরিষ্কার থাকা শর্ত নয়। পরিষ্কার থাকলে ভালো। কিন্তু ওয়াজিব নয়।

৫. অনেক হাজী সাহেব মিনায় রওনা হবার সময় তালবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করেন না। অথচ উচ্চস্বরে পাঠ করা সুন্নাতপ্মকেননা

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ. وفي رواية: فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ.

“জিবরীল আমার কাছে আগমন করে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে আদেশ দিচ্ছেন, যাতে আপনি আপনার সাহাবীগণকে নির্দেশ দেন, তারা যেন উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কেননা এটি হজের শ্লোগানের অন্তর্ভুক্ত।”[501]

খ. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো

---

[500] তবে যদি ৭ তারিখ কোনো কারণে কাউকে মিনা চলে যেতে হয়, তবে তার জন্য উত্তম হলো, ৮ তারিখ তিনি যেখানে থাকবেন সেখান থেকে ইহরাম বাঁধা। যদিও তা মিনা হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮ তারিখ ইহরাম বেঁধেছেন। তার আগে নয়।

[501] আহমাদ, হাদীস নং ১৬৫৬৮, ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩৮০৩।

হজ উত্তম? তিনি বললেন, ‘আল-‘আজ্জু ওয়াছ-ছাজ্জু।’[502] আল-আজ্জু হচ্ছে তালবিয়ার মাধ্যমে আওয়াজ উচ্চ করা, আর আছছাজ্জু হচ্ছে হাদী বা কুরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত করা।

গ. সাহাবায়ে কেরাম এই আদেশ পালন করেছেন। তারা উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করেছেন। রীতিমত চড়া গলায় তারা তালবিয়া পড়েছেন। এমনকি এর ফলে তাদের গলার স্বর ভেঙ্গে গিয়েছিল।[503] ইমাম নববী রহ. তালবিয়ার আওয়াজ উচ্চ করা প্রসঙ্গে বলেন, ‘এটি সর্বসম্মত মত। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, পরিমিতভাবে উচ্চ করা যাতে নিজের কষ্ট না হয়।

আর মহিলারা এমন আওয়াজে পড়বে যাতে তারা নিজেরা শুনতে পায়। কেননা তাদের উচ্চ আওয়াজে ফিতনার আশংকা রয়েছে।’[504] ইবন আবদিল বার বর্ণনা করেন, ‘এ বিষয়ে সর্বসম্মত মত হচ্ছে, মহিলারা অতি উঁচুস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে না। বরং এমন আওয়াজে পড়বে যাতে নিজেরা শুনতে পায়।’[505] এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকেও বর্ণনা এসেছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘মহিলারা তালবিয়া উচ্চস্বরে পড়বে না।’[506] ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, মহিলাদের জন্যে অনুমতি নেই

---

[502] তিরমিযী, হাদীস নং ৮২৭; হাকেম, হাদীস নং ১৬৫৫; বায়হাকী, হাদীস নং ৩৯৭৪।

[503] মুছান্নাফ ইবন আবী শাইবা : (৪/৮৬৪)।

[504] শারহু মুসলিম লিন-নাবাবী : (৪/৩৫১)।

[505] আল-ইসতিযকার : (৪/৫৭); বিদায়াতুল মুজতাহিদ : (১/৪৬৭)।

[506] মুছান্নাফে ইবন আবী শাইবা : (৪/৪১৬); সুনানে বায়হাকী : (৫/৪৬)।

যে, তারা উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে।’[507]

৬. কোনো কোনো হাজী মিনায় দুই ওয়াক্তের সালাত একত্র করে আদায় করেন। আবার কেউ কেউ চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে কসর করেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিনায় দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় না করে পৃথক পৃথকভাবে কসর করেছেন। আর মুসলিমদের যাবতীয় কাজে সুন্নাতের অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

---

[507] মুছান্নাফে ইবন আবী শাইবা : ৪/৪১৬; উমদাতুল কারী : ৯/১৭১।

চয়নিকা

‘আরাফার প্রতি আমার হৃদয় কোণে এমন এক টান ও আকর্ষণ সদা বর্তমান, যা আমাকে বারবার এর কাছে ফিরে আসতে বলে। এর পথে-প্রান্তরে রাত্রি যাপনে আগ্রহী করে তোলে এবং তাওবা-ইস্তেগফার ও তালবিয়া-শুকরিয়ার মাধ্যমে সেখানে সময় কাটাতে অস্থির করে তোলে। এ এমন এক স্থান, যে স্থানটির মতো আল্লাহর প্রতি প্রকাশ না পাওয়া নিখাঁদ একাগ্রতা ও সমুজ্জ্বল নিষ্ঠা জীবনে আর কোথাও খুঁজে পাই নি। আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বেল যে ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা এখানে দেখা যায়, তার নমুনাও আজীবন কোথাও পাই নি।’[508]

-মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল

[508] ফী মানযিলিল ওয়াহঈ : ১০০।

৯ যিলহজ: আরাফা দিবস

আরাফা দিবসের ফযীলত

যিলহজ মাসের ৯ তারিখকে ‘ইয়াওমু আরাফা’ বা আরাফা দিবস বলা হয়। এই দিবসে আরাফায় অবস্থান করা হজের শ্রেষ্ঠতম আমল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘হজ হল আরাফা।’[509]

সুতরাং আরাফায় অবস্থান করা ফরয। আরাফায় অবস্থান ছাড়া হজ সহীহ হবে না। এ দিনের ফযীলত ইয়াউমুন-নহর বা কুরবানীর দিনের কাছাকাছি। প্রত্যেক হাজী ভাইয়ের উচিৎ, এ দিনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমল করা। এ দিনের ফযীলত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো:

১. আল্লাহ তা‘আলা আরাফার দিন বান্দার নিকটবর্তী হন এবং বান্দাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যককে তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ»

“এমন কোনো দিন নেই যেদিনে আল্লাহ তা‘আলা আরাফার দিন থেকে বেশি বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। আল্লাহ সেদিন নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে নিয়ে ফিরিশতাদের সাথে গর্ব

---

509 নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৬; মুসনাদে আহমদ (৪/৩৩৫), হাদীস নং ১৪৭৭৪।

করে বলেন, ওরা কী চায়?"[510]

২. আল্লাহ তা‘আলা আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে নিয়ে আকাশবাসীদের সাথে গর্ব করেন। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمْ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى جَاءُونِى شُعْثًا غُبْرًا»

"নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আরাফায় অবস্থানকারীদের নিয়ে আকাশবাসীদের সাথে গর্ব করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা আমার কাছে এসেছে উস্কোখুস্কো ও ধূলিমলিন অবস্থায়।"[511]

৩. আরাফার দিন মুসলিম জাতির জন্য প্রদত্ত আল্লাহর দীন ও নি‘আমত পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির দিন। তারিক ইবন শিহাব বলেন, 'ইয়াহূদীরা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, আপনারা একটি আয়াত পড়েন থাকেন, যদি তা আমাদের ওপর নাযিল হতো তাহলে তা নাযিল হওয়ার দিন আমরা উৎসব পালন করতাম। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি অবশ্যই জানি কী উদ্দেশ্যে ও কোথায় তা নাযিল হয়েছে এবং তা নাযিল হবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় ছিলেন। তা ছিল আরাফার দিন। আর আল্লাহর কসম! আমরা ছিলাম আরাফার ময়দানে। (দিনটি জুমাবার

---

[510] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৮।

[511] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং (২/২২৪), হাদীস নং ৭০৮৯, ৮০৪৭।

ছিল) (আয়াতটি ছিল

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ﴾ [المائدة: ٣]

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম।"[512]

৪. জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আরাফায় অবস্থানকারী ও মুযদালিফায় অবস্থানকারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সালাম পৌঁছিয়েছেন এবং তাদের অন্যায়ের জিম্মাদারী নিয়ে নিয়েছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[512] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৬০৬। 'আরাফা দিবসে দীন পরিপূর্ণ করে দেওয়ার ব্যাখ্যায় ইবন রজব রহ বলেন, ঐ দিনে কয়েকভাবে দীনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। এক. হজ ফরয হওয়ার পর সম্পূর্ণ ইসলামী আবহে মুসলিমগণ ইতোপূর্বে আর কখনো হজ পালন করেন নি। অধিকাংশ আলেম এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। দুই. আল্লাহ তা'আলা হজকে (এই দিনে) ইবরাহীমী ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনেন এবং শির্ক ও মুশরিকদেরকে বিচ্ছিন্ন করেন। অতঃপর আরাফার ঐ স্থানে তাদের কেউই মুসলিমদের সাথে মিলিত হয় নি। আর নি'আমতের পরিপূর্ণতা ঘটেছে আল্লাহর ক্ষমা ও মার্জনা লাভের মাধ্যমে। কেননা আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া নি'আমত পরিপূর্ণ হয় না। এর উদাহরণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলেন,

﴿لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا ٢﴾ [الفتح: ٢]

'যাতে আল্লাহ ক্ষমা করেন তোমার অতীতের ও ভবিষ্যতের ত্রুটি এবং পূর্ণ করে দেন তোমার ওপর তাঁর নি'আমত। আর প্রদর্শন করেন তোমাকে সরল পথ"। [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২], লাতায়েফে মা'আরেফ : ৪৮৬।

আরাফার ময়দানে সূর্যাস্তের পূর্বে বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে নির্দেশ দিলেন, মানুষদেরকে চুপ করাতে। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নীরবতা পালন করুন। জনতা নীরব হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«يَا مَعاشِرَ النَّاسِ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ آنِفًا فَأَقْرَأَنِيْ مِن رَّبِيْ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لأَهْلِ عَرَفَاتَ وَأَهْلِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَضَمِنَ عَنْهُمْ التَّبِعَاتِ».

“হে লোকসকল, একটু পূর্বে জিবরীল আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমার রবের পক্ষ থেকে আরাফায় অবস্থানকারী ও মুযদালিফায় অবস্থানকারীদের জন্য আমার কাছে সালাম পৌঁছিয়েছেন এবং তাদের অন্যায়ের যিম্মাদারী নিয়েছেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি শুধু আমাদের জন্য? তিনি বললেন, এটা তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পর কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের জন্য। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর রহমত অঢেল ও উত্তম।”[513]

৫. আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে আল্লাহ তা‘আলা বিশেষভাবে ক্ষমা করে দেন। ইবন উমার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ، فَيَقُولُ:هَؤُلاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ

[513] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১৫১।

رَحْمَتِي، وَيَخَافُونَ عَذَابِي، وَلَمْ يَرَوْنِي، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ، أَوْ مِثْلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبًا غَسَلَهَا اللَّهُ عَنْكَ».

“আর আরাফায় তোমার অবস্থান, তখন তো আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। অতঃপর ফিরিশতাদের সাথে আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে নিয়ে গর্ব করে বলেন, এরা আমার বান্দা, এরা উস্কোখুস্কো ও ধূলিমলিন হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আমার কাছে এসেছে। এরা আমারই রহমতের আশা করে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে। অথচ এরা আমাকে দেখে নি। আর যদি দেখতো তাহলে কেমন হতো? অতঃপর বিশাল মরুভূমির বালুকণা সমান অথবা দুনিয়ার সকল দিবসের সমান অথবা আকাশের বৃষ্টির কণারাশির সমান পাপও যদি তোমার থাকে, আল্লাহ তা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিবেন।”[514]

৬. আরাফা দিবসের দো‘আ সর্বোত্তম দো‘আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ».

‘উত্তম দো‘আ হল আরাফা দিবসের দো‘আ।’[515]

৭. যারা হজ করতে আসেনি তারা আরাফার দিন সিয়াম পালন করলে তাদের পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আবূ কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

---

[514] আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, হাদীস নং ৮৮৩০।

[515] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৮৫; মুআত্তা মালেক (১/২১৪), হাদীস নং ৩২।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফা দিবসের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ».

“আরাফা দিবসের সিয়াম পালন পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মোচন করে দেয়।”[516]

তবে এ সিয়াম হাজীদের জন্য নয়, বরং যারা হজ করতে আসে নি তাদের জন্য। হাজীদের জন্য আরাফার দিবসে সিয়াম পালন সুন্নাত পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় আরাফা দিবসে সিয়াম পালন করেন নি; বরং সবার সামনে তিনি দুধ পান করেছেন।’[517] ইকরামা বলেন, আমি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে প্রবেশ করে আরাফা দিবসে আরাফার ময়দানে থাকা অবস্থায় সিয়াম পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দানে আরাফা দিবসের সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।[518]

বরং এ দিন হাজী সাহেব সিয়াম পালন না করলে তা বেশি করে দো‘আ, যিকির, ইস্তেগফার ও আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

---

[516] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬২।

[517] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১২৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৮৭০, ২৫১৭, ৩২৬৬, ৩৩৭৬।

[518] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৮০৩১, তবে এর সনদ দুর্বল।

আরাফায় গমন ও অবস্থান

১. সুন্নাত হলো ৯ যিলহজ ভোরে ফজরের সালাত মিনায় আদায় করা।[519] সূর্যোদয়ের পর 'তালবিয়া' পড়া অবস্থায় ধীরে সুস্থে আরাফার দিকে রওয়ানা হওয়া। তাকবীর পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ».

"তালবিয়া পাঠকারী তালবিয়া পাঠ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে কোনো দোষ মনে করেন নিপ্ আবার তাকবীর পাঠকারী তাকবীর পাঠ করতেন। তাতেও তিনি দোষ মনে করেন নি।"[520]

২. সুন্নাত হলো সূর্য হেলে পড়ার পরে মসজিদে নামিরায় যোহর আসর একসাথে হজের ইমামের পিছনে আদায় করে আরাফার ময়দানে প্রবেশ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের সময়ের পূর্বে নামিরায় অবস্থান করেছেন। এতে তাঁর জন্য নির্মিত তাবুতে তিনি যোহর পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়েছেন। নামিরা আরাফার বাইরে। তবে আরাফার সীমানায় অবস্থিত। অতঃপর সূর্য হেলে পড়লে তিনি যোহর ও আসরের সালাত যোহরের প্রথম ওয়াক্তে

[519] বর্তমানে হাজীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ফজরের পূর্বেই তাদেরকে আরাফায় নিয়ে যাওয়া হয়। নিশ্চয় এটা সুন্নাতের পরিপন্থী। তবে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে এ সুন্নাত ছুটে গেলে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।

[520] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৮৫।

আদায় করে আরাফায় প্রবেশ করেন।’[521]

বর্তমান সময়ে এ সুন্নাতের ওপর আমল করা প্রায় অসম্ভব। তবে যদি কারো পথঘাট ভালো করে চেনা থাকে; একা একা আরাফায় সাথিদের কাছে ফিরে আসতে পারবে বলে নিশ্চিত থাকে, অথবা একা একাই মুযদালিফা গমন, রাত্রিযাপন ও সেখান থেকে মিনার তাঁবুতে ফিরে আসার মতো শক্তি-সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকে তবে তার পক্ষে নামিরার মসজিদে এ সুন্নাত আদায় করা সম্ভব।

৩. সুন্নাত হলো হজের ইমাম হাজীদের উদ্দেশ্যে সময়োপযোগী খুতবা প্রদান করবেন। তিনি এতে তাওহীদ ও ইসলামের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করবেন। হাজীদেরকে হজের আহকাম সম্পর্কে সচেতন করবেন। তাদেরকে তাওবার কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, কুরআন-সুন্নাহ’র ওপর অটল থাকার আহবান জানাবেন। যেমনটি করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে তাঁর বিদায় হজের খুতবার সময়।

৪. সুন্নাত হলো যোহর আসর কসর করে একসাথে যোহরের সময়ে আদায় করা এবং সুন্নাত বা নফল কোনো সালাত আদায় না করা। এ নিয়ম সব হাজী সাহেবের জন্যই প্রযোজ্য। মক্কাবাসী বা আরাফার আশপাশে বসবাসকারী কিংবা দূরের হাজী সাহেবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যোহর-আসর কসর করে একসাথে যোহরের সময়ে আদায় করেছিলেন। উপস্থিত সকল হাজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[521] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৬২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কসর করে সে দুই ওয়াক্তের সালাত একসাথে আদায় করেছেন। তিনি কাউকে পূর্ণ সালাত আদায় করার আদেশ দেননি। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

«يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، أَتِمُّوا ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ».

“হে মক্কাবাসী, তোমরা (সালাত) পূর্ণ করে নাও। কারণ আমরা মুসাফির।”[522] কিন্তু বিদায় হজের সময় তা বলেননি। তাই বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এ সময়ের সালাতের কসর ও দুই সালাত জমা‘ তথা একত্র করা সুন্নাতপ্ন কসর ও জমা‘ না করা অন্যায়। বিদায় হজ সম্পর্কে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«أَنَّ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَطْنَ الوَادِيْ فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপত্যকার মধ্যখানে এলেন। তিনি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। অতঃপর (বিলাল) আযান ও ইকামত দিলেন এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[522] বাইহাকী : (৩/১৩৫); মুসনাদ আহমদ (৪/৪৩২)। (হাদীসটির সনদ দুর্বল। তবে মুআত্তা মালেকে এটি উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে তার কথা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি একবার মক্কায় আগমন করে সাথীদের নিয়ে সালাত কসর করে আদায় করেছিলেন। তারপর তার সাথে স্থানীয় যারা সালাত আদায় করেছিল তাদেরকে পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছিলেন। (মুআত্তা : (১/১৪০) হাদীস নং ২০২)

যোহরের সালাতের ইমামত করলেন। পুনরায় (বিলাল) ইকামত দিলেন এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করলেন। এ দু’য়ের মাঝখানে অন্য কোনো সালাত আদায় করলেন না।[523]

৫. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হজের ইমামের পেছনে জামাত না পেলেও যোহর-আসর একসাথে জমা করতেন, সহীহ বুখারীতে একটি বর্ণনা এসেছে,

«وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا».

“ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইমামের সাথে সালাত ছুটে গেলেও দুই সালাত একসাথে পড়তেন।”[524]

প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী নাফে‘ রহ. বলেন, ‘ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আরাফা দিবসে ইমামকে সালাতে না পেলে, নিজ অবস্থানের জায়গাতেই যোহর-আসর একত্রে আদায় করতেন।’[525]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ দুই ইমাম, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.ও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: إِذَا صَلَّيتَ يَوْمِ عَرَفَةَ فِيْ رِحْلِكَ فَصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلاَتَيْنِ لِوَقْتِهَا،وتَرْتَحِلُ مِنْ مُنْزِلٍ حَتَّى تَفْرُغَ

---

[523] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[524] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৬২।

[525] জা‘ফর আহমদ উসমানী, এ‘লাউসসুনান, (৭/৩০৭৩), দারুল ফিকর, বৈরূত, ২০০১।

مِنَ الصَّلاَةِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كَانَ يَأْخُذُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ، فَأَمَّا فِيْ قَوْلِنَا فَإِنَّهُ يُصَلِّيْهَا فِيْ رِحْلِهِ كَمَا يُصَلِّيْهَا مَعَ الإِمَامِ، يَجْمَعُهُمَا جَمِيْعًا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، لأَنَّ الْعَصْرَ إِنَّمَا قُدِّمَتْ لِلْوُقُوْفِ وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ .

"ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, (ইমাম) আবূ হানীফা রহ. আমাদেরকে হাম্মাদ-ইবরাহীম সূত্রে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আরাফার দিন যদি তুমি নিজের অবস্থানের জায়গায় সালাত আদায় কর তবে দুই সালাতের প্রত্যেকটি যার যার সময়ে আদায় করবে এবং সালাত থেকে ফারেগ হয়ে নিজের অবস্থানের জায়গা থেকে প্রস্থান করবে। (ইমাম) মুহাম্মাদ রহ. বলেন, (ইমাম) আবূ হানীফা রহ. এ মত গ্রহণ করেন। তবে আমাদের কথা এই যে, (হাজী) তার উভয় সালাত নিজের অবস্থানের জায়গায় ঠিক একইরূপে আদায় করবে যেভাবে আদায় করে ইমামের পেছনে। উভয় সালাতকে এক আযান ও দুই ইকামাতের সাথে একত্রে আদায় করবে। কেননা সালাতুল আসরকে উকুফের স্বার্থে এগিয়ে আনা হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবদুল্লাহ ইবন উমার, আতা ইবন আবী রাবাহ ও মুজাহিদ রহ. থেকে এরূপই আমাদের কাছে পৌঁছেছে।"[526]

তাই হজের ইমামের পেছনে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় সম্ভব হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় যোহর-আসর একত্রে পড়া সুন্নাতপ্ম

৬. হাজীগণ সালাত শেষে আরাফার ভেতরে প্রবেশ না করে থাকলে প্রবেশ করবেন। যারা মসজিদে নামিরাতে সালাত আদায় করবেন

[526] জা'ফর আহমদ উসমানী, প্রাগুক্ত।

তারা এ বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। কেননা মসজিদে নামিরার কিবলার দিকের অংশটি আরাফার সীমারেখার বাইরে অবস্থিত। মনে রাখবেন, আরাফার বাইরে অবস্থান করলে হজ হবে না।

৭. অতঃপর দো'আ ও মুনাজাতে লিপ্ত হবেন। দাঁড়িয়ে-বসে-চলমান তথা সর্বাবস্থায় দো'আ ও যিকির করতে থাকবেন। সালাত আদায়ের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত দু'হাত তুলে অনুচ্চস্বরে বেশি করে দো'আ, যিকির ও ইস্তেগফারে লিপ্ত থাকবেন। উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى».

"আমি আরাফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে উটের পিঠে বসা ছিলাম। তখন তিনি তাঁর দু'হাত তুলে দো'আ করছিলেন। অতঃপর তাঁর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল। এতে তাঁর উষ্ট্রীর লাগাম পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হাত দিয়ে লাগামটি তুলে নিলেন এবং তাঁর অন্য হাত উঠানো অবস্থায়ই ছিল।"[527]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

"উত্তম দো'আ হচ্ছে আরাফার দিনের দো'আ; আর উত্তম সেই বাক্য

---

[527] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২১৮২১; নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১১।

যা আমি ও আমার পূর্ববতী নবীগণ বলেছি, তা হচ্ছে, (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।) ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”[528]

কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ নসীহতের বৈঠকে শরীক হওয়া ইত্যাদিও আরাফায় অবস্থানের আমলের মধ্যে শামিল হবে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে কেবল বসে বসে নিম্নস্বরে দো‘আ-যিকর ও কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে। দিনের শেষ সময়টিকে বিশেষভাবে কাজে লাগাবেন। পুরোপুরিভাবে দো‘আয় মগ্ন থাকবেন।

৮. আরাফার পুরো জায়গাটাই হাজীদের অবস্থানের জায়গা। মনে রাখবেন, উরানা উপত্যকা আরাফার উকূফের স্থানের বাইরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ»

“আরাফার সব স্থানই অবস্থানস্থল। তবে বাতনে উরানা থেকে তোমরা উঠে যাও।”[529]

বর্তমান মসজিদে নামিরার একাংশ ও এর পার্শ্বস্থ নিম্ন এলাকাই বাতনে উরনা বা উরনা উপত্যকা। সুতরাং কেউ যেন সেখানে উকূফ

---

[528] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৮৫।

[529] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০১২; মুআত্তা মালেক, হাদীস নং ১৬৬; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৬৭৫১।

না করে। মসজিদে নামিরায় সালাত আদায়ের পর মসজিদের যে অংশ আরাফার ভেতরে অবস্থিত সে দিকে গিয়ে অবস্থান করুন। বর্তমানে মসজিদের ভেতরেই নীল বাতি দিয়ে আরাফা নির্দেশক চিহ্ন দেওয়া আছে। অতএব, এ সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

আরাফায় অবস্থান সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

- আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইয়াওমুন নাহর বা ১০ই যিলহজের দিন সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত আরাফার মাঠে অবস্থানের সময়সীমা প্রলম্বিত। যদি কেউ ৯ তারিখ দিবাগত রাত (দশ তারিখের রাত)-এর সুবহে সাদিক পর্যন্ত আরাফার মাঠে পৌঁছতে না পারে, তার হজ হবে না।

- আর যদি কেউ ৯ তারিখ দিবাগত রাত (দশ তারিখের রাত) সুবহে সাদিকের আগে আরাফার মাঠে যত অল্প সময়ই হোক না কেন, এমনকি যদি কেবল সে মাঠ অতিক্রম করে যায় তাতেই আরাফায় অবস্থান সম্পন্ন হয়ে যাবে। কারণ হাদীসে এসেছে, সাহাবী উরওয়া ইবন মুদ্বাররিস দেরি করে হজে আগমন করেন। তিনি বিভিন্ন উপত্যকা পেরিয়ে রাতের বেলায় আরাফায় অবস্থান করে মুযদালিফায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের হজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

«مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ»

'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে এই সালাত (মুযদালিফায় ফজর) আদায় করবে। আর এর পূর্বে রাতে বা দিনে আরাফায় অবস্থান করেছে

তার হজ পূর্ণ হয়েছে এবং সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছে।’[530]

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নজদের কিছু লোক হজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের বলেন,

«الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ جَاءَ عَرَفَةَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ، لَيْلَةَ جَمْعٍ ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»

“হজ হচ্ছে আরাফা। যে কেউ মুযদালিফার রাত্রিতে ফজরের সালাতের পূর্বে আরাফায় হাযির হতে পারবে তার হজ পূর্ণ হবে।”[531]

- আরাফার মাঠে ঐ ব্যক্তিই পূর্ণভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছেন, যিনি যোহরের পর থেকে সূর্যাস্তের পর কিছুটা অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত আরাফার মাঠে অবস্থান করেছেন।
- যদি কেউ শুধু দিনের অংশে অবস্থান করে। যেমন সূর্যাস্তের পূর্বেই বের হয়ে গেল। তার ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম মালেক রহ. বলেন, তার হজই হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা রহ., শাফেঈ ও আহমদ রহ.-এর মতে তার হজ শুদ্ধ হলেও তাকে এর জন্য দম দিতে হবে।
- অধিকাংশ আলেমের মতে, আরাফার মাঠে অবস্থানের সময় শুরু হয় সূর্য হেলে যাওয়ার পর; এর পূর্বে নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ

---

[530] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৬২০৮; নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৪১; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৫০; তিরমিযী, হাদীস নং ৮৯১।

[531] নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৬।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, উকূফে আরাফার সময় ৯ তারিখ দিনের শুরু থেকেই আরম্ভ হয়।

 কোনো ব্যক্তি যদি আরাফায় অবস্থানকালে অজ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে তার আরাফায় অবস্থান (উকূফ) শুদ্ধ হবে।

 মনে রাখবেন, আরাফার পাহাড়ে আরোহন করা হজের কোনো কাজ নয়। এটি দুনিয়ার অন্যান্য পাহাড়ের মতোই একটি পাহাড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পাহাড়ে উঠেননি। তিনি উটের উওপর সাওয়ার ছিলেন। সেটি পাহাড়ের পাদদেশে বড় পাথরগুলোর কাছে দণ্ডায়মান ছিল। সুতরাং পাহাড়ে ওঠা পুণ্যের কাজ নয়। অথচ এ পাহাড়ে উঠতে গিয়ে অনেকে মারাত্মকভাবে আহত, অসুস্থ বা সাথিদের হারিয়ে ফেলার মতো ঘটনার শিকার হন। যা একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত ও সুন্নাত বিরোধী কাজ।

মুযদালিফায় রাত যাপন

মুযদালিফায় অবস্থানের ফযীলত

মুযদালিফায় অবস্থানকারীদের ওপর আল্লাহ তা‘আলা অনুকম্পা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا، فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ، لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ».

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের এই (মুযদালিফার) সমাবেশে তোমাদের ওপর অনুকম্পা করেছেন, তাই তিনি গুনাহ্গারদেরকে নেককারদের

কাছে সোপর্দ করেছেন। আর নেককাররা যা চেয়েছে তা তিনি দিয়েছেন।"[532]

মুযদালিফার পথে রওয়ানা

১. যিলহজের ৯ তারিখ সূর্য ডুবে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর হাজী সাহেব ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে আরাফা থেকে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করবেন। হাজীদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে দূরে থাকবেন। চেঁচামেচি ও খুব দ্রুত হাঁটাচলা পরিহার করবেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'তিনি আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আরাফা থেকে মুযদালিফা গিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনে উট হাঁকানোর ধমক ও চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পেলেন্ন তখন তিনি তাঁর বেত দিয়ে লোকদেরকে ইশারা করে বললেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ»

"হে লোকসকল! তোমাদের শান্তভাবে চলা উচিৎন্ন কেননা দ্রুত চলাতে কোনো কল্যাণ নেই।"[533]

২. রাস্তায় জায়গা পাওয়া গেলে দ্রুতগতিতে চলাতে কোনো দোষ নেই। উরওয়া রহ. বলেন, 'উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে পথ অতিক্রম করছিলেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ

---

[532] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২৪।

[533] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৭১।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম গতিতে পথ অতিক্রম করছিলেন। আর যখন জায়গা পেয়েছেন তখন দ্রুত গতিতে চলেছেন।’[534]

৩. মাগরিবের সালাত আরাফার ময়দানে কিংবা মুযদালিফার সীমারেখায় প্রবেশের আগে কোথাও আদায় করবেন না।

৪. আরাফার সীমরেখা পার হয়ে প্রায় ৬ কি.মি. পথ অতিক্রম করার পর মুযদালিফা সীমারেখা শুরু হয়। মুযদালিফার শুরু ও শেষ নির্দেশকারী বোর্ড রয়েছে। বোর্ড দেখেই মুযদিলাফায় প্রবেশ করেছেন কিনা তা নিশ্চিত হবেন। তাছাড়া বড় বড় লাইটপোস্ট দিয়েও মুযদালিফা চিহ্নিত করা আছে। তা দেখেও নিশ্চিত হতে পারেন।

মুযদালিফায় করণীয়

১. মুযদালিফায় পৌঁছার পর ‘ইশার সময়ে বিলম্ব না করে মাগরিব ও ইশা এক সাথে আদায় করবেন। মাগরিব ও ইশা উভয়টা এক আযান ও দুই ইকামাতে আদায় করতে হবে। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় এলেন, সেখানে

---

[534] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৮৬; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২১৭৬০; মুআত্তা মালেক, হাদীস নং ৩৯৯।

তিনি মাগরিব ও ইশা এক আযান ও দুই ইকামতসহ আদায় করলেন। এ দুই সালাতের মাঝখানে কোনো তাসবীহ (সুন্নাত বা নফল সালাত) পড়লেন না। অতঃপর তিনি শুয়ে পড়লেন। ফজর (সুবহে সাদেক) উদিত হওয়া পর্যন্ত তিনি শুয়ে থাকলেন।”[535]

আযান দেওয়ার পর ইকামত দিয়ে প্রথমে মাগরিবের তিন রাকাত সালাত আদায় করতে হবে। এরপর সুন্নাত-নফল না পড়েই ‘ইশার সালাতের ইকামত দিয়ে ‘ইশার দু’রাকাত কসর সালাত আদায় করতে হবে। ফরয সালাত আদায়ের পর বেতরের সালাতও আদায় করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর ও মুকীম কোনো অবস্থায়ই এ সালাত ত্যাগ করতেন না।

২. সালাত আদায়ের পর বিলম্ব না করে বিশ্রাম নিবেন এবং শুয়ে পড়বেন। কেননা ওপরের হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় সুবহে সাদেক পর্যন্ত শুয়ে আরাম করেছেন। যেহেতু ১০ যিলহজ হাজী সাহেবকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফার রাতে আরাম করার বিধান রেখেছেন। সুতরাং হাজীদের জন্য মুযদালিফার রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পরিপন্থি।

৩. মুযদালিফায় পৌঁছার পর যদি ইশার সালাতের সময় না হয় তবে অপেক্ষা করতে হবে। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে,

---

[535] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

«إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»

“এ স্থানে (মুযদালিফায়) এ সালাত দু’টি মাগরিব ও ইশাকে তাদের সময় থেকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।”[536]

৪. সুন্নাত হলো সুবহে সাদেক উদিত হলে আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের সালাত আদায় করে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দো‘আ করা। আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দো‘আ ও যিকিরে মশগুল থাকা। আকাশ ফর্সা হবার পর সূর্যোদয়ের আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে,

«فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

“আকাশ ভালোভাবে ফরসা হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকূফ (অবস্থান) করেছেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি (মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে) যাত্রা আরম্ভ করেছেন।”[537]

তাই প্রত্যেক হাজী সাহেবের উচিৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মুযদালিফায় রাতযাপন করেছেন, ফজরের পর উকূফ করেছেন, ঠিক সেভাবেই রাতযাপন ও উকূফ করা।

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত আদায়ের পর ‘কুযা’ পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে উকূফ করেছেন। বর্তমানে এই পাহাড়ের পাশে মাশ‘আরুল হারাম মসজিদ অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[536] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৮৩।

[537] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

«وَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»

“আমি এখানে উকূফ করলাম তবে মুযদালিফা পুরোটাই উকূফের স্থান।”[538]

তাই সম্ভব হলে উক্ত মসজিদের কাছে গিয়ে উকূফ করা ভালো।অসম্ভব না হলে যেস্থানে রয়েছেন সেটা মুযদালিফার সীমার ভেতরে কি না তা দেখে নিয়ে সেখানেই অবস্থান করুন।

মুযদালিফায় উকূফের হুকুম

১. মুযদালিফায় উকূফ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨﴾ [البقرة: ١٩٨]

“তোমরা যখন আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, মাশ'আরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও তোমরা ইতোপূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৮]

২. ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেছেন, ফজর থেকে মূলত মুযদালিফায় উকূফের সময় শুরু হয়। তাঁর মতানুসারে মুযদালিফায় রাত যাপন করা সুন্নাত।আর ফজরের পরে অবস্থান করা ওয়াজিব। যদি কেউ ফজরের আগে ওযর ছাড়া মুযদালিফা ত্যাগ করে, তার ওপর দম

---

[538] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

(পশু যবেহ করা) ওয়াজিব হবে। কুরআনুল কারীমের আদেশ এবং মুযদালিফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আমলের দিকে তাকালে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতটি এখানে বিশুদ্ধতম মত হিসেবে প্রতীয়মান হয়।'[539]

৩. দুর্বল ব্যক্তি ও তার দায়িত্বশীল, মহিলা ও তার মাহরাম এবং হজ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির জন্য মধ্যরাতের পর চাঁদ ডুবে গেলে মুযদালিফা ত্যাগ করার অনুমতি রয়েছে। কারণ,

ক. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দুর্বল লোকদেরকে দিয়ে রাতেই মুযদালিফা থেকে পাঠিয়ে দিলেন।'[540]

খ. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর পরিবারের মধ্যে যারা দুর্বল তাদেরকে আগে নিয়ে যেতেন। রাতের বেলায় তারা মুযদালিফায় মাশ'আরুল হারামের নিকট উকূফ করতেন। সেখানে তারা যথেচ্ছা আল্লাহর যিকির করতেন। অতঃপর ইমামের উকূফ ও প্রস্থানের পূর্বেই তারা মুযদালিফা ত্যাগ করতেন। তাদের মধ্যে কেউ ফজরের সালাতের সময় মিনায় গিয়ে পৌঁছতেন। কেউ পৌঁছতেন তারও পরে।

---

[539] ইমাম শাফেঈ রহ ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ.-এর মতে মধ্যরাত পর্যন্ত উকূফ করা ওয়াজিব। মধ্য রাতের পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগ করলে দম ওয়াজিব হবে। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় মুযদালিফায় অবস্থান করলেই উকূফ হয়ে যাবে। খালিসুল জুমান : পৃ. ২১৪।

[540] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৭৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৪।

তারা মিনায় পৌঁছে কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।'[541]

গ. আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার মুক্তদাস আবদুল্লাহ রহ. আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাত্রি বেলায় মুযদালিফায় অবস্থান করলেন। অতঃপর সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর বললেন, 'হে বৎস, চাঁদ কি ডুবে গেছে?' আমি বললাম, না। অতঃপর আরো এক ঘন্টা সালাত পড়ার পর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস, চাঁদ কি ডুবে গেছে?' আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, চল। তখন আমরা রওয়ানা হলাম। অতঃপর তিনি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং নিজ আবাসস্থলে পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তখন আমি বললাম, 'হে অমুক, আমরা তো অনেক প্রত্যুষে বের হয়ে গেছি। তিনি বললেন, হে বৎস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের জন্য এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।'[542]

মুযদালিফা সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

১. হাজী সাহেবের যদি ভয় হয় যে, মুযদালিফায় পৌঁছে তিনি ইশার সময়ের মধ্যে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করতে পারবেন না, তাহলে পথেই তিনি ইশার সময় থাকতেই মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করে নিবেন।

---

[541] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৬।

[542] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৭৯; সহীহ মুসলিস, হাদীস নং ১২৯১।

২. বর্তমানে মুযদালিফার কিছু অংশ মিনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ননব্যালটি অধিকাংশ বাংলাদেশী হাজীর মিনার তাঁবু মুযদালিফায় অবস্থিত। এ জায়গাটুকু মিনা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও যেহেতু মৌলিকভাবে তা মুযদালিফার অংশ তাই এ অংশে রাত্রিযাপন করলেও মুযদালিফায় রাত্রিযাপন হয়ে যাবে।

৩. অনেক হাজী সাহেব মনে করেন, মুযদালিফা থেকে কঙ্কর কুড়ানো ফযীলতপূর্ণ কাজ। এটা একেবারে ভুল ধারণা। বরং যেখান থেকে সহজ হয় সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করা যাবে। তবে বর্তমানে মিনায় গিয়ে কঙ্কর খুঁজে পাওয়া রীতিমতো কষ্টের ব্যাপার। তাই মুযদালিফা থেকে তা কুড়িয়ে নিলে কোনো অসুবিধা নেই।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু প্রথম দিনের কঙ্করই মুযদালিফা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। তাই শুধু প্রথম দিনের সাতটি কঙ্কর কুড়িয়ে নিলেই হবে। পরবর্তীগুলো মিনা থেকে নিলে চলবে। আর যদি মনে করেন যে, একবারে সব দিনের পাথর নিয়ে নিবেন তবে তাও নিতে পারেন। সে হিসেবে যদি মিনায় ১৩ তারিখ থাকার ইচ্ছা থাকে তবে ৭০টি কঙ্কর নিবেন। নতুবা ৪৯টি পাথর নিবেন। তবে একেবারে সমান সমান না নিয়ে দু'একটি বেশি নেওয়া ভালো্‌কারণ, নিক্ষেপের সময় কোনটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তখন কম পড়ে যাবে। আর সেখানে কঙ্কর পাবেন না।

৫. বুটাকৃতির কঙ্কর নিবেন, যা আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করা যায়।

৬. কঙ্কর পানি দিয়ে ধুতে হবে এমন কোনো বিধান নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঙ্কর ধুয়েছেন বলে কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না।

যিলহজের দশম দিবস

দশম দিবসের ফযীলত:

১. এই দিন ‘ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার’ অর্থাৎ মহান হজের দিন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ﴾ [التوبة: ٣]

“আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন বলেন,

«أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ».

“এটা কোনো দিন? তারা বলল, ‘কুরবানীর দিন।’ তিনি বললেন, এটা বড় হজের দিন।”[543] কেননা এই দিনে হজের চারটি মৌলিক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। কাজগুলো হলো, বড় জামরায় পাথর মারা; কুরবানী করা, হলক বা কসর করা এবং বায়তুল্লাহ’র ফরয তাওয়াফ করা।

২. এই দিন বছরের সবচেয়ে বড় তথা মহৎ দিন। আবদুল্লাহ ইবন

[543] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৪৫।

কুর্ত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ»

“আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে বড় দিন হল কুরবানীর দিন তারপর এগারো তারিখের দিন।”[544]

কেননা এই দিনে সালাত ও কুরবানী একত্রিত হয়েছে। এ দু’টি আমল সালাত ও সদকার চেয়ে উত্তম। এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছেন, ‘আমি তোমাকে কাওসার[545] দান করেছি, তাই তুমি তোমার রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য শুকরিয়া স্বরূপ সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।[546]

দশম দিবসের ফজর

- আকাশ একেবারে ফর্সা হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা করবেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মুযদালিফায় ফজরের সালাত আদায় করে বললেন, ‘মুশরিকরা সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফা ত্যাগ করত না। আর তারা বলতো,

  أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ وَكَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ

---

[544] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭৬৫; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৯০৭৫।

[545] অনেক কল্যাণ ও জান্নাতের বিশেষ ঝর্ণাধারা। (আদওয়াউল বায়ান তাফসীর গ্রন্থে সূরা কাউসারের ব্যাখ্যা)।

[546] লাতাইফুল মা‘আরিফ : ২৮২-২৮৩।

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»

'হে ছাবীর[547] তুমি সূর্যের কিরণে আলোকিত হও, যাতে আমরা দ্রুত প্রস্থান করতে পারি, আর তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রস্থান করত না; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত করেছেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রস্থান করেছেন।'[548]

- তালবিয়া ও তাকবীর পাঠ করা অবস্থায় মিনার দিকে চলতে থাকবেন। ওয়াদি মুহাস্‌সারে[549] পৌঁছলে একটু দ্রুত চলবেন। বর্তমানে মানুষ ও যানবাহনের ভিড়ের কারণে তা কঠিন হয়ে গেছে। তবে সুন্নাতের অনুসরণের জন্য মনে মনে নিয়ত করবেন। সুযোগ হলে আমল করার চেষ্টা করবেন।

- বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ আরম্ভ না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন। ফযল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ».

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় (বড় জামরায়) কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ

---

[547] ছাবীর মুযদালিফায় অবস্থিত মক্কার সবচেয়ে বড় পাহাড়। সূর্যের আলো সে পাহাড়ে পড়লে সূর্য উদিত হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সহজ হয়। এ জন্য তারা ছাবীরের উপর সূর্যের কিরণ পড়ে আলোকিত হওয়ার আহ্বান জানাত।

[548] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২২।

[549] মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। এ স্থানে আল্লাহ তা'আলা আবরাহা ও তার হস্তি বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন।

করছিলেন।"[550]

১০ যিলহজের অন্যান্য আমল

১. জামরাতুল আকাবা বা বড় জামরায় ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

২. হাদী বা পশু যবেহ করা।

৩. মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছোট করা।

৪. তাওয়াফে ইফাযা (তাওয়াফে যিয়ারত) বা ফরয তাওয়াফ করা।

এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রথম আমল: জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ

জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের ফযীলত

- কঙ্কর নিক্ষেপের সাওয়াব আখিরাতের জন্য সঞ্চিত থাকবে। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَإِنَّهُ مَذْخُورٌ لَكَ»

"আর তোমার কঙ্কর নিক্ষেপ, তা তো তোমার জন্য সঞ্চিত করে রাখা হয়।"[551]

- কঙ্কর নিক্ষেপের সাওয়াব চোখ জুড়ানো সাওয়াব। রাসূলুল্লাহ

---

[550] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৪, ১৬৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৮১।

[551] মুজামে কাবীর', হাদীস নং ১৩৫৬৬।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا رَمِيْكَ الْجِمَارَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧﴾ [السجدة: ١٧]»

“আর জামরায় পাথর নিক্ষেপ, এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিম্নের বাণীটি প্রযোজ্য, ‘অতঃপর কোনো ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত, তার বিনিময়স্বরূপ।” [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৭][552]

- নিক্ষিপ্ত প্রতিটি কঙ্কর এক একটা গুনাহে কাবীরা মোচন করবে।

«وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيْرُ كَبِيْرَةٍ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ»

“আর জামরায় তোমার কঙ্কর নিক্ষেপ, এতে তোমার নিক্ষিপ্ত প্রতিটি কঙ্করের বিনিময়ে এক একটা ধ্বংসকারী কবীরা গুনাহ মোচন করা হবে।”[553]

- নিক্ষিপ্ত প্রতিটি কঙ্কর কিয়ামতের দিন নূর হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا رَمَيْتَ الجِمارَ كانَ لَكَ نُوراً يَوْمَ القِيامَةِ»

“তুমি যখন কঙ্কর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হবে।”[554]

---

[552] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১৩।

[553] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২।

[554] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১৫৭।

কঙ্কর নিক্ষেপের সময়সীমা

সূর্য উদয়ের সময় থেকে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আরম্ভ হয়। কিন্তু সুন্নাত হচ্ছে, সূর্য উঠার কিছু সময় পর দিনের আলোতে বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'কুরবানীর দিবসের প্রথমভাগে (সূর্য উঠার কিছু পরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের পিঠে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন।'[555] সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ-সুন্নত সময় থাকে। সূর্য হেলে যাওয়া থেকে শুরু করে ১১ তারিখের সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েয। দুর্বল ও যারা দুর্বলের শ্রেণীভুক্ত তাদের জন্য এবং মহিলার জন্য ১০ তারিখের রাতেই সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজর হওয়ার পরে কঙ্কর নিক্ষেপের অবকাশ রয়েছে। মোদ্দাকথা, ১০ যিলহজ সূর্যোদয় থেকে শুরু করে ১১ যিলহজ সুবহে সাদেক উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কঙ্কর মারা চলে, এ সময়ের মধ্যে যখন সহজে সুযোগ পাবেন তখনই কঙ্কর মারতে যাবেন।

দুর্বল ও মহিলাদের কঙ্কর নিক্ষেপ

যারা দুর্বল, হাঁটা-চলা করতে পারে না, তারা কঙ্কর মারার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবেন। প্রতিনিধিকে অবশ্যই হজ পালনরত হতে হবে। সে নিজের কঙ্কর প্রথমে মেরে, পরে অন্যের কঙ্কর মারবে।

মহিলা মাত্রই দুর্বল- এ কথা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[555] আবূ দাউদ (২/১৪৭)।

ওয়াসাল্লামের সাথে উম্মাহাতুল মুমিনীন সকলেই হজ করেছেন। তারা সবাই নিজের কঙ্কর নিজেই মেরেছেন। কেবল সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহু মোটা শরীরের অধিকারী হওয়ায় ফজরের আগেই অনুমতি নিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। তারপরও তিনি নিজের কঙ্কর নিজেই মেরেছেন। তাই মহিলা হলেই প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে, তেমন কোনো কথা নেই। যখন ভিড় কম থাকে, মহিলারা তখন গিয়ে কঙ্কর মারবেন। তারা নিজের কঙ্কর নিজেই মারবেন, এটাই নিয়ম। বর্তমানে জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের ব্যবস্থাপনা খুব চমৎকার। তাতে যেকোনো হাজী সহজে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারবে। হাঁটা বা চলাফেরা করতে পারে, এরকম ব্যক্তির জন্য প্রতিনিধি নিয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই।

কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতি

তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় জামরাতের দিকে এগিয়ে যাবেন। মিনার দিক থেকে তৃতীয় ও মক্কার দিক থেকে প্রথম জামরায়- যাকে জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা (বড় জামরা) বলা হয়- ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। কা'বা ঘর বাঁ দিকে ও মিনা ডান দিকে রেখে দাঁড়াবেন, এভাবে দাঁড়ানো সুন্নাত। অবশ্য অন্য সবদিকে দাঁড়িয়েও নিক্ষেপ করা জায়েয। আল্লাহু আকবার (اللَّهُ أَكْبَرُ) বলে প্রতিটি কঙ্কর ভিন্ন ভিন্নভাবে নিক্ষেপ করবেন। খুশূ-খুযূর সাথে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। মনে রাখবেন, কঙ্করগুলো যেন লক্ষস্থল তথা স্তম্ভ বা হাউজের ভেতরে পড়ে। কঙ্কর নিক্ষেপ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ٣٢﴾ [الحج: ٣٢]

“আর যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩২]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ».

“বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঈ ও জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের বিধান আল্লাহর যিকির কায়েমের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।”[556]

তাই কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ধীরস্থিরতা বজায় রাখা জরুরী, যাতে আল্লাহর নিদর্শনের অসম্মান না হয়। রাগ-আক্রোশ নিয়ে জুতো কিংবা বড় পাথর নিক্ষেপ করা কখনো উচিৎ নয়; বরং এটি মারাত্মক ভুল। জামরাতে শয়তান বাঁধা আছে বলে কেউ কেউ ধারণা করেন, তা ঠিক নয়। এ ধরনের কথার কোনো ভিত্তি নেই।

কঙ্কর নিক্ষেপ সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

১. হাত উঁচু করে বা বাহু তুলে কঙ্করগুলো লক্ষ্যস্থলে এমনভাবে নিক্ষেপ করতে হবে, যাকে নিক্ষেপ বলা যায়। উক্ত স্থানে শুধু রেখে দেওয়া যথেষ্ট নয়।

২. ধারাবাহিকভাবে একের পর এক কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। দীর্ঘ বিরতি দিবেন না। সামান্য বিরতি দিলে কোনো সমস্যা নেই। ভিড় বা

---

[556] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৮৮, তবে মরফূ‘ দুর্বল, মাওকূফ সহীহ।

কোনো সমস্যা ছাড়া বিরতি দিবেন না।

৩. সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সতর্কতামূলক সাতবারের অতিরিক্ত কঙ্কর নিক্ষেপ করা সমীচীন নয়। তবে যদি কোনো কঙ্কর লক্ষ্যস্থলের বাইরে পড়ে যায় তাহলে পুনরায় আর একটা নিক্ষেপ করবে।

৪. কঙ্কর ছাড়া সোনা, সিরামিক, লোহা, শুকনো মাটি ইত্যাদি বস্তু নিক্ষেপ করা যাবে না।

৬. কতবার নিক্ষেপ করেছে সে ব্যাপারে সন্দেহ হলে সর্বনিম্ন সংখ্যা ধর্তব্য হবে। তবে শুধু শুধু সন্দেহ ধর্তব্য হবে না। সেটাকে আমলে না নিয়ে দূর করে দিতে হবে।

৭. যদি কেউ নিশ্চিত হয় যে, সে ছয়বারই কঙ্কর নিক্ষেপ করেছে, তবে সাতটি পূর্ণ করতে হবে। আর যদি পাথর মারা শেষ করে চলে আসার পর নিশ্চিত হয় যে, তিনি ছয়টি কঙ্করই নিক্ষেপ করেছিলেন, তাহলে সতর্কতামূলক পন্থা হলো, পরবর্তী দিন সপ্তমবারের কঙ্কর নিক্ষেপটি কাযা করে নেওয়া। যদি কেউ কাযা না করে তাহলে উত্তম হলো, কিছু সদকা করা।

৮. বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে হাত তুলে দো'আ করবেন না।

দ্বিতীয় আমল: হাদী তথা পশু যবেহ করা

হাদী হলো এক সফরে হজ ও উমরা আদায় করার সুযোগ পাওয়ার শুকরিয়াস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশায় পশু যবেহ করা। হাদীর পশুর রক্ত অবশ্যই হারাম এলাকায় পড়তে হবে।

নিয়ম হলো, বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পরে হাদী যবেহ করা।

তামাত্তু ও কিরান হজকারী যদি মক্কাবাসী না হয়, তার ওপর হাদী যবেহ করা ওয়াজিব। ইফরাদ হাজীর জন্য হাদী যবেহ করা নফল বা মুস্তাহাব।

হাদী যবেহ বা কুরবানী করার ফযীলত

বিভিন্ন হাদীসে হাদী যবেহ করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

 ঐ হজই সবচেয়ে উত্তম যাতে হাদী বা কুরবানীর জন্তুর রক্ত প্রবাহিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোনো হজ সবচেয়ে উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন,

الْعَجُّ ، وَالثَّجُّ

“তালবিয়া দ্বারা স্বর উচ্চ করা এবং পশুর রক্ত প্রবাহিত করা।”[557]

 পশুর রক্ত প্রবাহিত করার সাওয়াব আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত থাকবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا نَحْرُكَ ، فَمَذْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ»

“আর তোমার (দ্বারা) পশুর রক্ত প্রবাহিত করা, তা তো আল্লাহর কাছে তোমার জন্য গচ্ছিত থাকবে।”[558]

 রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও পশু যবেহ করেছেন। হাদীসে এসেছে,

---

[557] তিরমিযী, হাদীস নং ৮২৭।

[558] সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ১১১২।

«وَنَحَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا».

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড়ানো অবস্থায় নহর (যবেহ) করলেন।"[559]

সুতরাং পশু যবেহ করা উত্তম কাজ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সেটা করেছেন এবং তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

হাদী বা কুরবানীর পশু সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা

১. হাদী বা কুরবানীর পশু হতে হবে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। যেমন উট, গরু, ভেড়া, ছাগল।

২. উট ও গরুতে সাতজন অথবা তার চেয়ে কমসংখ্যক হাজী শরীক থাকতে পারেন। ছাগল ও ভেড়ায় শরীক হওয়ার সুযোগ নেই। হাজী সাহেবদের জন্য একাধিক হাদী যবেহ করা এমনকি একাধিক কুরবানী করার সুযোগ রয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে নিজের পক্ষ থেকে একশত উট যবেহ করেছেন।[560]

৩. পশুর বয়স হতে হবে উটের পাঁচ বছর, গরুর দু'বছর, ছাগলের এক বছর। তবে ভেড়ার বয়স ছয় মাস হলেও চলবে।

৪. যবেহ করার সময় নিম্নোক্ত দো'আ বলতে হবে,

---

[559] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭১২। অন্য বর্ণনা মতে তিনি ৬৩টি হাদী নিজ হাতে যবেহ করেছেন। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[560] নিজ হাতে ৬৩ টি অন্যগুলো আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মাধ্যমে। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

«بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ».

(বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা)

'আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ, আমার পক্ষ থেকে এবং তোমার উদ্দেশ্যে।"[561]

৫. হাদী বা কুরবানীর পশু যবেহ বা নহর করার সময় গরু ও ছাগলকে বাম পার্শ্বে কিবলামুখী করে যবেহ করা সুন্নাতপ্ন আর উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় বাম পা বেঁধে নহর করা সুন্নাত।[562]

৬. উত্তম হলো, হাজী সাহেব নিজের হাদী নিজ হাতে যবেহ করবেন। তবে বর্তমানে তা অনেকাংশেই সম্ভব হয়ে উঠে না। কারণ যবেহ করার জায়গা অনেক দূরে। তদুপরি সেখানকার রাস্তাঘাট অচেনা। সুতরাং নিজে এ কঠিন কাজটি করতে গিয়ে হজের অন্যান্য ফরয কাজের ব্যাঘাত যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাই হাদী যবেহ করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত যেকোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

- ব্যাংকের মাধ্যমে হাদী যবেহ করার ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে হজের আগে সৌদি আরবস্থ সরকার অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে হাদীর টাকা জমা দিয়ে তাদেরকে উকীল বানাতে পারেন। তারা সরকারী তত্ত্বাবধানে আলেমদের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিকভাবে আপনার হাদী যবেহ করার কাজটি সম্পন্ন করবেন।

---

[561] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৬৬; বাইহাকী, হাদীস নং ১০২১৭।

[562] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩২০।

এক্ষেত্রে তারতীব বা সে দিনের কাজগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কারণ, আপনি উকীল নিযুক্ত করে দায়মুক্ত হয়েছেন। সুতরাং পাথর মারার পর আপনি কোনো প্রকার দেরী বা দ্বিধা না করে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে হালাল হয়ে যেতে পারবেন। বিশেষ করে আপনি যদি ব্যালটি হাজী হন, তবে এ পদ্ধতিটিই আপনার জন্য বেশি উপযোগী। কেননা ব্যালটি হাজীদের হাদীর টাকা যার যার কাছে ফেরত দেওয়া হয়। এ সুযোগে অনেক অসৎ লোক হাজীদের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য নানা প্রলোভন দেখায়। এতে করে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন।

- নন-ব্যালটি হাজীগণ বিভিন্ন কাফেলার আওতায় থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রুপ লিডাররা হাদী যবেহ করার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়ার জন্য করণীয় হলো, বিশ্বস্ত কয়েকজন তরুণ হাজীকে গ্রুপ লিডারের সাথে দিয়ে দেয়া, যারা সরেজমিনে হাদী ক্রয় এবং তা যবেহ প্রক্রিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন এবং অন্যান্য হাজীদেরকে তা অবহিত করবেন।

- আর যদি মক্কায় কারো বিশ্বস্ত আত্মীয়-স্বজন থাকে, তাহলে তাদের মাধ্যমেও হাদী যবেহ করার কাজটি করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যার মাধ্যমে হাদী যবেহ করার ব্যবস্থা করছেন, তার যথেষ্ট সময় আছে কি না। কেননা হজ মৌসুমে মক্কায় অবস্থানকারীরা নানা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

৭. হাদীস অনুযায়ী হাদী যবেহ করার সময় হচ্ছে চার দিন।

কুরবানীর দিন তথা ১০ই যিলহজ এবং তারপর তিনদিন।

৮. উত্তম হলো মিনাতে যবেহ করা। তবে মক্কার হারাম এলাকার ভেতরে যেকোনো জায়গায় যবেহ করলে চলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ»

"মিনার সব জায়গা কুরবানীর স্থান এবং মক্কার প্রতিটি অলিগলি পথ ও কুরবানীর স্থান।"[563]

৯. কুরবানীদাতার জন্য নিজের হাদীর গোশত খাওয়া সুন্নাতপ্ল কারণ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا»

"তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশু যবেহ করার স্থানে গিয়ে তেষট্টিটি উট নিজ হাতে যবেহ করেন। এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যবেহ করতে দিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশিষ্টগুলোকে যবেহ করেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে তাঁর হাদীতে শরীক করে নিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি উট থেকে একটি অংশ কেটে আনতে আদেশ করলেন। এরপর

---

[563] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯৩৭, ২৩২৪।

সবগুলো অংশ একসাথে রান্না করা হলো। তিনি তার গোশ্ত খেলেন এবং তার ঝোল পান করলেন।”[564]

১০. হারামের অধিবাসী ও হারামের এরিয়াতে বসবাসকারী মিসকীনদের মধ্যে গোশ্ত বিলিয়ে দেওয়া যাবে। তবে কসাইকে এ গোশত দিয়ে তার কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে না। বরং অন্য কিছু দিয়ে তার কাজের পারিশ্রমিক দিতে হবে। কিন্তু কসাই যদি গরীব হয়, তাহলে পারিশ্রমিকের সাথে কোনো সম্পর্ক না রেখে তাকে এ গোশত দেওয়া যাবে।

১১. তামাত্তু ও কিরান হজকারী যদি হাদী না পায়, কিংবা হাদী ক্রয় করতে সামর্থবান না হয়, তাহলে হজের দিনগুলোতে তিনটি এবং বাড়িতে ফিরে এসে সাতটি, সর্বমোট দশটি রোযা রাখবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“অতঃপর যে ব্যক্তি উমরার পর হজ সম্পাদনপূর্বক তামাত্তু করবে, সে যে হাদীর পশু সহজ হবে, (তা যবেহ করবে)। কিন্তু যে তা পাবে না সে হজে তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন সাত দিন সিয়াম পালন করবে। এই হলো পূর্ণ দশ।

---

564 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

এই বিধান তার জন্য, যার পরিবার মসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

হজের দিনগুলোতে তিনদিন অর্থাৎ হজের সময় কিংবা হজের মাসে। যেমন, যিলহজের ৬, ৭, ৮ বা ৭, ৮, ৯ অথবা ১১, ১২, ১৩। তবে কুরবানীর দিন সিয়াম পালন করা যাবে না। বাড়িতে ফিরে এসে সাতটি সিয়াম পালন করবে। এ সাতটি সিয়াম পালনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব নয়। অসুস্থতা বা কোনো উযরের কারণে যদি সিয়াম পালন বিলম্ব হয়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে না।

হাদী ছাড়াও অতিরিক্ত কুরবানী করার বিধান:

বিজ্ঞ আলেমগণ হজের হাদীকে হাদী ও কুরবানী উভয়টার জন্যই যথেষ্ট হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে কুরবানী করলে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। হাজী যদি মুকীম হয়ে যায় এবং নেসাবের মালিক হয়, তার ওপর ভিন্নভাবে কুরবানী করা ওয়াজিব বলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে হাজী মুকীম না মুসাফির, এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক থাকলেও বাস্তবে হাজী সাহেবগণ মুকীম নন। তারা তাদের সময়টুকু বিভিন্নস্থানে অতিবাহিত করেন। তাছাড়া দো‘আ কবুল হওয়ার সুবিধার্থে তাদের জন্য মুসাফির অবস্থায় থাকাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

অজানা ভুলের জন্য দম দেওয়ার বিধান

হজকর্ম সম্পাদনের পর কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন যে কে জানে কোথাও কোনো ভুল হল কি-না। অনেক গ্রুপ লিডার হাজী সাহেবগণকে উৎসাহিত করেন যে ভুলত্রুটি হয়ে থাকতে পারে তাই

ভুলের মাশুল স্বরূপ একটা দম[565] দিয়ে দিন। নিঃসন্দেহে এরূপ করা শরী‘আত পরিপন্থি। কেননা আপনি ওয়াজিব ভঙ্গ করেছেন তা নিশ্চিত বা প্রবল ধারণা হওয়া ছাড়া নিজের হজকে সন্দেহযুক্ত করছেন। আপনার যদি সত্যি সত্যি সন্দেহ হয় তাহলে বিজ্ঞ আলেমগণের কাছে ভালো করে জিজ্ঞেস করবেন। তারা যদি বলেন যে, আপনার ওপর দম ওয়াজিব হয়েছে তাহলে কেবল দম দিয়ে শুধরিয়ে নিবেন। অন্যথায় নয়। শুধু সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে দম দেওয়ার কোনো বিধান ইসলামে নেই। তাই যে যা বলুক না কেন এ ধরনের কথায় মোটেও কর্ণপাত করবেন না।

তৃতীয় আমল: মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

কঙ্কর নিক্ষেপ ও হাদী যবেহ করার কাজ শেষ হলে, পরবর্তী কাজ হচ্ছে, মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা। তবে মুণ্ডন করাই উত্তম। কুরআনুল কারীমে মুণ্ডন করার কথা আগে এসেছে, ছোট করার কথা এসেছে পরে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]

“তোমাদের কেউ কেউ মাথা মুণ্ডন করবে এবং কেউ কেউ চুল ছোট করবে।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৭] এতে বোঝা গেল, চুল ছোট করার চেয়ে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা হালাল হওয়ার একমাত্র মাধ্যম।

---

565 এটাকে দমে-খাতা ভুলের মাশুল বলা হয়।

মাথা মুণ্ডনের ফযীলত:

মাথা মুণ্ডনের ফযীলত সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। যেমন,

- যারা মাথা মুণ্ডন করবে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমার দো‘আ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالَهَا ثَلاَثًا، قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ»

‘হে আল্লাহ, মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করুন।’ তারা বললেন, চুল ছোটকারীদেরকেও, তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করুন।’ তিনবার তিনি তা বললেন। তারা বললেন, ছোটকারীদেরও। তখন তিনি বললেন, চুল ছোটকারীদেরকেও (ক্ষমা করুন)।”[566]

এতে মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য দো‘আ করেছেন তিনবার আর যারা চুল ছোট করেছে, তাদের জন্য দো‘আ করেছেন একবার।

- যারা মাথা মুণ্ডন করবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্যে রহমতের দো‘আ করেছেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[566] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭২৮।

«رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ».

"মাথা মুণ্ডনকারীদের ওপর আল্লাহ রহম করুন। তারা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, চুল ছোটকারীদের ওপরও?' তিনি বললেন, 'মাথা মুণ্ডনকারীদের ওপর আল্লাহ রহম করুন।' তারা বললেন, হে আললাহর রাসূল, চুল ছোটকারীদের ওপরও? তিনি বললেন, 'মাথা মুণ্ডনকারীদের ওপর আল্লাহ রহম করুন।' তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, চুল ছোটকারীদের ওপরও' তিনি বললেন, চুল ছোটকারীদের ওপরও।"[567]

 রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মাথা মুণ্ডন করেছেন। হাদীসে এসেছে,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় এলেন, জামরাতে এসে তিনি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। এরপর মিনায় তাঁর অবস্থানের জায়গায় এলেন এবং কুরবানী করলেন। তারপর ক্ষৌরকারকে বললেন, নাও। তিনি হাত দিয়ে (মাথার) ডান দিকে ইশারা করলেন,

---

[567] ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৩০৪৪।

অতঃপর বাম দিকে। তারপর লোকদেরকে তা দিতে লাগলেন।"[568]

আর নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তাই সর্বোত্তম কাজ।

 মাথা মুণ্ডনের কারণে প্রতিটি চুলের জন্য একটি নেকী ও একটি গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا حَلْقُكَ لِرَأْسِكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ وَتَسْقُطُ سَيِّئَةٌ»

"আর তোমার মাথা মুণ্ডন, এতে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে তোমার জন্যে একটি সাওয়াব ও একটি গুনাহের ক্ষমা রয়েছে।"[569]

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا حِلاقُكَ رَأْسَكَ ، فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ ، وَتُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الذُّنُوبُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " إِذًا يُدْخَرُ لَكَ فِي حَسَنَاتِكَ»

"আর তোমার মাথা মুণ্ডনের ফলে মুণ্ডানো প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে তোমার জন্য একটি সাওয়াব রয়েছে এবং একটি করে গুনাহের বিলুপ্তি রয়েছে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, গুনাহসমূহ যদি এর চেয়ে কম হয়? রাসূলুল্লাহ বললেন, তাহলে তা তোমার নেক

---

[568] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩০৫।

[569] সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ১১১২।

আমলসমূহে জমা রাখা হবে।”[570]

 কিয়ামতের দিন মুণ্ডিত প্রত্যেকটি চুল নূরে পরিণত হবে। উবাদা ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعْرَةٌ تَقَعُ فِي الأَرْضِ إِلاَّ كَانَتْ لَكَ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

“আর, তোমার মাথা মুণ্ডনের ফলে মুণ্ডানো চুল থেকে যা যমীনে পড়বে, তার প্রত্যেকটা কিয়ামতের দিন তোমার জন্য নূরে পরিণত হবে।”[571]

মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার পদ্ধতি

১. মাথা মুণ্ডন করা হোক বা চুল ছোট করা হোক পুরো মাথাব্যাপী করা সুন্নাতপ্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা মাথাই মুণ্ডন করেছিলেন। মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা বা ছোট করা, আর কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বিরোধী। নাফে‘ রহ. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন,

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কাযা‘) قَزَعٌ থেকে বারণ করেছেন। কাযা‘ সম্পর্কে নাফে‘ রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি

---

570 কাশফুল-আস্তার (মুসনাদে বাযযার) : (১/৪১১; সহীহুত তারগীব, হাদীস নং ১১১৩।

571 তাবারানী ফীল কাবীর, হাদীস নং ১৩৫৬৬।

বললেন, শিশুর মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা এবং কিছু অংশ রেখে দেওয়া।[572]

২. কসর অর্থাৎ চুল ছোট করার অর্থ পুরো মাথা থেকে চুল কেটে ফেলা। ইবন মুনযির বলেন, যতটুকু কাটলে চুল ছোট করা বলা হয়, ততটুকু কাটলেই যথেষ্ট হবে।[573]

৩. কারো টাক মাথা থাকলে মাথায় ব্লেড অথবা ক্ষুর চালিয়ে দিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

৪. মহিলাদের ক্ষেত্রে চুলের গোছা থেকে হাতের আঙুলের এক কর পরিমাণ চুল কেটে ফেলাই যথেষ্ট। মহিলাদের জন্য হলক নেই। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ ، وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ».

“মহিলাদের ব্যাপারে মাথা কামানোর বিধান নেই, তাদের ওপর রয়েছে ছোট করার বিধান।”[574]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

«نَهَى رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا».

“রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীকে মাথা মুণ্ডন করতে

---

[572] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯২০, ৫৯২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১২০।

[573] সাইয়িদ আস-সাবিক : ফিকহুসসুন্নাহ (১/৭৪৩)।

[574] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯৮৫।

নিষেধ করেছেন।”[575]

সুতরাং মহিলাদের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, তারা তাদের মাথার সব চুল একত্রে ধরে অথবা প্রতিটি বেণী থেকে এক আঙুলের প্রথম কর পরিমাণ কাটবে।

৫. মাথা মুণ্ডনের পর শরীরের অন্যান্য অংশের অবিন্যস্ত অবস্থা দূর করা সুন্নাতপ্ম যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নখ কেটেছিলেন।[576] ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হজ অথবা উমরার পর গোঁফ ও নখ কাটতেন।[577]

অনুরূপভাবে বগল ও নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করাও বাঞ্ছনীয়। কেননা তা কুরআনুল কারীমের নির্দেশ ولِيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ ‘এবং তারা যেন তাদের ময়লা পরিষ্কার করে।’[578]-এর আওতায় পড়ে।

মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার সুন্নাত পদ্ধতি

মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করার সুন্নাত পদ্ধতি হলো, মাথার ডান দিকে শুরু করা, এরপর বাম দিক মুণ্ডন করা। হাদীসে এসেছে,

«قَالَ لِلْحَلاَّقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষৌরকারকে বললেন, নাও। তিনি হাত দিয়ে (মাথার) ডান দিকে ইশারা করলেন, অতঃপর

---

[575] তিরমিযী, হাদীস নং ৯১৫, তবে এর সনদ দুর্বল।

[576] সাইয়িদ আস-সাবেক : প্রাগুক্ত (১/৭৪৩)।

[577] বায়হাকী, হাদীস নং ৯৪০৩।

[578] সূরা আলহাজ্জ-, আয়াত।২৯ :

বাম দিকে। এরপর মানুষদেরকে তা দিতে লাগলেন।”[579]

মাথা মুণ্ডন সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

১) মাথা মুণ্ডন বা মাথার চুল ছোট করার ব্যাপারে ইহরাম অবস্থায় থাকা না থাকার কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। অর্থাৎ হাজী সাহেব নিজের মাথা নিজে কামাতে বা চুল ছোট করতে পারেন। নিজে হালাল না হয়েও অপরের মাথা কামাতে বা চুল ছোট করে দিতে পারেন।

২) পুরো মাথা মুণ্ডন করতে হবে অথবা পুরো মাথার চুল ছোট করতে হবে। সামান্য কিছু চুল ফেলা যথেষ্ট হবে না। কেননা এটাকে মুণ্ডন বা ছোট করা কোনটাই বলা যায় না।

৩) মাথা মুণ্ডন বা মাথার চুল ছোট না করে অন্য কিছুকে এটার স্থলাভিষিক্ত করা যাবে না।

৪) কুরবানীর শেষ দিন পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন বিলম্বিত করা জায়েয।

৫) মহিলারা পুরো মাথার চুল থেকে এক আঙ্গুলের অগ্রভাগ অর্থাৎ এক কর পরিমাণ ছোট করবে। যার পরিমাণ প্রায় ২ সেন্টিমিটার।

৬) কঙ্কর নিক্ষেপ, পশু যবেহ ও মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করলেই হাজী সাহেবের জন্য যৌনমিলন ছাড়া ইহরামের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিষিদ্ধ সব বিষয় হালাল হয়ে যাবে।

---

[579] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩০৫।

৭) এখন থেকে হাজী সাহেব সেলাই করা কাপড় পরিধান, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি করতে পারবেন। তবে স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন, মিলন ইত্যাদি এখনও বৈধ হবে না। তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারতের পরই কেবল এসব বৈধ হবে। তখন হাজী সাবেহ সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাবেন।

চতুর্থ আমল: তাওয়াফে ইফাযা এবং হজের সাঙ্গ

তাওয়াফে ইফাযা ফরয এবং এ তাওয়াফের মাধ্যমেই হজ পূর্ণতা লাভ করে। তওয়াফে ইফাযাকে তাওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়। আবার অনেকে এটাকে হজের তাওয়াফও বলে থাকেন। এটি না হলে হজ শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩ ﴾ [الحج: ٢٩]

"তারপর তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তাদের মানতসমূহ পূরণ করে এবং প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে।" [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৯]

তাওয়াফে ইফাযার নিয়ম:

কঙ্কর নিক্ষেপ, হাদী যবেহ, মাথার চুল মুণ্ডন বা ছোট করা এ তিনটি কাজ শেষ করে গোসল করে, সুগন্ধি মেখে সেলাইযুক্ত কাপড় পরে পবিত্র কাবার দিকে রওয়ানা হবেন। তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে স্বাভাবিক পোশাক পরা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাতঢ়ু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«كُنْتُ أُطَيِّبُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ الْبَيْتَ».

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি ইহরাম বাঁধার পূর্বে ইহরামের জন্য, আর হালাল হওয়ার জন্য তাওয়াফের পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।”[580]

শুরুতে উমরা আদায়ের সময় যে নিয়মে তাওয়াফ করেছেন ঠিক সে নিয়মে তাওয়াফ করবেন। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করবেন। তবে এ তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা নেই।

তাওয়াফ শেষ করার পর দু’রাকাত সালাত আদায় করে নিবেন। সেটা যদি মাকামে ইবরাহীমের সামনে সম্ভব না হয়, তাহলে যেকোন স্থানে আদায় করে নিতে পারেন। সালাত শেষে যমযমের পানি পান করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন।[581]

তাওয়াফের পর, পূর্বে উমরার সময় যেভাবে সা‘ঈ করেছেন ঠিক সেভাবে সাফা মারওয়ার সা‘ঈ করবেন।[582]

তাওয়াফে ইফাযা সংক্রান্ত কিছু মাস’আলা

১. হাজী সাহেব যদি তামাত্তু হজ আদায়কারী হয়ে থাকেন তাহলে তিনি তাওয়াফের পরে সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ করবেন। এটা তামাত্তু হাজীর হজের সা‘ঈ। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন,

---

[580] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮৯।

[581] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮, ২০২৭।

[582] আবূ হানীফা রহ.-এর মতে এ সাঈ করাটা ওয়াজিব। তবে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ও ইমাম এটিকে ফরয বলেছেন। আর এটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত।

«فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا»

“তারপর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করলেন, সাফা ও মারওয়ার সা‘ঈ করলেন। তারপর হালাল হয়ে গেলেন। অতঃপর তারা হজের সময় মিনা থেকে ফিরে আসার পর তাদের হজের জন্য আরেকটি তাওয়াফ করলেন। আর যারা হজ-উমরা উভয়টির নিয়ত করেছিলেন তারা একটি তাওয়াফ করলেন।”[583] এ হাদীসে তাওয়াফ বলতে সাফা ও মারওয়ার সা‘ঈ বোঝানো হয়েছে।

২. কিরান ও ইফরাদকারী হাজীগণ যদি তাওয়াফে কুদূমের সাথে সা‘ঈ না করে থাকেন, তবে তারা তাওয়াফের পরে সা‘ঈ করবেন।

৩. ইফরাদ হজকারী তাওয়াফে কুদূমের পর সা‘ঈ করে থাকলে এখন আর সা‘ঈ করতে হবে না। অনুরূপ কিরান হজকারীও পূর্বে সা‘ঈ করে থাকলে এখন আর সা‘ঈ করতে হবে না। তবে তামাত্তু হজকারীকে অবশ্যই সা‘ঈ করতে হবে। কেননা তামাত্তু হজকারীর জন্য ইতোপূর্বে সা‘ঈ করে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৪. কোনো কোনো হাজী সাহেব হজের আগে ৭/৮ তারিখ মিনা যাবার সময় নফল তাওয়াফ করে কিংবা হজের ইহরাম বেঁধে নফল তাওয়াফ করে হজের অগ্রিম সা‘ঈ করে থাকেন। যদি কেউ সেটা

---

[583] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১১।

করে থাকেন, তবে তা আদায় হবে না। তার সে কাজ পণ্ডশ্রম হয়েছে। তাকে অবশ্যই তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারতের পর তা আদায় করতে হবে।[584]

ঋতুবতী মহিলার তাওয়াফে ইফাযা

ঋতুবতী মহিলা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ করবে না। তাওয়াফ ছাড়া হজের অন্য সব বিধান যেমন আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফায় রাত্রিযাপন, কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী ও দো‘আ-যিকর ইত্যাদি সবই করতে পারবে। কিন্তু স্রাব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ করতে পারবে না। স্রাব বন্ধ হলে তাওয়াফে যিয়ারত সেরে নিবেন। এ ক্ষেত্রে কোনো দম দিতে হবে না। আর যদি ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণে তাওয়াফে ইফাযার জন্য অপেক্ষা করতে না পারে এবং পরবর্তীতে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করে নেয়ারও কোনো সুযোগ না থাকে, তাহলে সে গোসল করে ন্যাপকিন বা এ জাতীয় কিছুর সাহায্য নিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করে তাওয়াফ করে

---

[584] তবে যদি কেউ ১০ তারিখে তাওয়াফ করার পূর্বে সাঈ করে নেয় তবে তা সুন্নাতের বিপরীত হলেও আদায় হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, سعيت قبل أن أطوف আমি তাওয়াফ করার পূর্বে সাঈ করে ফেলেছি‘’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, ‘করো, সমস্যা নেই’ [আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৭২৩ [তবে হাদীসের ভাষ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, লোকটি ১০ যিলহজ তারিখে অগ্রিম সাঈ করেছিলেন। এর পূর্বে তিনি তা করেন নি। তাই ১০ তারিখের পূর্বে তামাত্তু হাজীর জন্য হজের অগ্রিম সা‘ঈ করার কোনো সুযোগ নেই।

ফেলবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের আদেশ করেন না।[585] তাছাড়া মাসিক স্রাব বন্ধ করার জন্য শারীরিক ক্ষতি না হয় এমন ওষুধ ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

তাওয়াফে ইফাযার ক্ষেত্রে কিছু দিক-নির্দেশনা

১) তাওয়াফে ইফাযার সর্বপ্রথম জায়েয সময় হচ্ছে, কুরবানীর দিন মধ্যরাত থেকে। অথবা (কঙ্কর নিক্ষেপের প্রথম ওয়াক্ত সংক্রান্ত আলেমদের ভিন্ন মতের ভিত্তিতে) ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে।

২) তাওয়াফে ইফাযার জন্য সর্বোত্তম সময় হলো কুরবানীর দিন কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার পর।

৩) এ তাওয়াফ রাত পর্যন্ত বিলম্বিত হলেও কোনো সমস্যা নেই। তবে উত্তম হলো, তাওয়াফে ইফাযা বিলম্বিত না করা। ওযর ছাড়া যিলহজের পর পর্যন্ত তাওয়াফে ইফাযা বিলম্বিত করা জায়েয হবে না।

৪) অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে, তাওয়াফে ইফাযা ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে করে নেওয়া উত্তম। তবে এরপরেও করা যেতে পারে এবং এর জন্য কোনো দম দিতে হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতও তা-ই। তাদের মতে

[585] ইবন তাইমিয়া রহ বলেন, এর জন্য সে মহিলার ওপর কোনো দম ওয়াজিব হবে না।

তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের সময়সীমা উন্মুক্ত এবং বারো তারিখের পরে আদায় করলেও কোনো দম দিতে হবে না।[586] পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে ১০ যিলহজ সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পর থেকে ১২ যিলহজের সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারত করা ওয়াজিব। এরপরেও তাওয়াফে যিয়ারত শুদ্ধ হবে এবং ফরয আদায় হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতের সপক্ষে শক্তিশালী কোনো দলীল নেই। সুতরাং ১২ তারিখের পরও তাওয়াফে যিয়ারত করতে কোনো বাধা নেই এবং তার জন্য কোনো দমও দিতে হবে না। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করা উত্তম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

৫) চারটি আমল তথা কঙ্কর নিক্ষেপ, হাদী যবেহ, মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট ও তাওয়াফে ইফাযা করলে যৌনমিলনও হাজীর সাহেবের জন্য হালাল হয়ে যাবে।

৬) হাজী সাহেবদের কেউ যদি বিদায় মুহূর্ত পর্যন্ত তাওয়াফে ইফাযা বিলম্বিত করে, তবে তাওয়াফে ইফাযার সাথে তার বিদায়ী তাওয়াফও আদায় হয়ে যাবে। তাকে আর বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না।

৭) উত্তম হলো তাওয়াফে যিয়ারত ও সা‘ঈ পরপর করা, দীর্ঘ বিরতি না দেয়া। আলেমগণ সাধারণত একদিন বা ১২ ঘন্টা পর্যন্ত সময়কে বিরতির সবের্বাচ্চ সীমা নির্ধারণ করে

---

[586] আল কাসানী : বাদায়িউসসানায়ে‘ : (২/৩১৪)।

থাকেন।

চারটি আমলে ধারাবাহিকতা রক্ষার বিধান

নবীজীর বিদায় হজের আমল অনুসারে ১০ যিলহজের ধারাবাহিক আমল হলো, প্রথমে কঙ্কর নিক্ষেপ করা, অতঃপর হাদীর পশু যবেহ করা, এরপর মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা। এরপর তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করা ও সা'ঈ করা। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে এ দিনের এই চারটি আমলের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করা তথা আগে-পিছে করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের পরিপন্থি কাজ। তবে যদি কেউ ওযর বা অপারগতার কারণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারে অথবা ভুলবশত আগে-পরে করে বসে, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করার সময় সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ এরূপ আগে-পিছে করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُولُ: لاَ حَرَجَ ، لاَ حَرَجَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، قَالَ: لاَ حَرَجَ قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ: لاَ حَرَجَ».

'মিনায় (কুরবানীর দিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, 'সমস্যা নেই, সমস্যা নেই'প্ল এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি।' তিনি বললেন, 'কোনো সমস্যা নেই।' এক

লোক বলল, ‘আমি সন্ধ্যার পর কঙ্কর মেরেছি।’ তিনি বললেন, ‘সমস্যা নেই’।[587]

‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ১০ যিলহজ রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। তিনি তখন জামরার কাছে দাঁড়ানো ছিলেন। লোকটি বলল,

«يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. فَقَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ ، قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ إِلاَّ قَالَ: افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ».

“হে আল্লাহর রাসূল, আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেন, নিক্ষেপ করো সমস্যা নেই। অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ করেছি। তিনি বললেন, নিক্ষেপ কর সমস্যা নেই। আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে তাওয়াফে ইফাযা করেছি। তিনি বললেন, নিক্ষেপ কর, সমস্যা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে প্রশ্নই করা হয়েছে তার উত্তরেই তিনি বলেছেন, কর, সমস্যা নেই।”[588]

এ বিষয়ে আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। ওযর কিংবা

---

[587] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০৫০।

[588] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩০৬।

অপরাগতার কারণে সেসবের আলোকে আমল করলে ইনশাআল্লাহ হজের কোনো ক্ষতি হবে না। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে হাজীদের প্রচণ্ড ভিড় আর হাদী যবেহ প্রক্রিয়াও অনেক জটিল। তাই বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সহজভাবে দেখেছেন আমাদেরও সেভাবে দেখা উচিৎ। বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রখ্যাত দুই ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ১০ যিলহজের কাজসমূহে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারলেও দম ওয়াজিব হবে না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব বাদায়েউস্ সানায়েতে লিখা হয়েছে,

فَإِنْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ مِنْ غَيْرِ إِحْصَارٍ فَعَلَيْهِ لِحَلْقِهِ قَبْلَ الذَّبْحِ دَمٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

“যদি যবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে তবে এর জন্য দম দিতে হবে আবূ হানীফা রহ.-এর মতানুযায়ী। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মাদ ও একদল শরী‘আত বিশেষজ্ঞের মতানুযায়ী, এর জন্য তার ওপর কিছুই ওয়াজিব নয়।”[589]

ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার প্রক্রিয়া

প্রাথমিক হালাল হয়ে যাওয়া:

তামাত্তু ও কিরান হজকারী কঙ্কর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা ও হাদী যবেহ করার মাধ্যমে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবে। উমার

---

[589] বাদায়েউস সানায়ে‘ : (২/১৫৮)।

ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«اذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَل لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ»

“যখন তোমরা জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং যবেহ ও হলক করবে, তখন তোমাদের জন্য সব কিছু হালাল হয়ে যাবে।”[590]

আর ইফরাদ হজকারী মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবে।

প্রাথমিক হালাল হওয়ার পর স্ত্রীর সাথে মিলন, যৌন আচরণ ছাড়া ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ সব কিছু বৈধ হয়ে যাবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ الا النِّسَاءَ».

“স্ত্রীগণ ছাড়া তার জন্য সব কিছু বৈধ হয়ে যাবে।”[591]

ইমাম আবূ হানীফা রহ. সহ অনেকেই উপরোক্ত মতটি গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম মালেক রহ. বলেন, কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমেই প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উক্তি তার মতের পক্ষে দলীল। তিনি বলেন,

«إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ».

“যখন তোমরা জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, তখন তোমাদের জন্য

---

[590] বাইহাকী : (৫/১৩৫); ইবন খুযাইমাহ, হাদীস নং ২৯৩৯; দারাকুতনী, হাদীস নং ২৬৮৭, ২৬৮৮; মুসনাদে শাফে‘ঈ, হাদীস নং ১০২৩।

[591] সহীহ আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৭৮; নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৮৪।

স্ত্রীগণ ছাড়া সব কিছু হালাল হয়ে যাবে।”[592]

শাফে‘ঈদের মতে, কঙ্কর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে হাম্বলীদের মতে, কঙ্কর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা ও বায়তুল্লাহ’র ফরয- তাওয়াফ এই তিনটি আমলের মধ্য থেকে যেকোন দু’টি করার মাধ্যমে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবে।

চূড়ান্ত হালাল হয়ে যাওয়া:

কঙ্কর নিক্ষেপ, পশু যবেহ, মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা, বায়তুল্লাহ’র ফরয তাওয়াফ ও সাঈ- এসব আমল সম্পন্ন করলে হাজী সাহেব পুরোপুরি হালাল হয়ে যাবে। তখন স্ত্রীর সাথে যৌন-মিলনও তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

« إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حل لَهُ كل شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاء حَتى يَطُوفَ البَيتَ»

“আর যখন সে (হাজী) বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, তার জন্য সব কিছু হালাল হয়ে যাবে। তবে বায়তুল্লাহ’র যিয়ারত না করা পর্যন্ত স্ত্রীগণ হালাল হবে না।”[593]

এ থেকে বোঝা যায়, চূড়ান্ত হালাল তখনই হবে, যখন বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ বা তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করবে।

---

[592] ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৩০৪১।

[593] মুসান্নাফে ইবন আবি শাইবাহ, হাদীস নং ১৩৮০৮।

১০ যিলহজের আরো কিছু আমল

১. যিকর ও তাকবীর

১০ যিলহজ কুরবানীর দিন। এ দিনটি মূলত আইয়ামে তাশরীকের অন্তর্ভুক্ত। আইয়ামে তাশরীক হলো, যিলহজের ১০, ১১, ১২ এবং (যিনি বিলম্ব করেছেন তার জন্য) ১৩ তারিখ। তাশরীকের এই দিনগুলোতে হাজী সাহেবদের করণীয় হলো, বেশি বেশি আল্লাহ্‌র যিকির করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٠٣﴾ [البقرة: ٢٠٣]

"আর আল্লাহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে। অতঃপর যে তাড়াহুড়া করে দু'দিনে চলে আসবে, তার কোনো পাপ নেই। আর যে বিলম্ব করবে, তারও কোনো অপরাধ নেই। (এ বিধান) তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদেরকে তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩]

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ দ্বারা উদ্দেশ্য আইয়ামে তাশরীক।

নুবাইশা আল-হুযালী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ... وَذِكْرٍ لِلَّهِ»

“আইয়ামের তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার...ও আল্লাহ তা‘আলার যিকিরের দিন।”[594]

২. ওয়াজ-নসীহত

এদিন হজের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ মানুষদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য খুতবা প্রদান করবেন। আবূ বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের উপর বসা ছিলেন আর এক ব্যক্তি তার লাগাম ধরে ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى. قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِى الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ».

“এটি কোন দিন? আমরা এই ভেবে চুপ করে রইলাম যে, হয়তো তিনি এদিনের পূর্বের নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, অবশ্যই। তিনি আবার বললেন, এটি কোন মাস? আমরা এই ভেবে চুপ রইলাম যে, হয়তো তিনি এর পূর্বের নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[594] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৪১।

বললেন, এটা কি যিলহজ মাস নয়? আমরা বললাম, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্মান তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই শহরের মতোই হারাম তথা পবিত্র ও সম্মানিত। উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে এ কথা পৌঁছে দেয়। কারণ, উপস্থিত ব্যক্তি হয়তো এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিবে যে তার চেয়ে অধিক হিফাযতকারী হবে।”[595]

তাছাড়া মানুষকে সঠিক পথের দিশা দান করা এবং শিক্ষা প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলেম ও দা‘ঈদের জন্য অপরিহার্য হলো, যথাযথভাবে তাদের এ দায়িত্ব পালন করা।

মিনায় রাত যাপনের বিধান

১. ১০ যিলহজ দিবাগত রাত ও ১১ যিলহজ দিবাগত রাত মিনায় যাপন করতে হবে। ১২ যিলহজ যদি মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্য ডুবে যায় তাহলে ১২ যিলহজ দিবাগত রাতও মিনায় যাপন করতে হবে। ১৩ যিলহজ কঙ্কর মেরে তারপর মিনা ত্যাগ করতে হবে।

---

[595] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭।

২. আর হাজী সাহেবদেরকে যেহেতু তাশরীকের রাতগুলো মিনায় যাপন করতে হয়। তাই যেসব হাজী সাহেব তাওয়াফে ইফাযা ও সাঈ করার জন্য মক্কায় চলে গেছেন, তাদেরকে অবশ্যই তাওয়াফ-সাঈ শেষ করে মিনায় ফিরে আসতে হবে।

৩. মনে রাখা দরকার যে, মিনায় রাত্রিযাপন গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। এমনকি সঠিক মতে এটি ওয়াজিব। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের সালাত মসজিদুল হারামে আদায় ও তাওয়াফে যিয়ারত শেষ করে মিনায় ফিরে এসেছেন এবং তাশরীকের রাতগুলো মিনায় কাটিয়েছেন।”[596]

৪. হাজীদের যমযমের পানি পান করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপনের অনুমতি দিয়েছেন এবং উটের দায়িত্বশীলদেরকে মিনার বাইরে রাতযাপনের অনুমতি দিয়েছেন। এই অনুমতি প্রদান থেকে প্রতীয়মান হয়, মিনার রাতগুলো মিনায় যাপন করা ওয়াজিব।

৫. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ ، وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مِنًى».

---

[596] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৬৮৩।

“উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আকাবার ওপারে (মিনার বাইরে) রাত্রিযাপন করা থেকে নিষেধ করতেন এবং তিনি মানুষদেরকে মিনায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দিতেন।”[597] মিনায় কেউ রাত্রিযাপন না করলে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে শাস্তি দিতেন বলেও এক বর্ণনায় এসেছে।[598]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ لَيْلاً بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ».

“তোমাদের কেউ যেন আইয়ামে তাশরীকে মিনার কোনো রাত আকাবার ওপারে যাপন না করে।”[599]

এলাউসসুনান গ্রন্থে উল্লেখ আছে:

وَدَلاَلَةُ الأَثْرِ عَلَى لُزُوْمِ الْمَبِيْتِ بِمِنَى فِي لَيَالِيْهَا ظَاهِرَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ظَاهِرَ لَفْظِ الْهِدَايَةِ يُشْعِرُ بِوُجُوْبِهَا عِنْدَنَا

“মিনায় রাত্রিযাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে হাদীসের ভাষ্য স্পষ্ট। আর এটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিদায়া[600]র প্রকাশ্য বর্ণনা মিনায় রাত্রিযাপন আমাদের মতে ওয়াজিব বলে অভিহিত করে।”[601]

সুতরাং হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো, আইয়ামে তাশরীকে

---

[597] ইবন আবী শায়বা, হাদীস নং ১৪৩৬৮।

[598] ই‘লাউসসুনান : (৭/৩১৯৫)।

[599] ইবন আবী শায়বা, হাদীস নং ১৪৩৬৭।

[600] হানাফী মাযহাবের একখানি বিখ্যাত ফিক্হ গ্রন্থের নাম।

[601] এ এ‘লাউসসুনান : (৭/৩১৯৫)। (تَرْكُ الْمُقَامِ بِهَا مَكْرُوْهٌ تَحْرِيْمًا)

মিনার বাইরে অবস্থান করা মাকরূহে তাহরীমী।[602]

মোটকথা বিশুদ্ধ মতে, হাজী সাহেবদের জন্য মিনায় রাত্রিযাপন করা ওয়াজিব। তাই উক্ত দিনগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মিনায় অবস্থায় করুন। হাজী সাহেবগণ যদি কোনো রাতই মিনায় যাপন না করেন, তাহলে আলেমদের মতে, তার ওপর দম দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি কিছু রাত মিনায় থাকেন এবং কিছু রাত অন্যত্র, তাহলে গুনাহগার হবেন। এক্ষেত্রে কিছু সদকা করতে হবে। পারতপক্ষে দিনের বেলায়ও মিনাতেই থাকুন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোও মিনায় কাটিয়েছেন।

---

[602] প্রাগুক্ত

৬. বলাবাহুল্য, মিনায় রাত্রিযাপনের অর্থ মিনার এলাকাতে রাত কাটানো। রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্য এ নয় যে, শুধু ঘুমিয়ে বা শুয়ে থাকতে হবে। সুতরাং যদি বসে সালাত আদায় করে, দো'আ যিকির কিংবা কথাবার্তা বলে তাহলেও রাত্রিযাপন হয়ে যাবে। রাতের বেশির ভাগ কিংবা অর্ধরাত অবস্থানের মাধ্যমে রাত্রিযাপন হয়ে যাবে।

এ হুকুম তাদের জন্য যাদের পক্ষে মিনায় অবস্থান করা সহজ এবং যারা তাঁবু পেয়েছে। পক্ষান্তরে যারা মিনায় তাঁবু পান নি বরং তাদের তাঁবু মুযদালিফার সীমায় পড়ে গেছে, তাদের তাঁবু যদি মিনার তাঁবুর সাথে লাগানো থাকে, তবে তারা তাদের তাঁবুতে অবস্থান করলেই মিনায় রাত্রিযাপন হয়ে যাবে।

রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে যেসব ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে

১. অহেতুক আলাপচারিতার মাধ্যমে সময় নষ্ট করা। কখনো এ আলাপচারিতা গীবত, শ্রুতিকটুতা এমনকি অশ্লীলতা পর্যন্ত গড়ায়। অথচ মিনার দিনগুলো কেবল আল্লাহ তা'আলার যিকিরের দিন।

২. যাদের পক্ষে মিনাতে তাবু স্থাপন করার সুযোগ হয় নি, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মিনার কোনো রাস্তায় বসে পড়েন। আবার মধ্যরাত হলেই তারা নিজেদের ঠিকানাতে ফিরে আসেন। কখনো কখনো তাদের এধরনের কাজ তার নিজের জন্য অথবা তার পরিবার ও সন্তানের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এধরনের কাজ শর'ঈ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা এর ফলে নিজের কষ্ট হয় আবার অপরদেরকেও কষ্ট দেওয়া হয়।

৩. কোনো কোনো হাজী সাহেব তাওয়াফে ইফাযার জন্য মক্কায় গিয়ে আর রাতে ফিরে আসার চেষ্টা করেন না। নিঃসন্দেহে এটি নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ।

৪. কোনো কোনো হাজী সাহেব তাওয়াফ ও সা'ঈ শেষ করার পর মিনা অভিমুখে রওয়ানা হন; কিন্তু রাতে অত্যধিক গাড়ির চাপের কারণে যথাসময়ে মিনা আসতে সক্ষম হন না। এমতাবস্থায় তাদের করণীয় হলো, মক্কা থেকে মিনায় গাড়িতে আসার চেষ্টা বাদ দিয়ে পায়ে চলা পথে আসা। আর যদি দুর্বলতা হেতু অথবা সঙ্গী-সাথীদের সমস্যার কারণে তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে রাত্রি যাপনের নিয়ত যেন থাকে। তারপরও যদি আসতে সক্ষম না হন, তবে 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না'।

১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ: আইয়ামুত-তাশরীক

আইয়ামুত-তাশরীকের ফযীলত

ক. এ দিনগুলো ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ রাববুল আলামীনের যিকির ও তাঁর শুকরিয়া আদায়ের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

"আর আল্লাহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

الأَيَّامِ الْمَعْدُوْدَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ.

'নির্দিষ্ট দিনসমূহ' বলতে আইয়ামুত-তাশরীক বুঝানো হয়েছে।'[603] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَيَّامُ التَّشْرِيْقُ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ».

"আইয়ামুত-তাশরীক হলো, খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহ রাববুল আলামীনের যিকিরের দিন।"[604]

ইমাম ইবন রজব রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, আইয়ামুত-তাশরীক এমন কতগুলো দিন যাতে ঈমানদারদের দেহ-মনের নি'আমত তথা স্বতঃস্ফূর্ততা একত্র করা হয়েছে। কারণ, খাওয়া-দাওয়া দেহের খোরাক আর আল্লাহর যিকির ও শুকরিয়া মনের খোরাক। আর এভাবেই এ দিনসমূহে নি'আমতের পূর্ণতা লাভ করে।

খ. আইয়ামুত-তাশরীক তথা তাশরীকের দিনগুলো ঈদের দিন হিসেবে গণ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» عِيْدُنَا أَهْلُ الإِسْلاَمِ».

"আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও মিনার দিনগুলো (কুরবানী পরবর্তী তিন দিন) আমাদের তথা ইসলাম অনুসারিদের ঈদের দিন।"[605]

---

[603] সহীহ বুখারী, ঈদ অধ্যায়।

[604] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৪১।

[605] আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৪১৯।

এ দিনসমূহ যিলহজ মাসের প্রথম দশকের সাথে যুক্ত, যা খুবই ফযীলতপূর্ণ। তাই এ কারণেও এর যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। তাছাড়া দিনগুলোতে হজের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আমল সম্পাদিত হয়। এ কারণেও এ দিনগুলো ফযীলতের অধিকারী।

আইয়ামুত-তাশরীক বা তাশরীকের দিনগুলোতে করণীয়

এ দিনসমূহ যেমন ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকারের দিন তেমনি আনন্দ-ফূর্তি করার দিন। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আইয়ামুত-তাশরীক হলো খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহর যিকিরের দিন।' এ দিনসমূহে আল্লাহ রাববুল আলামীনের দেওয়া নি'আমত নিয়ে আমোদ-ফূর্তি করার মাধ্যমে তার শুকরিয়া ও যিকির আদায় করা উচিৎ৷ আর যিকির আদায়ের কয়েকটি পদ্ধতি হাদীসে উল্লেখ হয়েছে:

(১) সালাতের পর তাকবীর পাঠ করা এবং সালাত ছাড়াও সর্বদা তাকবীর পাঠ করা। আর এ তাকবীর আদায়ের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ দেই যে, এ দিনগুলো আল্লাহর যিকিরের দিন। আর এ যিকিরের নির্দেশ যেমন হাজী সাহেবদের জন্য, তেমনি যারা হজ পালনরত নন তাদের জন্যও।

(২) কুরবানী ও হজের পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ তা'আলার নাম ও তাকবীর উচ্চারণ করা।

(৩) খাওয়া-দাওয়ার শুরু ও শেষে আল্লাহ তা'আলার যিকির করা। আর এটা তো সর্বদা করার নির্দেশ রয়েছেই তথাপি এ দিনগুলোতে এর গুরুত্ব বেশি দেয়া। এমনিভাবে হজ সংশ্লিষ্ট সকল

কাজ এবং সকাল-সন্ধ্যার যিকিরগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া।

(৪) হজ পালন অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহ তা‘আলার তাকবীর পাঠ করা।

(৫) এগুলো ছাড়াও যেকোনো সময় এবং যেকোনো অবস্থায় আল্লাহর যিকির করা।

১১ যিলহজের আমল

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাজী সাহেবদের ১০ যিলহজ দিবাগত রাত অর্থাৎ ১১ যিলহজের রাত মিনাতেই যাপন করতে হবে। এটি যেহেতু আইয়ামুত-তাশরীকের রাত তাই সবার উচিৎ এ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করা এবং পরদিন ১১ তারিখের আমলের জন্য প্রস্তুত থাকা। ১১ তারিখের আমলসমূহ নিম্নরূপ:

১. যদি ১০ তারিখের কোনো আমল অবশিষ্ট থাকে, তাহলে এ দিনে তা সম্পন্ন করে নিতে চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ ১০ তারিখের আমলের মধ্যে হাদী যবেহ, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা অথবা তাওয়াফে ইফাযা বা যিয়ারত সম্পাদন যদি সেদিন কারো পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে, তবে তিনি আজ তা সম্পন্ন করতে পারেন।

২. এ দিনের সুনির্দিষ্ট কাজ হলো, কঙ্কর নিক্ষেপ করা। এ দিন তিনটি জামরাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করুন:

   গত ১০ তারিখে জামরাতুল ‘আকাবাতে নিক্ষেপ করা কঙ্করগুলোর ন্যায় মিনায় অবস্থিত তাঁবু অথবা রাস্তা কিংবা অন্য যেকোনো স্থান থেকে এ কঙ্করগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। আর যারা পূর্বেই কঙ্কর সংগ্রহ করে এনেছেন তাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট।

৩. প্রত্যেক জামরাতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। সবগুলোর সমষ্টি দাঁড়াবে একুশটি কঙ্কর। তবে আরো দু’চারটি

বাড়তি কঙ্কর সাথে নিবেন। যাতে কোনো কঙ্কর লক্ষভ্রষ্ট হয়ে নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে পড়ে গেলে তা কাজে লাগানো যায়।

৪. মিনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছোট জামরা থেকে শুরু করবেন এবং মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট বড় জামরা দিয়ে শেষ করবেন।

৫. কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হলো সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে। এদিন সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। কারণ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে:

«رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন সূর্য পূর্ণভাবে আলোকিত হওয়ার পর জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। আর পরের দিনগুলোতে (নিক্ষেপ করেছেন) সূর্য হেলে যাওয়া পর।”[606]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের প্রতি দয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন এবং তারপর নিক্ষেপ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«كُنَّا نَتَحَيَّنُ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا».

“আমরা অপেক্ষা করতাম। অতঃপর যখন সূর্য হেলে যেতো,

[606] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৯।

তখন আমরা কঙ্কর নিক্ষেপ করতাম।”[607] তাছাড়া ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন,

«لاَ تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ».

“তিনদিন কঙ্কর মারা যাবে না সূর্য না হেলা পর্যন্ত।”[608]

সুতরাং সূর্য হেলে যাওয়ার পরে কঙ্কর নিক্ষেপ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল। আর এটা অনস্বীকার্য যে, তাদের অনুসরণই আমাদের জন্য হিদায়াতের কারণ। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘কেউ যদি সুন্নাতের অনুসরণে ইচ্ছুক হয়, তাহলে সে যেন মৃতদের সুন্নাত অনুসরণ করে। কেননা জীবিতরা ফেৎনা থেকে নিরাপদ নয়’।[609]

তাছাড়া সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েয হওয়ার পক্ষে সমকালীন কোনো কোনো আলেম যে মত দিয়েছেন, সেটা ১২ যিলহজের ব্যাপারে; ১১ যিলহজ নয়। তদুপরি সেটি কোনো গ্রহণযোগ্য মতও নয়।

৬. প্রথমেই আসতে হবে জামরায়ে ছুগরা বা ছোট জামরায়। মিনার মসজিদে খাইফ থেকে এটিই সবচেয়ে কাছে। সেখানে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে এক এক করে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন।

---

[607] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৪৬।

[608] মুআত্তা মালিক, হাদীস নং ২১৭।

[609] বাইহাকী : (১০/১১৬); ইবন আবদুল বার, জামেউ বায়ানিল ইলম : (২/৯৭)।

প্রতিবার নিক্ষেপের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলবেল। যে দিক থেকেই নিক্ষেপ করুন সমস্যা নেইপ্ল এ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়ে গেলে, নিক্ষেপস্থল থেকে দ্বিতীয় জামরার দিকে সামান্য অগ্রসর হবেন এবং একপাশে দাঁড়িয়ে উভয় হাত তুলে দো‘আ করবেন। এ সময় কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘ দো‘আ করা মুস্তাহাব।

৭. এরপর দ্বিতীয় জামরা অভিমুখে রওয়ানা করবেন এবং পূর্বের ন্যায় সেখানেও ‘আল্লাহু আকবার’ বলে এক এক করে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলবেল। যেকোনো দিক থেকেই নিক্ষেপ করলে তা আদায় হয়ে যাবে। এ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা শেষ হলে নিক্ষেপস্থল থেকে সামান্য সরে আসবেন এবং হাত তুলে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘ দো‘আ করবেন।

৮. এরপর তৃতীয় জামরাতে আসবেন। এটি বড় জামরা, যা মক্কা থেকে অধিক নিকটবর্তী। সেখানেও প্রতিবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলে এক এক করে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। নিক্ষেপ করা হয়ে গেলে সেখান থেকে সরে আসবেন, কিন্তু দো‘আর জন্য দাঁড়াবেন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে দাঁড়ান নি।[610]

---

[610] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করতেন, তখন তিনি সোজা চলে যেতেন, সেখানে তিনি দাঁড়াতেন না। (ইবন মাজাহ্‌, হাদীস নং ৩০৩৩)।

৯. হাজী সাহেব পুরুষ হোন বা মহিলা- নিজেই নিজের কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন, এটাই ওয়াজিব। তবে যদি নিজের পক্ষে কষ্টকর হয়ে যায়, যেমন অসুস্থ বা দুর্বল মহিলা অথবা বৃদ্ধা বা শিশু ইত্যাদি, তবে সেক্ষেত্রে দিনের শেষ অথবা রাত পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে। তাও সম্ভব না হলে অন্য কোনো হাজীকে তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন, যিনি তার হয়ে নিক্ষেপ করবেন।

১০. কোন হাজী সাহেব যখন অন্যের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হবেন, তখন প্রতিনিধি হাজী প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন, তারপর তার মক্কেলের পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করবেন।[611]

১১. এ দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ করার সর্বশেষ সময় সম্পর্কে প্রমাণ্য কোনো বর্ণনা নেই। তবে উত্তম হলো সূর্যাস্তের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। যদি রাতে নিক্ষেপ করে তাহলেও কোনো অসুবিধা

---

[611] নিজের করণীয় বিষয় প্রথমে করার বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার এক হাদীসে পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবন আব্বারাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, লোকটি বলছিল, লাব্বাইক আন শুবরুমা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, শুবরুমা কে? লোকটি বলল, আমার ভাই অথবা সে বলছিল, আমার নিকটাত্মীয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নিজের হজ করেছো? লোকটি বলল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (প্রথমে) নিজের হজ কর। তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ করো। (আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮১১)।

নেই। কারণ, বিভিন্ন বর্ণনায় সাহাবায়ে কেরাম থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২. এ দিনের অন্যান্য আমলের মধ্যে একটি আমল হলো, মিনায় রাত্রিযাপন করা। যেমনটি ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. ইমাম বা ইমামের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করবেন। এ খুতবায় তিনি দীনের বিষয়সমূহ তুলে ধরবেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। বনূ বকর গোত্রের দুই ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তারা বলেন,

«رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى».

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে খুতবা প্রদান করতে দেখেছি, তখন আমরা ছিলাম তার সাওয়ারীর কাছে। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা যা তিনি মিনায় প্রদান করেছিলেন।"[612]

১৪. এও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ দিনটি আইয়ামে তাশরীকের অন্যতম। আর আইয়ামে তাশরীক হলো আল্লাহর যিকির করার দিন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ স্থানটি হচ্ছে

---

[612] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৯৫২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২৯৭৩।

মিনা। আর মিনা হারাম শরীফেই একটা অংশ। তাই হাজীদের কর্তব্য স্থান, কাল ও অবস্থার মর্যাদা অনুধাবন করে তদনুযায়ী চলা ও আমল করা। সময়টাকে আল্লাহ তা'আলার যিকির, তাকবীর বা অন্য কোনো নেক আমলের মাধ্যমে কাজে লাগানো এবং সব রকমের অন্যায়, অপরাধ, ঝগড়া, অনর্থক ও অহেতুক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা।

১২ যিলহজের আমল

১২ যিলহজের আমল পুরোপুরি ১১ যিলহজের আমলের মতোই। এ দিনে হাজী সাহেবগণ সাধারণত ‘মুতা‘আজ্জেল’ তথা দ্রুতপ্রস্থানকারী এবং ‘মুতা’আখখের’ তথা ধীরপ্রস্থানকারী- এ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যান। যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٣﴾ [البقرة: ٢٠٣]

“অতঃপর যে তাড়াহুড়া করে দু’দিনে চলে আসবে। তার কোনো পাপ নেই। আর যে বিলম্ব করবে, তারও কোনো অপরাধ নেই। (এ বিধান) তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদেরকে তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩]

এখানে ‘যে তাড়াহুড়া করে’ বলে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের হজ সমাপ্ত করার জন্য এদিনই মিনা থেকে বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ‘যে বিলম্ব করবে’ বলে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা এদিন (মিনা ছেড়ে) যান না; বরং মিনাতেই অবস্থান করেন এবং পরদিন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর পাথর নিক্ষেপ শেষ করে তারপর মিনা ছেড়ে যান। ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করাই উত্তম। কারণ,

ক. আল্লাহ্ তা‘আলা শুধু তাকওয়ার ভিত্তিতেই তাড়াতাড়ি করার অনুমতি দিয়েছেন। যেমনটি উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আর তাকওয়ার ব্যাপারটি মানুষের কর্মকান্ডে প্রকাশ পায়। অনেকেই হজের কাজ থেকে বিরক্ত হয়ে শেষ দিন কঙ্কর নিক্ষেপ ত্যাগ করে থাকেন। আবার অনেকে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনায় মিনা ত্যাগ করে চলে যান। এটি সম্পূর্ণরূপে তাকওয়ার পরিপন্থি। কাজেই হাজী সাহেবের মোটেও এমন করা উচিৎ নয়।

খ. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুবহু অনুসরণের মধ্যেই যাবতীয় কল্যাণ নিহিত।

মুতা‘আজ্জেল হাজী সাহেবদের করণীয়

এদিন হাজীদের প্রধান কাজ হচ্ছে, জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ। তাদেরকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পাথর মারার কাজটি সম্পন্ন করতে হবে:

- এগার তারিখের ন্যায় প্রথমে মসজিদুল খাইফ এর নিকটস্থ ছোট জামরায় পাথর মারতে হবে। পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবেপ্ম কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে কিছুটা সরে এসে কিবলামুখী হয়ে দো‘আ করতে হবে।
- তারপর মধ্যম জামরায় পাথর মারতে হবে। পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর

নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে বাম দিকে সরে এসে কিবলামুখী হয়ে দো‘আ করতে হবে।

- তারপর বড় জামরা তথা জামরাতুল-আকাবায় পাথর মারতে হবে। পূর্ববর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। এখানে কোনো দো‘আ নেই।

- মুতা‘আজ্জেল হাজীদের জন্য এদিন মিনা থেকে সূর্যাস্তের পূর্বেই বের হয়ে যাওয়া অপরিহার্য। সূর্য অস্ত গেলে আর বের হবেন না। সেক্ষেত্রে মুতা’আখখের হাজীদের বিধান তার জন্য প্রযোজ্য হবে। সুতরাং তারা রাত্রিযাপন করবেন এবং পরের দিন কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। কারণ, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنْ الْغَدِ».

“আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝির দিকে (১২ তারিখ) যে ব্যক্তি মিনায় থাকতে সূর্য ডুবে যায়, সে যেন পরদিন কঙ্কর নিক্ষেপ না করে (মিনা থেকে) প্রস্থান না করে।”[613]

- যদি দ্রুতপ্রস্থানকারী হাজীগণ বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং চেষ্টা করেছেন তারপরও কোনো কারণে বের হতে পারেননি বা পথিমধ্যে সূর্য অস্ত গিয়েছে। তবে তারা অধিকাংশ আলেমের মতে মুতা‘আজ্জেল থাকবেন এবং বের হয়ে যেতে

[613] মুআত্তা মালিক : (১/৪০৭), হাদীস নং ২১৪।

পারবেন। অনুরূপভাবে মুতা‘আজ্জেল হাজীগণ যদি মিনায় তাদের কোনো সামগ্রী রেখে আসেন এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা থেকে বের হয়ে যান, তাহলে তারাও ফিরে গিয়ে তা নিয়ে আসতে পারবেন। এ জন্য আর পরদিন থাকতে হবে না।

- এ কাজের মধ্য দিয়েই মুতা‘আজ্জেল হাজীগণ হজের কার্যাদি সমাপ্ত করবেন। অবশিষ্ট থাকল বিদায়ী তাওয়াফ। তার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

মুতা‘আখখের হাজী সাহেবদের জন্য ১৩ যিলহজের করণীয়

- ‘মুতা’আখখের’ হাজীগণ যখন ১২ তারিখ দিবাগত বা ১৩ তারিখের রাত মিনায় যাপন করবেন, তখন পরের দিন তাদেরকে তিন জামরাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে।
- সে রাত্রি তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকিরে কাটাতে হবে। কারণ এটিই মিনায় অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য।
- ১৩ তারিখ হাজীদের প্রধান কাজ হচ্ছে, সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা। তাদেরকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পাথর মারার কাজটি সম্পন্ন করতে হবে:
- ১২ তারিখের ন্যায় প্রথমে মসজিদুল খাইফ-এর নিকটস্থ ছোট জামরায় পাথর মারতে হবে। পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে একটু সরে এসে কিবলামুখী হয়ে দো‘আ করতে হবে।

- তারপর মধ্য জামরায় পাথর মারতে হবে। পূর্ববর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে একটু সরে এসে কিবলামুখী হয়ে দো‘আ করতে হবে।

- তারপর বড় জামরা তথা জামরাতুল-আকাবায় পাথর মারতে হবে। পূর্ববর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। এখানে কোনো দো‘আ নেই।

  এ কাজের মধ্য দিয়েই মুতাআখখের হাজী সাহেবগণ হজের কার্যাদি সমাপ্ত করবেন। বাকি থাকল বিদায়ী তাওয়াফ। তাও সেসব হাজী সাহেবের জন্য যারা মক্কার অধিবাসী নন। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

১১, ১২ বা ১৩ তারিখে পাথর মারা সংক্রান্ত কিছু ভুল-ত্রুটি

- অনেক হাজী সাহেব সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বেই ১১, ১২ বা ১৩ তারিখ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে থাকেন। এটা অবশ্যই ভুল। এতে করে তার কঙ্কর নিক্ষেপ হয় না। তাকে অবশ্যই সেটা সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর নিক্ষেপ করতে হবে। কারণ, সময়ের আগে কোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়।

- কোনো কোনো হজ কাফেলার নেতাদেরকে দেখা যায় যে, তারা ১১ তারিখ মধ্য রাতের পর হাজী সাহেবদেরকে নিয়ে মিনা ত্যাগ করে চলে যান। রাতের বাকি অংশ মক্কায় যাপন করে পরদিন যোহরের পর মক্কা থেকে এসে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন তারপর

আবার মক্কায় চলে যান। এমন করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের পরিপন্থি। বিশেষ অসুবিধায় না পড়লে এরূপ করা উচিৎ নয়। আর মিনায় রাত ও দিন উভয়টাই যাপন করা উচিৎ। কেননা মিনায় রাত্রিযাপন যদি ওয়াজিবের পর্যায়ে পড়ে থাকে তাহলে দিন যাপন করা অবশ্যই সুন্নাত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন ও রাত উভয়টাই মিনায় যাপন করেছেন।

- অনেক মুতা'আজ্জেল তথা দ্রুতপ্রস্থানকারী হাজী সাহেব পরের দিনের কঙ্করগুলো এদিনের কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে মেরে থাকেন। এটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, এটিও সময়ের পূর্বে করা হচ্ছে, যা সহীহ নয়। তাই তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

- অনেকে ১২ তারিখ কঙ্কর নিক্ষেপের পর মিনা ছেড়ে দ্রুতপ্রস্থান করেন; কিন্তু তিনি মক্কায় রাত্রি যাপন করে পরদিন ১৩ তারিখ আবার মিনায় পাথর মারতে আসেন। এটা ঠিক নয়। এ কাজের কোনো মূল্য নেই।

বিদায়ী তাওয়াফ

মুতা‘আজ্জেল বা দ্রুতপ্রস্থানকারী হাজীগণ ১২ যিলহজ এবং মুতাআখখের বা ধীরপ্রস্থানকারী হাজীগণ ১৩ যিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ সম্পন্ন করবেন। তখনই তাদের হজের কার্যাদি শেষ হয়ে যাবে। তবে যদি তারা মক্কার অধিবাসী না হয়ে থাকেন, তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ করা ছাড়া তাদের জন্য মক্কা থেকে বের হওয়া জায়েয হবে না। কারণ বাইরের লোকদের জন্য হজের বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব।

বিদায়ী তাওয়াফের পদ্ধতি

বিদায়ী তাওয়াফ অন্য তাওয়াফের মতই। তবে এ তাওয়াফ সাধারণ পোশাক পরেই করা হয়। তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করতে হয়। এর সাতটি চক্করে কোনো রমল নেই; ইযতিবাও নেই। তাওয়াফ শেষ করার পর দু’রাকাত তাওয়াফের সালাত আদায় করতে হবে। মাকামে ইবরাহীমের সামনে সম্ভব না হলে হারামের যেকোনো জায়গায় আদায় করবেন। এ তাওয়াফের পর কোনো সা‘ঈ নেই।

বিদায়ী তাওয়াফ সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

- এ তাওয়াফটি হারাম শরীফকে বিদায় দেওয়ার জন্য বিদায়ী সালামের মতো।সুতরাং বাইতুল্লাহ’র সাথে সংশ্লিষ্ট তার সর্বশেষ দায়িত্ব হবে এই তাওয়াফ সম্পন্ন করা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».

“তোমাদের কেউ যেন তার সর্বশেষ কাজ বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ না করে মক্কা ত্যাগ না করে।”[614]

তেমনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ».

“লোকদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, বাইতুল্লাহ’র সাথে তাদের সর্বশেষ কাজ যেন হয় তাওয়াফ করা। তবে মাসিক স্রাবগ্রস্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা শিথিল করা হয়েছে।”[615]

- কিন্তু মাসিক স্রাবগ্রস্ত মহিলা যারা তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করে ফেলেছেন, তাদের জন্য সম্ভব হলে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন এবং পবিত্রতা অর্জন শেষে বিদায়ী তাওয়াফ করবেন। এটাই উত্তম। অন্যথায় তাদের থেকে এই তাওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। কারণ, বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার হায়েয এসে যাওয়ায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি তাওয়াফে ইফাযা করেছে? তারা বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাহলে সে এখন যেতে পারবে।’[616]

---

[614] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩২৭।

[615] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩২৮।

[616] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১১।

- হাজী সাহেবদের সর্বশেষ আমল হবে এই তাওয়াফ। এটি ওয়াজিব। এরপর আর দীর্ঘ সময় মক্কায় অবস্থান করা যাবে না। করলে পুনরায় বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। তবে যদি সামান্য সময় অবস্থান করে, যেমন কোনো সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা, খাদ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য অপেক্ষা কিংবা উপহার সামগ্রীর জন্য অপেক্ষা। এ জাতীয় কোনো বিষয় হলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এমনিভাবে হাজী সাহেব যদি কোনো কারণে পূর্বে হজের তাওয়াফের সা'ঈ না করে থাকেন, তাহলে তিনি বিদায়ী তাওয়াফের পরে সা'ঈ করবেন। এতে কোনো অসুবিধা হবে না। কেননা এটা সামান্য সময় বলে বিবেচিত।

হজের পরিসমাপ্তি

হাজী সাহেব হজের কার্যাদি সম্পন্ন করার পর অধিক পরিমাণে যিকির ও ইস্তিগফার করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٩ فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَٰسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَآءَكُمۡ أَوۡ أَشَدَّ ذِكۡرٗاۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖ ٢٠٠ وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٢٠٢ ﴾ [البقرة: ١٩٩، ٢٠٢]

“অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তারপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ। আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। বস্তুত আখিরাতে তার জন্য কোনো অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। তারা যা অর্জন করেছে তার হিস্যা তাদের রয়েছে। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৯-২০২]

স্বদেশে ফেরার সময় সফরের আদবসমূহ এবং দো‘আ আমলে নিবেন। সফরসঙ্গী ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সদয় ও উন্নত আচরণ

করবেন। যদি তাদের রীতি এমন হয়ে থাকে যে, সেখানে হাদিয়া নিয়ে যেতে হয়, তাহলে তাদের মনোতুষ্টির জন্য হাদিয়া নিয়ে যাবেন।

হাজী সাহেবদের জন্য মদীনা শরীফ যিয়ারত করা অপরিহার্য নয়। মদীনার যিয়ারত বরং একটি স্বতন্ত্র সুন্নাতপ্মহজের সঙ্গে এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। হজের আলোচনার সাথে এর আলোচনা হয়ে থাকে, কেননা অনেক মানুষ অনেক দূর-দুরান্ত থেকে আসেন। আলাদা আলাদাভাবে দুজায়গা সফরের লক্ষ্যে দুবার আসা কষ্টকর বিধায় এক সঙ্গেই তারা দুজায়গায় সফর করেন।

হাজী সাহেবদের জন্য সমীচীন হলো, দৃঢ় ঈমান, নতুন প্রত্যয়-উপলব্ধি এবং অনেক বেশি আনুগত্য, ইবাদত ও উন্নত চরিত্র নিয়ে ফিরে আসা। কারণ, হজের মধ্য দিয়ে যেন তার নব জন্ম ঘটে। (হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, আমাদের তাওবা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।)

সপ্তম অধ্যায়: মদীনা সফর

- **মদীনার যিয়ারত**

মদীনার যিয়ারত

পবিত্র মক্কার ন্যায় মদীনাও পবিত্র ও সম্মানিত শহর, ওহী নাযিল হওয়ার স্থান। কুরআনুল কারীমের অর্ধেক নাযিল হয়েছে মদীনায়। মদীনা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, ঈমানের আশ্রয়স্থল, মুহাজির ও আনসারদের মিলনভূমি। মুসলিমদের প্রথম রাজধানী। এখান থেকেই আল্লাহর পথে জিহাদের পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল, আর এখান থেকেই হিদায়াতের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেছে, ফলে আলোকিত হয়েছে সারা বিশ্ব। এখান থেকে সত্যের পতাকাবাহী মুমিনগণ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ডেকেছেন। নবীজীর শেষ দশ বছরের জীবন যাপন, তাঁর মৃত্যু ও কাফন-দাফন এ ভূমিতেই হয়েছে। এ ভূমিতেই তিনি শায়িত আছেন। এখান থেকেই তিনি পুনরুত্থিত হবেন। নবীদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কবরই সুনির্ধারিত রয়েছে। তাই মদীনার যিয়ারত আমাদেরকে ইসলামের সোনালী ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে সাহায্য করে। সুদৃঢ় করে আমাদের ঈমান-আকীদার ভিত্তি।

হজের সাথে মদীনা যিয়ারতের যদিও কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। কিন্তু হজের সফরে যেহেতু মদীনায় যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়, সেহেতু যারা বহির্বিশ্ব থেকে হজ করতে আসে তাদের জন্য বিশেষভাবে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করাটাই শ্রেয়।

মদীনা যিয়ারতের সুন্নাত তরীকা

মদীনা যিয়ারতের সুন্নাত তরীকা হলো, মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়ত করে আপনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। কেননা আবূ

হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى».

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানের দিকে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মসজিদ (মসজিদে নববী) ও মসজিদে আকসা।"[617] এ হাদীসের আলোকে ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন,

وَأَمَّا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ بِالسَّفَرِ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ دُونَ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِهِ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلاَفٌ، فَالَّذِي عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ.

"সফরকারীর সফরের উদ্দেশ্য যদি শুধু নবীর কবর যিয়ারত হয়, তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করা না হয়, তাহলে এই মাসআলায় মতবিরোধ রয়েছে। যে কথার ওপর ইমামগণ এবং অধিকাংশ শরী'আত বিশেষজ্ঞ একমত পোষণ করেছেন তা হলো, এটা শরী'আতসম্মত নয়।"[618]

ইবন তাইমিয়া রহ. আরো বলেন, 'জেনে রাখো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর যিয়ারত বহু ইবাদত থেকে মর্যাদাপূর্ণ, অনেক নফল কর্ম থেকে উত্তম। কিন্তু সফরকারীর জন্য শ্রেয় হচ্ছে, সে মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়ত করবে। অতঃপর সে নবী

---

[617] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৭।

[618] ইবন তাইমিয়া, আল-ফাতাওয়াল কুবরা : (৫/১৪৯)।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করবে এবং তাঁর ওপর সালাত ও সালাম পেশ করবে।’[619]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْصُدُوْنَ مَوَاضِعَ مُعَظَّمَةً بِزَعْمِهِمْ يَزُوْرُوْنَهَا، وَيَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا، وَفِيْهِ مِنَ التَّحْرِيْفِ وَالْفَسَادِ مَا لاَ يَخْفَى، فَسَدَّ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَسَادَ لِئَلاَّ يَلْتَحِقُ غَيْرُ الشَّعَائِرِ بِالشَّعَائِرِ، وَلِئَلاَّ يَصِيْرَ ذَرِيْعَةً لِعِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ، وَالْحَقُّ عِنْدِيْ أَنَّ الْقَبْرَ وَمَحَلُّ عِبَادَةِ وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ وَالطُّوْرَ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي النَّهْيِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

‘জাহেলী যুগের মানুষেরা তাদের ধারণামত মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহকে উদ্দেশ্য করে তা যিয়ারত করত এবং তার মাধ্যমে (তাদের ধারণামত) বরকত লাভ করত। এতে রয়েছে সত্যচ্যুতি, বিকৃতি ও ফাসাদ যা কারো অজানা নয়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফাসাদ চিরতরে বন্ধ করে দেন, যাতে শা‘আয়ের[620] নয় এমন বিষয়গুলো শা‘আয়ের-এর অন্তর্ভুক্ত না হয় এবং যাতে এটা গায়রুল্লাহর ইবাদতের মাধ্যম না হয়। আমার মতে সঠিক কথা হচ্ছে,

---

[619] আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ওয়া আউলিয়ায়িশ শয়তান : ১/৩০৭।

[620] শা শা‘আয়ের বলতে বুঝায়, আল্লাহর নিদর্শন এবং তাঁর ইবাদতের স্থানসমূহ। (কুরতুবী : ২/৩৭)।

কবর ও আল্লাহর যে কোনো ওলীর ইবাদতের স্থান, তূর পাহাড় ইত্যাদি সবকিছু উপরোক্ত হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।[621]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لَهُ بِنِيَّةٍ زِيَارَةِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ، ثُمَّ إِذَا بَلَغَ الْمَدِيْنَةَ يُسْتَحَبُّ لَهُ زِيَارَةُ قَبْرِهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا، لأَنَّهُ يَصِيْرُ حِيْنَئِذٍ مِنْ حَوَالَيِ الْبَلْدَةِ، وَزِيَارَةُ قُبُوْرِهَا مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَهُ.

‘হ্যাঁ, সফকারীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়তে সফর করা। আর এটা নৈকট্য লাভের অন্যতম বড় উপায়। অতঃপর সে যখন মদীনা পৌঁছবে, তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করাও মুস্তাহাব। কেননা তখন সে মদীনা নগরীতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তখন নগরীতে অবস্থিত কবরগুলো যিয়ারত করা অবস্থানকারীর ক্ষেত্রে মুস্তাহাব।’[622]

সুতরাং মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়তে মদীনা যিয়ারত করতে হবে। কবর যিয়ারতের নিয়তে মদীনা যিয়ারত হলে, তা সহীহ হবে না। মনে রাখবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর কেন্দ্রিক সকল উৎসব জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

---

[621] হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ : (১/৪০৮)।

[622] ফায়যুল বারী : (৪/৪৩)।

«وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا»

“আর আমার কবরকে তোমরা উৎসবের উপলক্ষ্য বানিও না।”[623] অর্থাৎ আমার কবর-কেন্দ্রিক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করো না।’ এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও শামিল।’[624]

মদীনার সীমানা

পবিত্র মক্কার ন্যায় এ বরকতময় মদীনা নগরীকেও হারাম অর্থাৎ সম্মানিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে মক্কা নগরীর পরে মদীনার স্থান। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

‘ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন এবং তিনি তাকে সম্মানিত করেছেন। আর আমি এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত মদীনাকে হারাম ঘোষণা করলাম।’[625]

হারামের সীমারেখা হচ্ছে, উত্তরে লম্বায় উহুদ পাহাড়ের পেছনে সাওর পাহাড় থেকে দক্ষিণে আইর পাহাড় পর্যন্ত। পূর্বে হার্রা ওয়াকিম অর্থাৎ কালো পাথর বিশিষ্ট এলাকা থেকে পশ্চিমে হার্রা আল-ওয়াবরা অর্থাৎ কালো পাথর বিশিষ্ট এলাকা পর্যন্ত।

---

[623] আবূ দাঊদ, হাদীস নং ২০৪২।

[624] আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ওয়া আউলিয়ায়িশ শয়তান : (১/৩০৭)।

[625] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭৪।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ»

“মদীনার ‘আইর’ থেকে ‘সাওর’-এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু হারাম।”[626]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا».

“আমি মদীনার দুই হাররা বা কালো পাথর বিশিষ্ট যমীনের মাঝখানের অংশটুকু হারাম তথা সম্মানিত বলে ঘোষণা দিচ্ছি। এর কোনো গাছ কাটা যাবে না বা কোনো শিকারী জন্তু হত্যা করা যাবে না।”[627]

সুতরাং মদীনাও নিরাপদ শহর। এখানে রক্তপাত বৈধ নয়। বৈধ নয় শিকার করা বা গাছ কাটা। এ শহর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন,

«لاَ يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلاَ يُحْمَلَ فِيهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ لِعَلْفٍ».

“এখানে রক্তপাত করা যাবে না। এখানে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে অস্ত্র বহন করা যাবে না। ঘাস সংগ্রহের জন্য ছাড়া কোনো গাছও কাটা যাবে না।”[628]

---

[626] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭০।

[627] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬৩।

[628] সহীহ মুসলিম (২/১০০১), হাদীস নং ১৩৭৪

মদীনার ফযীলত

মদীনাতুর রাসূলের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

১. মক্কার ন্যায় মদীনাও পবিত্র নগরী। মদীনাও নিরাপদ শহর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّم مَكَّةَ، وإِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ»

“নিশ্চয় ইবরাহীম মক্কাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন আর আমি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করলাম।”[629]

২. আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا وَإِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّى دَعَوْتُ فِى صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَىْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ».

“ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন এবং তার বাসিন্দাদের জন্য দো‘আ করেছেন। যেমনিভাবে ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন, আমিও তেমন মদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছি। আমি মদীনার সা’ ও মুদ-এ বরকতের দো‘আ

[629] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬২।

করেছি যেমন মক্কার বাসিন্দাদের জন্য ইবরাহীম দো‘আ করেছেন।”[630]

৩. মদীনা যাবতীয় অকল্যাণকর বস্তুকে দূর করে দেয়। জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا».

“মদীনা হলো হাপরের মতো, এটি তার যাবতীয় অকল্যাণ দূর করে দেয় এবং তার কল্যাণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে।”[631]

৪. শেষ যামানায় ঈমান মদীনায় এসে একত্রিত হবে এবং এখানেই তা ফিরে আসবে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إنَّ الإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إلى المَدِيْنَةِ كما تَأْرِزُ الحيَّةُ إلى جُحْرِها»

“নিশ্চয় ঈমান মদীনার দিকে ফিরে আসবে যেমনিভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।”[632]

---

[630] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬০। সা‘ ও মুদ দু’টি পরিমাপের পাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে দো‘আ করেছেন যেন তাতে বরকত হয় এবং তা দিয়ে যেসব বস্তু ওযন করা হয়- সেসব বস্তুতেও বরকত হয়।

[631] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৮৩।

[632] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৭। হাদীসের অর্থ হলো : ঈমান মদীনা অভিমুখী হবে এবং মদীনাতে অবশিষ্ট থাকবে। আর

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার জন্য বরকতের দো‘আ করেছেন। আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ».

“হে আল্লাহ, আপনি মক্কায় যে বরকত দিয়েছেন মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান করুন।”[633]

 আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَللَّهمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا».

“হে আল্লাহ, তুমি আমাদের ফল-ফলাদিতে বরকত দাও। আমাদের এ মদীনায় বরকত দাও। আমাদের সা’তে বরকত দাও এবং আমাদের মুদ-এ বরকত দাও।”[634]

 আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

মুসলিমগণ মদীনার উদ্দেশ্যে বের হবে এবং মদীনামুখী হবে। তাদেরকে তাদের ঈমান ও এ বরকতময় যমীনের প্রতি ভালোবাসা এ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।

[632] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬৯।

[633] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬৯।

[634] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭৩।

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا وَإِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّى دَعَوْتُ فِى صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَىْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ».

"ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন এবং তার বাসিন্দাদের জন্য দো'আ করেছেন। মক্কাকে ইবরাহীম যেমন হারাম ঘোষণা দিয়েছেন আমিও তেমন মদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছি। আমি মদীনার সা' তে এবং মুদ-এ বরকতের দো'আ করছি যেমন মক্কার বাসিন্দাদের জন্য ইবরাহীম দো'আ করেছেন।"[635]

৬. মদীনায় মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ».

"মদীনার প্রবেশ দ্বারসমূহে ফিরিশতারা প্রহরায় নিযুক্ত আছেন, এতে মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।"[636]

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় মৃত্যু বরণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

«مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّيْ أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوْتُ بِهَا».

"যার পক্ষে মদীনায় মারা যাওয়া সম্ভব সে যেন সেখানে মারা যায়। কেননা মদীনায় যে মারা যাবে আমি তার পক্ষে সুপারিশ করব।"[637]

---

[635] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬০।

[636] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭৯।

৮. নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাকে হারাম ঘোষণার প্রাক্কালে এর মধ্যে কোনো বিদ‘আত বা অন্যায় ঘটনা ঘটানোর ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করেছেন। আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثاً أَو آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقبَلُ اللّهُ مِنهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً».

“মদীনা ‘আইর’ থেকে ‘সাওর’ পর্যন্ত হারাম। যে ব্যক্তি মদীনায় কোনো অন্যায় কাজ করবে অথবা কোনো অন্যায়কারীকে আশ্রয় প্রদান করবে তার ওপর আল্লাহ, ফিরিশতা এবং সমস্ত মানুষের লা‘নত পড়বে। তার কাছ থেকে আল্লাহ কোনো ফরয ও নফল কিছুই কবুল করবেন না।”[638]

মদীনায় অনেক স্মৃতি বিজড়িত ও ঐতিহাসিক স্থানের যিয়ারত করতে হাদীসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলো হলো: মসজিদে নববী, মসজিদে কুবা, বাকী‘র কবরস্থান, উহুদের শহীদদের কবরস্থান ইত্যাদি। নিচে সংক্ষিপ্তভাবে এসব স্থানের ফযীলত ও যিয়ারতের আদব উল্লেখ করা হলোপ্ম

---

[637] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৯১৭।

[638] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭০।

মসজিদে নববীর ফযীলত

মসজিদে নববীর রয়েছে ব্যাপক মর্যাদা ও অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে একাধিক ঘোষণা এসেছে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ ١٠٨﴾ [التوبة: ١٠٨]

"অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশি হকদার যে, তুমি সেখানে সালাত কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আল্লামা সামহুদী বলেন, 'কুবা ও মদীনা- উভয় স্থানের মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত আয়াতে তাই উভয় মসজিদের কথা বলা হয়েছে।'[639]

মসজিদে নববীর আরেকটি ফযীলত হলো, এতে এক সালাত পড়লে এক হাজার সালাত পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে এক ওয়াক্ত সালাত পড়া অন্য মসজিদে ছয় মাস সালাত পড়ার সমতুল্য। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[639] শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, তারীখুল মাদীনাতিল মুনাওয়ারা : পৃ. ৭৫।

«صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

"আমার এ মসজিদে এক সালাত আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম।"[640]

আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَلصَّلاَةُ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ وَالصَّلاَةُ فِيْ مَسْجِدِيْ بِأَلْفِ صَلاَةٍ وَالصَّلاَةُ فِيْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ».

"মসজিদে হারামে এক সালাত এক লাখ সালাতের সমান, আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) এক সালাত এক হাজার সালাতের সমান এবং বাইতুল মাকদাসে এক সালাত পাঁচশ সালাতের সমান।"[641]

মসজিদে নববীর ফযীলত সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى».

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথায়ও (সাওয়াব আশায়) সফর করা জায়েয নেই: মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ ও মসজিদুল আকসা।"[642]

---

[640] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৪। (ইবারত মুসলিমের)

[641] মাজমাউয যাওয়াইদ : ৫৮৭৩।

আবূ হুরাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ».

"যে আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ শেখার জন্য কিংবা শেখানোর জন্য আসবে, তার মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য। পক্ষান্তরে যে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা দেখতে আসবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্যের মাল-সামগ্রীর প্রতি তাকায়।"[643]

আবূ উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْيعلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ».

"যে ব্যক্তি একমাত্র কোনো কল্যাণ শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে (নববীতে) আসবে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজের সাওয়াব লেখা হবে।"[644]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর (সাইয়েদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ঘর) ও তাঁর মিম্বরের মাঝখানের জায়গাটুকুকে

---

[642] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৭।

[643] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৭।

[644] মাজমাউয যাওয়াইদ : (১/১২৩), হাদীস নং ৪৯৯।

জান্নাতের অন্যতম উদ্যান বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا بَيْنَ بَيْتِيْ ومِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الْجَنَّةِ»

“আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝখানের অংশটুকু রওযাতুন মিন রিয়াদিল জান্নাত (জান্নাতের উদ্যানসমুহের একটি উদ্যান)।”[645]

রওযা শরীফ ও এর আশেপাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পূর্ব দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা শরীফ। তার পশ্চিম দিকের দেয়ালের মধ্যখানে তাঁর মিহরাব এবং পশ্চিমে মিম্বর। এখানে বেশ কিছু পাথরের খুঁটি রয়েছে। যেসবের সাথে জড়িয়ে আছে হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও স্মৃতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এসব খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। এগুলো ছিল- ১. উসতুওয়ানা আয়েশা বা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার খুঁটি। ২. উসতুওয়ানাতুল-উফূদ বা প্রতিনিধি দলের খুঁটি। ৩. উসতুওয়ানাতুত্তাওবা বা তাওবার খুঁটি। ৪. উসতুওয়ানা মুখাল্লাকাহ বা সুগন্ধি জালানোর খুঁটি। ৫. উসতুওয়ানাতুস-সারীর বা খাটের সাথে লাগোয়া খুঁটি এবং উসতুওয়ানাতুল-হারছ বা মিহরাছ তথা পাহাদারদের খুঁটি।

মুসলিম শাসকগণের কাছে এই রওযা ছিল বরাবর খুব গুরুত্ব ও যত্নের বিষয়। উসমানী সুলতান সলীম রওযা শরীফের খুঁটিগুলোর

---

[645] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯০।

অর্ধেক পর্যন্ত লাল-সাদা মারবেল পাথর দিয়ে মুড়িয়ে দেন। অতঃপর আরেক উসমানী সুলতান আবদুল মাজীদ এর খুঁটিগুলোর সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করেন। ১৯৯৪ সালে সৌদি সরকার পূর্ববর্তী সকল বাদশাহ'র তুলনায় উৎকৃষ্ট পাথর দিয়ে এই রওযার খুঁটিগুলো ঢেকে দেন এবং রওযার মেঝেতে দামী কার্পেট বিছিয়ে দেন।

মসজিদে নববীতে প্রবেশের আদব

আবাসস্থল থেকে উযূ-গোসল সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ধীরে-সুস্থে মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে গমন করবেন। আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশ করবেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করবেন। নিচের দো'আ পড়তে পড়তে ডান পা দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবেন:

«بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

(বিসমিল্লাহি ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফ-তাহলী আবওয়াবা রহমাতিকা)।

"আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।"[646] এ দো'আও পড়তে পারেন,

«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

[646] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৭৭১।

(আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া ওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কাদীমি মিনাশ শায়তানির রাজীম।)

“আমি মহান আল্লাহর, তাঁর সম্মানিত চেহারার এবং তাঁর চিরন্তন কর্তৃত্বের মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[647]

অতঃপর যদি কোনো ফরয সালাতের জামা‘আত দাঁড়িয়ে যায় তবে সরাসরি জামা‘আতে অংশ নিন। নয়তো বসার আগেই দু’রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বেন। আবূ কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ».

“তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন দু’রাকাত সালাত পড়ে তবেই বসে।”[648]

আর সম্ভব হলে ফযীলত অর্জনের উদ্দেশ্যে রাওযার সীমানার মধ্যে এই সালাত পড়বেন। কারণ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا بَيْنَ بَيْتِيْ ومِنْبَرِيْ رَوضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ»

“আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝখানের অংশটুকু রওযাতুন মিন রিয়াদিল জান্নাত (জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান)।”[649] আর সম্ভব না হলে মসজিদে নববীর যেখানে সম্ভব সেভাবেই পড়বেন।

---

[647] আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৬৬।

[648] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১৪।

[649] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯০।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মসজিদের এ অংশকে অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক গুণে গুণান্বিত করা দ্বারা এ অংশের আলাদা ফযীলত ও বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করছে। আর সে শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত অর্জিত হবে কাউকে কষ্ট না দিয়ে সেখানে নফল সালাত আদায় করা, আল্লাহর যিকির করা, কুরআন পাঠ করা দ্বারা। ফরয সালাত প্রথম কাতারগুলোতে পড়া উত্তম; কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا».

“পুরুষদের সবচেয়ে উত্তম কাতার হলো প্রথমটি, আর সবচেয়ে খারাপ কাতার হলো শেষটি।”[650] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَولِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إلا أَن يَّسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ».

“মানুষ যদি আযান ও প্রথম কাতারের ফযীলত জানত, তারপর লটারি করা ছাড়া তা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে অবশ্যই তারা তার জন্য লটারি করত।”[651]

সুতরাং এর দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, মসজিদে নববীতে নফল সালাতের উত্তম জায়গা হলো রাওযাতুম মিন রিয়াযুল জান্নাত। আর ফরয

[650] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪০।

[651] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩৭।

নামাজের জন্য উত্তম জায়গা হলো প্রথম কাতার তারপর তার নিকটস্থ কাতার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের কবর যিয়ারত

তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা ফরয সালাত পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের কবরে সালাম নিবেদন করতে যাবেন।

১. কবরের কাছে গিয়ে কবরের দিকে মুখ দিয়ে কিবলাকে পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে বলবেন,

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ أَفْضَلَ مَا جَزَى اللهُ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ.

(আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, সাল্লাল্লাহু ও সাল্লামা ওয়া বারাকা আলাইকা, ওয়া জাযাকা আফদালা মা জাযাল্লাহু নাবিয়্যান আন উম্মাতিহি।)

"হে আল্লাহর রাসূল, আপনার ওপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ। আল্লাহ আপনার ওপর সালাত, সালাম ও বরকত প্রদান করুন। আর আল্লাহ কোনো নবীর প্রতি তার উম্মতের পক্ষ থেকে যত প্রতিদান তথা সাওয়াব পৌঁছান, আপনার প্রতি তার থেকেও উত্তম প্রতিদান ও সাওয়াব প্রদান করুন।" আর যদি এ ধরনের অন্য কোনো উপযুক্ত দো‘আ পড়ে তবে তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

২. অতঃপর ডান দিকে এক হাত এগিয়ে আবূ বকর রা.-এর কবরের সামনে যাবেন। সেখানে পড়বেন,

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ, اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ فِي أُمَّتِهِ, رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمة محمد خيراً.

(আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর, আসসালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাসূলিল্লাহি ফী উম্মাতিহী, রাদিয়াল্লাহু ‘আনকা ওয়া জাযাকা ‘আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরা।)

৩. এরপর আরেকটু ডানে গিয়ে উমার রাসূলরাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কবরের সামনে দাঁড়াবেন। সেখানে বলবেন,

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ, اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ, رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحمد خيراً.

(আস্সালামু আলাইকা ইয়া উমার, আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন, রাদিয়াল্লাহু আনকা ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরা।)

তারপর এখান থেকে চলে আসবেন। দো‘আর জন্য কবরের সামনে, পেছনে, পূর্বে বা পশ্চিম- কোনো দিকেই দাঁড়াবেন না। ইমাম মালেক রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের সামনে শুধু সালাম জানানোর জন্য দাঁড়াবে, তারপর সেখান থেকে সরে আসবে। যেমনটি ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা করতেন। ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, শুধু নিজের দো‘আ চাওয়ার জন্য কবরের সামনে যাওয়া মাকরূহ।

ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, দো‘আ চাওয়ার জন্য কবরের কাছে যাওয়া এবং সেখানে অবস্থান করা মাকরূহ।[652]

কবর যিয়ারতের সময় নিচের আদবগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন:

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উঁচু মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখবেন। উচ্চস্বরে কিছু বলবেন না।
- ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে অন্যকে কষ্ট দিবেন না।
- কবরের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না।

---

[652] ইবন তাইমিয়া, মাজমূ‘ ফাতাওয়া : ২৪/৩৫৮।

কবর যিয়ারতে যেসব কাজ নিষিদ্ধ

কবরকে তাওয়াফ করা, কবর স্পর্শ করা বা চুমু দেওয়া:

যিয়ারতে কবর তাওয়াফ, স্পর্শ ও চুম্বন করবেন না। ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, 'অনুসরণীয় ইমাম ও পূর্বসুরী আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে সালাম পাঠকালে তাঁর কবরের পাথর চুম্বন বা স্পর্শ করা মুস্তাহাব নয়। যেন সৃষ্টজীবের ঘর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর) আর স্রষ্টার ঘর (কা'বা) সমপর্যায়ের না হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اللّٰهُمَّ لا تجعل قبري وثنا يعبد».

"হে আল্লাহ, আমার কবরকে এমন মূর্তির মতো বানিয়ো না, যার পূজা করা হয়।"[653] মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কবরের ক্ষেত্রে যখন এই বিধান, তাহলে অন্যদের কবর চুম্বন ও স্পর্শ না করাটা যে নিষিদ্ধ তা বলাই বাহুল্য।[654]

তিনি আরো বলেন, 'শরী'আতে শুধু কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা, রুকনে ইয়ামানীদ্বয় স্পর্শ করা এবং হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করার বিধান রয়েছে। পক্ষান্তরে মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা এবং অন্য কোনো মসজিদে এমন কিছু নেই, যাকে তাওয়াফ, স্পর্শ বা চুম্বন করা যাবে। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

---

[653] মুআত্তা মালেক, হাদীস নং ৮৫।

[654] ইবন তাইমিয়া, মজমূ' ফাতাওয়া : (২৬/৯৭)।

হুজরা শরীফ, বাইতুল মুকাদ্দাসের কোনো পাথর বা অন্য বস্তুর তাওয়াফ করা বৈধ নয়। যেমন, আরাফা ও তদ্রুপ স্থানের গম্বুজ। বরং ভূপৃষ্ঠে এমন কোনো স্থান নেই কা'বা শরীফের মতো যার তাওয়াফ করা হবে। আর যে এই আকীদা পোষণ করে যে, কা'বা শরীফ ছাড়া অন্য বস্তুর তাওয়াফ করা বৈধ, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে মন্দ যে কা'বা শরীফ ছাড়াও অন্য বস্তুর দিকে সালাত পড়াকে বৈধ মনে করে।' তিনি এও বলেন, 'যে হুজরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর বিদ্যমান ইবাদতের ক্ষেত্রে সেই হুজরার কোনো ধর্মীয় বিশেষত্ব নেই।'[655]

ইবন তাইমিয়া রহ. আরো বলেন, 'আর স্পর্শ করার ক্ষেত্রে বিধান হলো, যেকোন কবর স্পর্শ করা বা চুমো দেওয়া এবং তাতে গাল ঘষা সকল মুসলিমের ঐকমত্যে নিষিদ্ধ। যদিও তা নবীগণের কবর হয়। এই উম্মতের ইমামগণ এবং পূর্বসুরী আলেমদের কেউ এসব করেন নিপ্ম বরং এটা করা শির্ক।'[656] তাঁর মতে, 'তাঁর কবর এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে মানুষ সেখানে পৌঁছতে না পারে। সেখানে যিয়ারতকারীদের কবরে পৌঁছার জন্য কোনো রাস্তা রাখা হয় নিপ্মআর করবটি এমন বিশাল জায়গায় অবস্থিত নয় যে সকল যিয়ারতকারীর স্থান সংকুলান হতে পারে। আর জায়গাটিতে এমন কোনো জানালাও নেই যা দিয়ে কবর দেখা যায়। বরং মানুষকে কবরে পৌঁছা ও প্রত্যক্ষভাবে তা দেখা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। উপরোক্ত প্রত্যেকটি

---

[655] ইবন তাইমিয়া, মজমূ' ফাতাওয়া : (২৭/১০); ইবন তাইমিয়া, আল-জাওয়াবুল বাহির ফী যুওয়ারিল মাকাবির : ৮২।

[656] ইবন তাইমিয়া, মজমূ' ফাতাওয়া : (২৭/৯১); ইবন কুদামা, মুগনী : (৩/৫৫৯)।

কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরগৃহকে ঈদ ও মূর্তি হিসেবে গ্রহণ করা থেকে রক্ষা করা।'

তেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের দেয়াল স্পর্শ ও চুম্বন করাও বৈধ নয়। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, 'আমি এটাকে (কবর স্পর্শ বা চুম্বন) বৈধ বলে জানি না।' আছরাম রহ. বলেন, আমি মদীনার আলেমদের দেখেছি, তারা কবরের এক পাশে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করেন। আবূ আবদুল্লাহ বলেন, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এমনই করতেন। কবর স্পর্শ ও চুম্বন এ কারণে অবৈধ যে, যদি তা আল্লাহর ইবাদত বা রাসূলুল্লাহর সম্মানার্থে করা হয়, তাহলে তা হবে শির্ক। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'বা শরীফের রুকনে শামী ও পশ্চিমের রুকন স্পর্শ করলে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। যদিও এ ধরনের কাজ দুই রুকনে ইয়ামানীর ক্ষেত্রে করার বিধান রয়েছে। বস্তুত রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর কয়েকশ' বছর পর নির্মিত কোনো ঘরের দেয়ালে এভাবে চুম্বন বা স্পর্শ করার মাধ্যমে নবীজীর ভালোবাসা বা সম্মান প্রকাশ পায় না। বরং তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রকাশ পায় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে তাঁর অনুসরণ এবং তাঁর আনীত দীনে নতুন কিছু সংযোজন তথা বিদ'আত সৃষ্টি না করার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ ﴾ [ال عمران: ٣١]

“বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

আর যদি রাসূলুল্লাহর রওযার দেয়াল স্পর্শ বা চুম্বন ইবাদতের জন্য না হয়ে কেবল আবেগের বশে হয় কিংবা এমনি এমনি করা হয়, তাহলে তা হবে এমন ভ্রান্তি যাতে কোনো কল্যাণ নেই। তাছাড়া তা হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের আদর্শ ও শিক্ষা পরিপন্থী। তদ্রুপ এটি অজ্ঞ লোকদের জন্য হবে ক্ষতিকর ও প্রবঞ্চক যারা দেখলে এসবকে ইবাদত মনে করবে।

কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ দূর করার জন্য নবীজীর কাছে প্রার্থনা করা:

যিয়ারতকারী কোনো কল্যাণ লাভ বা অকল্যাণ দূর করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দো‘আ করবেন না। এটি শির্কের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠﴾ [غافر: ٦٠]

“আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” [সূরা, গাফির, আয়াত: ৬০]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ١٨﴾ [الجن: ١٨]

“আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।” [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ১৮]

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীকে এ ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নবী নিজেও নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক নন। আল্লাহ বলেন,

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ [الاعراف: ١٨٨]

“বল, ‘আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৮]

নবী যেহেতু নিজেই নিজের লাভ-ক্ষতির ক্ষমতা রাখেন না তাই অন্যের লাভ-ক্ষতির ক্ষমতা রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে উম্মতের মধ্যে এ ঘোষণাও দিতে বলেছেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١ ﴾ [الجن: ٢١]

“বল, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য না কোনো অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোনো কল্যাণ করার।” [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২১]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন

﴿ وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ٢١٤ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]

“আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ২১৪] আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর তিনি বললেন, ‘হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা, হে আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে

সাফিয়্যা (নবীজীর ফুফু) এবং হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, আমি আল্লাহর হুকুম থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার কোনো ক্ষমতা রাখি না। তোমরা আমার কাছে আমার সম্পদ থেকে যা চাওয়ার চাইতে পার।' (আমি তা দিতে পারব; কিন্তু আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে আমি তোমাদের যামিন হতে পারব না)।[657]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দো'আ-ইস্তিগফার করার জন্য আবেদন করা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কেউ আল্লাহর দরবারে নিজের জন্য দো'আ বা ইস্তিগফার করার আবেদন করবেন না। কারণ তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ সুযোগের সমাপ্তি ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ».

"তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়।"[658]

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا ٦٤﴾ [النساء: ٦٤]

---

657 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০৩।

658 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৮২।

“আর যদি তারা- যখন নিজদের প্রতি যুলুম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পেত।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৪]

এটি রাসূলের জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাছে ইস্তিগফারের আবেদন করার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা আয়াতে অতীতবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন; ভবিষ্যতবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করেন নিপ্ন আয়াতখানি সে সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবৎকালে ছিল। সুতরাং তা তাঁর পরবর্তী লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

নবীজী ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের কবর যিয়ারতের এই বিধান শুধু পুরুষদের জন্য। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে বিধান হলো, তাদের জন্য নবীজী বা অন্য যেকারো কবরই যিয়ারত না করা উত্তম। কারণ, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।”[659]

[659] তিরমিযী, হাদীস নং ৩২০।

মদীনায় যেসব জায়গা যিয়ারত করা সুন্নাত

১. বাকী‘র কবরস্থান

২. মসজিদে কুবা

৩. শুহাদায়ে উহুদের কবরস্থান

বাকী‘র কবরস্থান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে বাকী‘ মদীনাবাসীর প্রধান কবরস্থান। এটি মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। মদীনায় মৃত্যু বরণকারী হাজার হাজার ব্যক্তির কবর রয়েছে এখানে। এদের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় অধিবাসী এবং বাইরে থেকে আগত যিয়ারতকারীগণ। এখানে প্রায় দশ হাজার সাহাবীর কবর রয়েছে। যাদের মধ্যে রয়েছেন (খাদীজা ও মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ছাড়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রী, কন্যা ফাতেমা, পুত্র ইবরাহীম, চাচা আব্বাস, ফুফু সুফিয়্যা, নাতী হাসান ইবন আলী এবং জামাতা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছাড়াও অনেক মহান ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বাকী‘র কবরস্থান যিয়ারত করতেন। সেখানে তিনি বলতেন,

«السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ»

(আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন ওয়া আতাকুম মা তুআ‘দুনা গাদান মুআজ্জালুনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন, আল্লাহুম্মাগ ফির লিআহলি বাকী‘ইর গারকাদ।)

“তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুমিনদের ঘর, তোমাদেরকে যার ওয়াদা করা হয়েছিল তা তোমাদের কাছে এসেছে। আর আগামীকাল (কিয়ামত) পর্যন্ত তোমাদের সময় বর্ধিত করা হল। ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে আমরা মিলিত হব। হে আল্লাহ, বাকী‘ গারকাদের অধিবাসীদের ক্ষমা করুন।”[660]

তাছাড়া কোনো কোনো হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা বাকী‘উল গারকাদে যাদের দাফন করা হয়েছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার কাছে জিবরীল এসেছিলেন ...তিনি বললেন,

«إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»

“আপনার রব আপনাকে বাকী‘র কবরস্থানে যেতে এবং তাদের জন্য দো‘আ করতে বলেছেন।” আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কীভাবে তাদের জন্য দো‘আ করবো? তিনি বললেন, তুমি বলবে,

«السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ».

---

[660] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৪; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩১৭২।

(আসসালামু আ'লা আহলিদ দিয়ারি মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীন মিন্না ওয়াল মুসতা'খিরীন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকূন।)

"মুমিন-মুসলিম বাসিন্দাদের ওপর সালাম। আল্লাহ আমাদের পূর্ব ও পরবর্তী সবার ওপর রহম করুন। ইনশাআল্লাহ আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব।"[661]

মসজিদে কুবা'

মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদ এটি। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কুবা[662] পল্লীতে আমর ইবন আউফ গোত্রের কুলছুম ইবন হিদমের গৃহে অবতরণ করেন। এখানে তাঁর উট বাঁধেন। তারপর এখানেই তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর নির্মাণকাজে তিনি সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। এ মসজিদে তিনি সালাত পড়তেন। এটিই প্রথম মসজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে তাঁর সাহাবীদের নিয়ে প্রকাশ্যে একসঙ্গে সালাত আদায় করেন। এ মসজিদের কিবলা প্রথমে বাইতুল মাকদিসের দিকে ছিল। পরে কিবলা পরিবর্তন হলে কা'বার দিকে এর কিবলা নির্ধারিত হয়।

---

[661] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৪; অনুরূপ নাসাঈ, হাদীস নং ২০৩৯।

[662] মদীনার অদূরে একটি গ্রামের নাম। বর্তমানে এটি মদীনার অংশ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ মসজিদে সালাত আদায় করতে চাইতেন। সপ্তাহে অন্তত একদিন তিনি এ মসজিদের যিয়ারতে গমন করতেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর অনুকরণে প্রতি শনিবার মসজিদে কুবার যিয়ারত করতেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি শনিবারে হেঁটে ও বাহনে চড়ে মসজিদে কুবায় যেতেন।'[663]

মসজিদে কুবার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عِدْلَ عُمْرَةٍ»

"যে ব্যক্তি (ঘর থেকে) বের হয়ে এই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে কুবায় আসবে। তারপর এখানে সালাত পড়বে। তা তার জন্য একটি উমরার সমতুল্য।"[664]

শুহাদায়ে উহুদের কবরস্থান

২য় হিজরীতে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবরস্থান যিয়ারত করা। তাদের জন্য দো'আ করা এবং তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করা। সপ্তাহের যে কোনো দিন যে কোনো সময় যিয়ারতে যাওয়া যায়। অনেকে জুমাবার বা বৃহস্পতিবার যাওয়া উত্তম মনে করেন, তা ঠিক নয়।

---

[663] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৯।

[664] নাসাঈ, হাদীস নং ৬৯৯; হাকেম, মুস্তাদরাক, হাদীস নং ৪২৭৯।

উল্লিখিত স্থানগুলোতে যাওয়ার কথা হাদীসে এসেছে বিধায় সেখানে যাওয়া সুন্নাতপ্ম এছাড়াও মদীনাতে আরো অনেক ঐতিহাসিক ও স্মৃতিবিজড়িত স্থান রয়েছে। ইবাদত মনে না করে সেসব পরিদর্শন করাতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন, মসজিদে কিবলাতাইন, মসজিদে ইজাবা, মসজিদে জুমা‘, মসজিদে বনী হারেছা, মসজিদে ফাৎহ, মসজিদে মীকাত, মসজিদে মুসাল্লা ও উহুদ পাহাড় ইত্যাদি। কিন্তু কোনো ক্রমেই সেগুলোকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না।

মসজিদে কিবলাতাইন

এটি একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। মদীনা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে খাযরাজ গোত্রের বানূ সালামা গোত্রে অবস্থিত। বনূ সালামা গোত্রের মহল্লায় অবস্থিত হওয়ার কারণে মসজিদে কিবলাতাইনকে মসজিদে বনী সালামাও বলা হয়। একই সালাত এই মসজিদে দুই কিবলা তথা বাইতুল মাকদিস ও কা‘বাঘরের দিকে পড়া হয়েছিল বলে একে মসজিদে কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ বলা হয়।

বারা’ ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে ষোল বা সতের মাস সালাত পড়েছেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে মনে কা‘বামুখী হয়ে সালাত পড়তে চাইতেন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন,

﴿ قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ ﴾ [البقرة: ١٤٤]

“আকাশের দিকে বার বার তোমার মুখ ফিরানো আমরা অবশ্যই দেখছি। অতএব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাব, যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৪] এ আয়াত নাযিল হবার সাথে সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা‘বার দিকে ফিরে যান।[665]

ইবন সা‘দ উল্লেখ করেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানূ সালামার উম্মে বিশর ইবন বারা’ ইবন মা‘রূর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাক্ষাতে যান। তার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। ইতোমধ্যেই যোহর সালাতের সময় ঘনিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে দুই রাকাত সালাত পড়েন। এরই মধ্যে কা‘বামুখী হওয়ার নির্দেশ আসে। সাথে সাথে (সালাতের অবশিষ্ট রাকাতের জন্য) তিনি কা‘বামুখী হয়ে যান। এ থেকেই মসজিদটির নাম হয়ে যায় মসজিদে কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ।’[666]

মদীনা মুনাওওয়ারা সংক্রান্ত কিছু বিদ‘আত

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের উদ্দেশ্যেই শুধু সফর করা।

---

[665] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯৯।

[666] ডইলিয়াস আবদুল গনী ., আল : রিয়্যাআছা-মাসাজিদ আল-পৃ।১৮৬ .

২. হজে গমনকারীদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো কিছু চেয়ে পাঠানো।

৩. মদীনায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা।

৪. মদীনায় প্রবেশের সময় কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয় নি এমন দো‘আ বানিয়ে বলা।

৫. মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে কোনো সালাত আদায়ের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতের জন্যে যাওয়া।

৬. কবরের সামনে সালাতে দাঁড়ানোর মত ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে হাত বেঁধে দাঁড়ানো।

৭ দো‘আ করার সময় কবরের দিকে ফিরে দো‘আ করা।

৮. কবরের দিকে ফিরে দো‘আ করলে কবুল হবে মনে করা।

৯. রাসূলের সত্ত্বা তাঁর সম্মানের উসীলা দিয়ে দো‘আ করা।

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশ চাওয়া।

১১. এটা মনে করা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবস্থা জানেন। এরূপ মনে করা সুস্পষ্ট শির্ক।

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের ছোট ছিদ্র পথে বরকত লাভের আশায় হাত ঢুকানো। এটাও শির্কপ্ন

১৩. বরকত লাভের আশায় কবর চুম্বন অথবা স্পর্শ করা এবং কবরের সাথে লাগোয়া কোনো কাঠ ছোয়া বা স্পর্শ করা।

১৪. কবর যিয়ারতের সময় ﴿وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ....﴾ [النساء: ٦٤] -(নিসা ৬৪ নং) আয়াত পড়া।

১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা।

১৬. কবরের কাছে বসে কুরআন পাঠ বা যিকির করা।

১৭. প্রতি সালাতের পরই কবর যিয়ারতের জন্য কবরের কাছে যাওয়া।

১৮. মসজিদে প্রবেশ করেই কবর যিয়ারত করার মানসিকতা।

১৯. মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার সময় এবং বের হওয়ার সময় কবরের দিকে মুখ করে থাকা।

২০. দূর থেকে কবরকে উদ্দেশ্য করে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করা।

২১. সালাতের পর পর আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা।

২২. মসজিদের প্রথম অংশ বাদ দিয়ে রওযাতে সালাত পড়া উত্তম মনে করা।

২৩. মদীনার মসজিদুর রাসূল এবং কুবা’ মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গমন করা।

২৪. প্রতিদিন বাকী‘ কবরস্থান যিয়ারত করা।

২৫. উহুদের শহীদদের কবরের কাছে গিয়ে তাদের কাছে কিছু চাওয়া। তাদের দিকে ফিরে দো‘আ করা।

২৬. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পেছন দিকে উল্টো হেঁটে বের হওয়া।

২৭. মদীনার মাটি বয়ে নিয়ে বেড়ানো।

অষ্টম অধ্যায়: হজ-উমরার আমলসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হজ-উমরার আমলসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ

বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ কা‘বাঘর নির্মাণের পর থেকেই শুরু হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذۡ بَوَّأۡنَا لِإِبۡرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلۡبَيۡتِ أَن لَّا تُشۡرِكۡ بِي شَيۡـٔٗا وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ٢٦﴾ [الحج: ٢٦]

“আর স্মরণ কর, যখন আমরা ইবরাহীমকে সে ঘরের (বাইতুল্লাহ’র) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, ‘আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকূ-সাজদাহ ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৬] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١٢٥﴾ [البقرة: ١٢٥]

“আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই‘তিকাফকারী ও রুকূ-সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৫] উভয় আয়াত থেকে বুঝা যায়, কা‘বা নির্মাণের পর থেকেই তাওয়াফ শুরু হয়েছে।

রমল ও ইযতিবা

রমলের অর্থ হচ্ছে, ঘনঘন পা ফেলে শরীর দুলিয়ে বীরদর্পে দ্রুত চলা। ইযতিবার অর্থ হচ্ছে, চাদর ডান বগলের নিচে রেখে ডান কাঁধ

উন্মুক্ত রাখা। রমল ও ইযতিবা শুরু হয় সপ্তম হিজরীতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ হিজরীতে মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করে হুদায়বিয়া থেকে উমরা না করেই মদীনায় ফিরে যান। হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী পরবর্তী বছর যিলকদ মাসে তিনি উমরা করার উদ্দেশ্যে আবার মক্কায় আসেন। এ বছর সাহাবীদের কেউ কেউ জ্বরাক্রান্ত হয়েছিলেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে এভাবে বলাবলি করতে লাগল,

إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

এমন এক সম্প্রদায় তোমাদের কাছে আসছে, ইয়াছরিবের [667] জ্বর যাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে।[668] একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে রমল অর্থাৎ ঘনঘন পা ফেলে শরীর দুলিয়ে বীরদর্পে দ্রুত চলার নির্দেশ দিলেন, যাতে মুশরিকরা বুঝে নেয় যে, মুমিন কখনো দুর্বল হয় না। একই উদ্দেশ্যে তিনি রমলের সাথে সাথে ইযতিবা অর্থাৎ চাদর ডান বগলের নিচে রেখে ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখারও নির্দেশ দিলেন। সেই থেকে রমল ও ইযতিবার বিধান চালু হয়েছে।

---

[667] মদীনার পূর্বের নাম।

[668] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬০২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৬৪।

যমযমের পানি ও সাফা মারওয়ার সাঈ

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হাজেরা[669] ও তার দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈলকে নিয়ে এলেন এবং বাইতুল্লাহ'র কাছে যমযমের ওপর একটি গাছের কাছে রাখলেন। মক্কায় সে সময় জনমানবের কোনো চিহ্ন ছিল না। তখন সেখানে কোনো পানি ছিল না। এক পাত্রে খেজুর ও একটি মশকে পানি রেখে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মা তার পিছু নিলেন। বললেন, এই জনমানবশূন্য তৃণ-লতাহীন মরুভূমিতে আমাদেরকে রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি একাধিকবার ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এ প্রশ্ন করলেন। ইবরাহীম তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। অতঃপর হাজেরা বললেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? ইবরাহীম আ. উত্তর করলেন: হ্যাঁ। তখন হাজেরা বললেন, 'তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না'৷হাজেরা ফিরে এলেন। আর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম চলতে চলতে সানিয়্যার নিকট গিয়ে থামলেন। তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না। তিনি কিবলামুখী হয়ে উভয় হাত তুলে নিম্নোক্ত দো'আ করলেন,

﴿رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ٣٧﴾ [ابراهيم: ٣٧]

---

[669] সঠিক উচ্চারণ হাজার।

“হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম। হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৭]

হাজেরা ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে দুধ পান করাতে লাগলেন এবং নিজে ঐ পানি পান করতে লাগলেন। পাত্রের পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি পিপাসার্ত হলেন। পিপাসার্ত হলো সন্তানও। সন্তানকে তিনি তেষ্টায় ছটফট করতে দেখে দূরে সরে গেলেন, যাতে এ অবস্থায় সন্তানকে দেখে কষ্ট পেতে না হয়। কাছে পেলেন সাফা পাহাড়। তিনি সাফায় আরোহণ করে উপত্যকার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন কোনো যাত্রীদল দেখা যায় কি-না, যাদের কাছে খাদ্য ও পানীয় থাকবে। কাউকে দেখতে না পেয়ে সাফা থেকে তিনি নেমে এলেন। উপত্যকায় পৌঁছলে তিনি তাঁর কামিজ টেনে ধরে পরিশ্রান্ত ব্যক্তির মতো দ্রুত চললেন। উপত্যকা অতিক্রম করলেন। অতঃপর মারওয়ায় আরোহণ করলেন। মারওয়ায় দাঁড়িয়েও তিনি তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কি-না। কাউকে দেখতে না পেয়ে নেমে এলেন মারওয়া থেকে। ছুটে গেলেন আবার সাফা পাহাড়ে। এভাবেই দু’পাহাড়ের মাঝে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا».

এটিই হলো সাফা-মারওয়ার মাঝে মানুষের সাঈ (করার কারণ)। তিনি মারওয়ার ওপর থাকাকালে একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে নিজকে লক্ষ্য করে বললেন, 'থামো!' তিনি আবারও আওয়াজটি শুনতে পেয়ে বললেন, শুনতে পেয়েছি; তবে তোমার কাছে কোনো ত্রাণ আছে কি-না তাই বলো। এরপর তিনি দেখলেন, যমযমের জায়গায় একজন ফিরিশতা তার পায়ের গোঁড়ালি বা পাখা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। এক পর্যায়ে সেখান থেকে পানি বের হল। তিনি হাউজের মতো করে বালির বাঁধ দিয়ে পানি আটকাতে লাগলেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ ، أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا».

"আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের ওপর রহম করুন। তিনি যমযমকে ছেড়ে দিলে, বর্ণনান্তরে-যমযমের পানি না উঠালে, যমযম একটি চলমান ঝরণায় পরিণত হত।"

ফিরিশতা হাজেরাকে বললেন,

«لَا تَخَافِي مِنَ الضَّيْعَةِ فَإِنَّ هَهُنَا بَيْتَ اللهِ يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ»

"তোমরা ধ্বংস হওয়ার ভয় করো না, কেননা এখানে হবে বাইতুল্লাহ, যা নির্মাণ করবে এই ছেলে ও এর পিতা। আর আল্লাহ তাঁর

পরিবারকে ধ্বংস করবেন না।”[670]

এ যমযমের পানি দিয়ে ইসরা ও মি‘রাজের রাতে রাসূল যমযমের পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুক ধোয়া হয়েছে। আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا».

“মক্কায় অবস্থানকালে একদিন আমার ঘরের ছাদ ফাঁক করা হলো। এরপর জিবরীল আলাইহিস সালাম নেমে আসলেন। তিনি আমার বুক বিদীর্ণ করে যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করলেন। এরপর তিনি হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ স্বর্ণের একটি প্লেট নিয়ে এসে আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। অতঃপর বক্ষ জোড়া লাগিয়ে আমার হাত ধরে নিকটবর্তী আসমানে আরোহণ করলেন।”[671]

আরাফায় অবস্থান

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরাফাতে অবস্থান করেছেন

ইবন মিরবা আনসারী আমাদের কাছে এসে বললেন, আমি আপনাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। তিনি বলেছেন,

[670] ঘটনাটি বিস্তারিত দেখুন: সহীহ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৪।

[671] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩৬।

«كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هذه فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ».

“তোমরা হজের মাশায়েরে (হজের বিধি-বিধান পালনের বিশেষ বিশেষ স্থান) অবস্থান কর। কেননা তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ঐতিহ্যের ওপর রয়েছ।”[672] এর অর্থ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরাফায় অবস্থান করেছিলেন, সে হিসেবে আমরাও করি।

হজ সম্পাদনকারী নবীগণ আলাইহিস সালাম আরাফায় অবস্থান করেছেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, উত্তম দো‘আ হচ্ছে আরাফার দিনের দো‘আ আর সেই বাক্য যা আমি ও আমার পূর্ববতী নবীগণ বলেছি,

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

“আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি সর্ব শক্তিমান।”[673] এ হাদীস থেকে বুঝা যায় আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমাস সালাম আরাফায় অবস্থান করে দো‘আ করেছেন।

মুযদালিফায় অবস্থান

ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা হজের যে পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন তাতে মুযদালিফায় অবস্থানও শিক্ষা দিয়েছিলেন।

---

[672] নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৪; তিরমিযী, হাদীস নং ৮৮৩।

[673] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৮৫।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন,

«قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ».

“তোমরা তোমাদের মাশায়ের (তথা আরাফা, মুযদালিফা ও মিনা)-এ অবস্থান করো। কারণ, তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের রেখে যাওয়া বিধানের উত্তরাধিকার।”[674] এ থেকে বুঝা যায়, আরাফা, মুযদালিফা ও মিনা- প্রতিটি স্থানেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম অবস্থান করেছিলেন।

মিনায় অবস্থান

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মিনায় অবস্থান করেছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়, সত্তরজন নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম মিনায় অবস্থিত মসজিদে খাইফে সালাত আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَقَدْ سَلَكَ فَجَّ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُجَّاجًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ وَلَقَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا».

“ফাজ্জ-রাওহা দিয়ে সত্তরজন নবী পশমী কাপড় পরে হজ করতে গিয়েছিলেন এবং মসজিদে খাইফে সত্তরজন নবী সালাত আদায় করেছিলেন।”[675]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[674] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯১৯।

[675] মুস্তাদরাক হাকেম, (২/৬৫৩), হাদীস নং ৪১৬৯।

বলেছেন,

«صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا مِنْهُمْ مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِيَّتَانِ وَهُوَ محرم على بعير من ابل شنوءة مَخْطُومٌ بِخِطَامِ لِيفٍ لَهُ ضِفْرَانِ».

"মসজিদে খাইফে সত্তরজন নবী সালাত আদায় করেছেন, মূসা আলাইহিস সালাম তাদের অন্যতম। আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে আছি। তার গায়ে দু'টি কুতওয়ানী চাদর জড়ানো। তিনি দুই গুচ্ছ সংস্বলিত লাগাম বিশিষ্ট উটের উপর ইহরাম বেঁধে বসে আছেন।"[676]

জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الأَرْضِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الشَّيْطَانَ تَرْجُمُونَ وَملةَ أَبِيكُمْ تَتَّبِعُونَ».

"ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম যখন হজের বিধি-বিধান আদায় করছিলেন। তখন জামরাতুল আকাবার কাছে তাঁর সামনে শয়তান উপস্থিত হল। তিনি শয়তানকে সাতটি পাথর মারলেন। ফলে সে মাটিতে ঢুকে গেল। এরপর সে আবার দ্বিতীয় জামরায় উপস্থিত

---

[676] মু'জামুল কাবীর : (১১/৪৫২), হাদীস নং ১২২৮৩। এর একাংশ, মুস্তাদরাকে হাকেম : (২/৬৫৩), হাদীস নং ৪১৬৯)।

হলোপ্ম তিনি আবার সাতটি পাথর মারলেন। ফলে সে মাটিতে ঢুকে গেল। এরপর সে আবার তৃতীয় জামরায় উপস্থিত হল। তিনি আবার সাতটি পাথর মারলেন। ফলে সে মাটিতে ঢুকে গেল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তোমরা শয়তানকে পাথর মারো আর তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীনের অনুসরণ কর।”[677]

তবে এটা মনে করা কখনো সমীচীন হবে না যে, বর্তমানে যারা পাথর নিক্ষেপ করছে তারা শয়তানকে আঘাত করছে; বরং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করেই আল্লাহর যিকিরকে সমুন্নত রাখার জন্য কঙ্কর নিক্ষেপ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ»

“বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ এবং জামরায় পাথর নিক্ষেপের বিধান আল্লাহর যিক্‌র কায়েমের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।”[678]

---

[677] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১৫৬।

[678] তিরমিযী, হাদীস নং ৯০২; জামেউল উলূম : ১৫০৫ (তবে এর সনদ দুর্বল)।

নবম অধ্যায়: মক্কার পবিত্র ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

হজ-উমরার পবিত্র স্থানসমূহের পরিচিতি

পবিত্র স্থানসমূহ:

কা‘বাঘর

- ইবাদতের উদ্দেশ্যে যমীনে সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় কা‘বাঘর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ۝٩٦﴾ [ال عمران: ٩٦]

“নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও সৃষ্টিকুলের জন্য হিদায়াত।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৬]

আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যমীনে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ স্থাপিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম।[679]

- প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. মক্কা নগরীতে পবিত্র কা‘বাঘর পুণনির্মানের নির্দেশ পান। তারা উভয়ে তা নির্মাণ করেন। এই নির্মাণের বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।[680]

---

[679] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৬।

[680] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সূরা বাকারার ১২৭ আয়াতের তাফসীর। আরো দেখুন: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৪।

- অনেক ঐতিহাসিকের মতে কা'বাঘর ১২ (বারো) বার নির্মাণ পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে। নিচে নির্মাতা, পুনঃনির্মাতা ও সংস্কারকের নাম উল্লেখ করা হলো:

১. ফিরিশতা ২. আদম ৩. শীছ ইবন আদম ৪. ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালাম ৫. আমালেকা সম্প্রদায় ৬. জুরহুম গোত্র ৭. কুসাই ইবন কিলাব ৮. কুরাইশ ৯. আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু (৬৫ হি.) ১০. হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ (৭৪ হি.) ১১. সুলতান মারদান আল-উসমানী (১০৪০ হি.) এবং বাদশাহ ফাহদ ইবন আবদুল আজীজ (১৪১৭ হি.)।[681]

- সুলতান মারদান আল উসমানির সংস্কারের পর বাদশাহ ফাহদের সংস্কার কার্যক্রম হলো সর্বাপেক্ষা ব্যাপক।

কা'বাঘরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও উচ্চতা

উচ্চতা	মুলতাযামের দিকে দৈর্ঘ্য	হাতীমের দিকে দৈর্ঘ্য	রুকনে ইয়ামানী ও হাতীমের মাঝখানের দৈর্ঘ্য	হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানের দৈর্ঘ্য

[681] ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আব্দুল গনী : তারীখু মাক্কাতিল মুকাররামা, পৃ. ৩৪, মাতাবিউর রাশীদ, মদীনা মুনাওয়ারা।

১৪ মিটার	১২.৮৪ মিটার	১১.২৮ মিটার	১২.১১ মিটার	১১.৫২ মিটার

কিয়ামতের অন্যতম বড় আলামত হচ্ছে, এক হাবশী কা'বাঘর ধ্বংস করে ফেলবে। এরপর কা'বা ঘর আর নির্মিত হবে না। কা'বা ঘর ধ্বংসের ঘটনা সেই দিন ঘটবে যেদিন 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মত কোনো লোক পৃথিবীতে থাকবে না। এরপর কিয়ামত সংঘটিত হবে।

হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)

- কা'বাঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, যমীন থেকে ১.১০ মিটার উচ্চতায় হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত। হাজরে আসওয়াদ দৈর্ঘ্যে ২৫ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১৭ সেন্টিমিটার।

- পূর্বে হাজরে আসওয়াদ এক খণ্ড ছিল, কারামাতা সম্প্রদায় ৩১৯ (তিনশত উনিশ) হিজরীতে পাথরটি উঠিয়ে নিজদের অঞ্চলে নিয়ে যায়। সেসময় পাথরটি ভেঙে ৮ (আট) টুকরো হয়ে যায়। এ টুকরোগুলোর সবচেয়ে বড়টি খেজুরের মতো। টুকরোগুলো বর্তমানে অন্য আরেকটি পাথরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যার চারপাশে দেওয়া হয়েছে রুপার বর্ডার। তাই রুপার বর্ডারবিশিষ্ট পাথরটি চুম্বন নয় বরং তাতে স্থাপিত হাজরে আসওয়াদের টুকরোগুলো চুম্বন বা স্পর্শ করতে পারলেই কেবল হাজরে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ করা হয়েছে বলে ধরা হবে।

- ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وفي رواية هُوَ أَشَدُّ

بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ».

"হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে নেমে এসেছে। আর এর রং দুধের চেয়ে সাদা। অন্য বর্ণনায়, বরফের চেয়েও সাদা ছিল। পরে আদম-সন্তানের পাপ তাকে কালো করে দেয়।"[682]

- অপর এক হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ».

"রুকন (হাজরে আসওয়াদ) ও মাকামে ইবরাহীম- পাথর দু'খানি জান্নাতের ইয়াকুত পাথরগুলোর মধ্য থেকে দু'টি পাথর, আল্লাহ যেগুলোকে আলোহীন করে দিয়েছেন। যদি তিনি এসবকে আলোহীন না করে দিতেন, তবে তা পূর্ব-পশ্চিমকে আলোকিত করে দিত।"[683]

- ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا».

"নিশ্চয় ঐ দু'টির (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী) কে

---

682 তিরমিযী, হাদীস নং ৮৭৭; ইবন খুযাইমা, (৪/২৮২), হাদীস নং ২৭৩৩।

683 তিরমিযী, হাদীস নং ৮৭৮; মুসনাদ আহমদ, (১১/৫৭৭), হাদীস নং ৭০০০; ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২৭৩১।

স্পর্শ করার দ্বারা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।”[684]

 ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেন,

«وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ».

“আল্লাহর কসম, হাজরে আসওয়াদকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান করবেন। তার থাকবে দু’টি চোখ যা দিয়ে সে দেখবে, আর থাকবে একটি জিহবা, যা দিয়ে সে কথা বলবেপ্ল যে তাকে চুম্বন বা স্পর্শ করবে, তার পক্ষে সে কিয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে।”[685]

রুকনে ইয়ামানী

এটি কা‘বাঘরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এটি ইয়ামান দেশের দিকে হওয়াতে একে রুকনে ইয়ামানী বলা হয়েছে থাকে।[686] হাদীসে এসেছে, এই রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করলে মানুষের গুনাহ মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا».

“নিশ্চয় ঐ দু’টি (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী) কে স্পর্শ

---

[684] নাসাঈ, (৫/২২১), হাদীস নং ২৯১৯।

[685] তিরমিযী, হাদীস নং ৯৬১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৯৪৪; আহমদ : (৪/৯১), হাদীস নং ২২১৫।

[686] নাববী, শরহু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২/৮৪৪।

করার দ্বারা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।”[687]

অন্য হাদীসে এসেছে,

«يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسانان وشفتان».

“রুকনে ইয়ামানী কিয়ামতের দিন আবূ কুবাইস পর্বতের চেয়েও বড় আকারে আবির্ভূত হবে। তার থাকবে দু’টি জিহবা এবং দু’টি ঠোঁট।”[688]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে: এটিকে চুমু না দিয়ে শুধু স্পর্শ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে এ রুকনটিতে স্পর্শ করতেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لَمْ أَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

“দু’টি রুকন ইয়ামানী ছাড়া আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করতে দেখি নি।”[689]

আল্লামা যারকানী বলেন, কা‘বাঘরের চারটি কোণ রয়েছে। প্রথম কোণের রয়েছে দু’টি ফযীলত। এতেই রক্ষিত আছে হাজরে আসওয়াদ আর এটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিত্তির ওপর

---

[687] নাসাঈ, (৫/২২১), হাদীস নং ২৯১৯।

[688] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব : (২/২৯), হাদীস নং ১১৪৫; মুসনাদ আহমদ, (১১/৫৬০), হাদীস নং ৬৯৭৮। তবে মুসনাদ আহমদের বর্ণনায় শুধু রুকন শব্দ বলা হয়েছে।

[689] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৬৭।

প্রতিষ্ঠিত। আর দ্বিতীয় কোণ অর্থাৎ রুকনে ইয়ামানীর রয়েছে একটি ফযীলত। তা হলো এটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অপর দুই রুকনের কোনো বিশেষত্ব নেই। কারণ, তা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।[690] তাই শুধু হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীকেই স্পর্শ করা হয়।

মুলতাযাম

হাজরে আসওয়াদ থেকে কা'বা শরীফের দরজা পর্যন্ত জায়গাটুকুকে মুলতাযাম বলে।[691] মুলতাযাম শব্দের আক্ষরিক অর্থ এঁটে থাকার জায়গা। আবদুর রহমান ইবন সাফওয়ান বলেন,

رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ مِنْ الْكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسْطَهُمْ.

“আমি মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের কা'বা ঘর থেকে বের হতে দেখলাম। অতঃপর তারা কা'বাঘরের দরজা থেকে নিয়ে হাতীম পর্যন্ত স্পর্শ করলেন এবং তারা তাদের গাল বাইতুল্লাহ'র সাথে লাগিয়ে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের মাঝে ছিলেন।”[692]

---

[690] মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ : ৯/১৪।

[691] আল মুসান্নাফ লি আব্দির রায্যাক : (৫/৭৬), হাদীস নং ৯০৪৭

[692] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৮৯৮। এই হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। কিন্তু তার অনুরূপ একটি হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবন আমর থেকে বর্ণিত। তিনি রুকন ও দরজার মাঝখানে দাঁড়ালেন। তিনি তার বক্ষ, দু'বাহু ও দু'হাতের তালু

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা‘বা গৃহের দরজা ও রুকনের মাঝামাঝি স্থানটি মুলতাযাম।[693]

- সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় এসে মুলতাযামে যেতেন এবং সেখানে দু'হাতের তালু, দু'হাত, চেহারা ও বক্ষ রেখে দো‘আ করতেন। বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বে বা পরে অথবা অন্য যেকোনো সময় মুলতাযামে গিয়ে দো‘আ করা যায়। ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন,

إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْتِيَ الْمُلْتَزَمَ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ وَالْبَابِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ وَيَدْعُوْ، وَيَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ، فَعَلَ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ قَبْلَ طَوَافِ الْوَدَاعِ، فَإِنَّ هَذَا الاِلْتِزَامُ لاَ فَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ حَال الْوَدَاعِ وَغَيْرِهِ، وَالصَّحَابَةُ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ مَكَّةَ.

“যদি সে ইচ্ছা করে হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যবর্তী স্থান মুলতাযামে আসবে। অতঃপর সেখানে তার বক্ষ, চেহারা, দুই বাহু ও দুই হাত রাখবে এবং দো‘আ করবে, আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজনগুলো চাইবে, তবে এরূপ করা যায়। বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বেও এরূপ করতে পারবে। মুলতাযাম ধরার ক্ষেত্রে বিদায়ী অবস্থা ও অন্যান্য অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর

সম্প্রসারিত করে কা‘বাঘরের ওপর রাখলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনটি করতে দেখেছি। আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৮৯৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৯৬২। এ হাদীসের সনদ উত্তম।

[693] আবদুর রায্যাক সানআনী, আল-মুসান্নাফ : (৫/৭৬), হাদীস নং ৯০৪৭।

সাহাবীগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন তখন এরূপ করতেন।”[694]

তবে বর্তমান যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে মুলতাযামে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই সুযোগ পেলে সেখানে যাবেন। অন্যথায় যাওয়ার দরকার নেই। কেননা মুলতাযামে যাওয়া তাওয়াফের অংশ নয়। তাওয়াফের সময় তা করা যাবে না।

হিজর বা হাতীম

হিজর বা হাতীম হচ্ছে, কা‘বার উত্তরদিকে অবস্থিত অর্ধেক বৃত্তাকার অংশ। হাতীম শব্দের অর্থ ভগ্নাংশ। আর হিজর অর্থ পাথর স্থাপন করা। এটা কা‘বা ঘরের অংশ। অর্থাভাবে কা‘বার পুনর্নির্মাণের সময় কুরাইশরা এজায়গাটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারে নি। তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিত্তির স্থানগুলোতে পাথর স্থাপন করল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ».

“তোমার গোত্রের লোকেরা কা‘বাঘর পুনর্নিমাণের সময় একে ছোট করে ফেলেছে। তারা যদি সদ্য শির্ক থেকে আগত না হত তবে যে অংশটুকু তারা বাইরে রেখেছে সেটুকু আমি কা‘বাঘরের ভেতরে

---

[694] ইবন তাইমিয়া, মাজমু‘ ফাতাওয়া : (২৬/১৪২)।

ফিরিয়ে আনতাম। আমার মৃত্যুর পর তোমার সমাজের লোকেরা যদি পুনরায় একে নির্মাণ করতে চায়। (তখন তুমি তাদেরকে এটা দেখিয়ে দিবে।) তাই এসো হে আয়েশা! তোমাকে ঐ স্থানটুকু দেখিয়ে দেই যেটুকু কুরাইশরা কা'বাঘর পুননির্মাণের সময় বাইরে রেখেছে। এই বলে তিনি বাইরে থাকা সাত হাত পরিমাণ স্থান দেখিয়ে দিলেন।”[695]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পরিমাণ স্থান বাইরে ছিল বলে নির্ধারণ করেছেন সেটুকুই কা'বার অংশ। বর্তমানে উত্তর দিকের দেয়ালের ভেতরে যতটুকু স্থান ঢোকানো হয়েছে, তা সঠিক পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। যে এখানে সালাত আদায় করতে চায়, তার উচিৎ হাদীসে বর্ণিত সঠিক স্থানটুকু তালাশ করে বের করা।

হিজরে সালাত আদায় করা কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায়ের সমান। কারণ এটা কা'বাঘরেরই অংশ। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ لِي صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ.

“আমি কা'বা গৃহে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে আগ্রহ প্রকাশ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে হিজরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি কা'বাঘরে

---

695 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৩।

প্রবেশ করতে চাইলে হিজরে সালাত আদায় কর। কারণ এটা কা'বারই অংশ। কিন্তু তোমার সমাজের লোকেরা কা'বার পুনর্নিমাণের সময় এটাকে ছোট করে ফেলেছে এবং হিজরকে কা'বার বাইরে রেখে দিয়েছে।"[696]

ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, কা'বা ঘরের তাওয়াফকারী অবশ্যই হিজরের বাইরে দিয়ে তওয়াফ করবে। কারণ, এটা কা'বারই অংশ। ব্যাপকভাবে প্রচারিত ভুলেরই একটি হচ্ছে এটাকে 'হিজর ইসমাঈল' করে নামকরণ করা। এ নামকরণটি সঠিক নয়। কিছু মানুষ মনে করে, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম অথবা অন্য অনেক নবীকে এখানে দাফন করা হয়েছে। এটি আরও জঘন্য ধারণা।[697]

মাকামে ইবরাহীম

মাকাম শব্দের আভিধানিক অর্থ, দণ্ডায়মান হওয়ার জায়গা। আর মাকামে ইবরাহীম অর্থ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দণ্ডায়মান হওয়ার জায়গা। এটি একটি বড় পাথর, যার ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা নির্মাণ করেছিলেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কারণ,

- এটি কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নিয়ে এসেছিলেন, যাতে পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই

---

[696] নাসাঈ, হাদীস নং ২৯১২; মুসনাদ আহমাদ : (৪০/১৬৩), হাদীস নং ২৪৬১৬; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ৩০১৮।

[697] ড. আবদুল্লাহ দুমাইজী, আল-বালাদুল হারাম : ফাযাইল ওয়া আহকাম : ৬৬।

পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কা‘বাঘর নির্মাণ করতে পারেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পাথর এনে দিতেন এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পবিত্র হাতে তা কা‘বার দেয়ালে রাখতেন। এভাবে তিনি কা‘বাঘর নির্মাণ করেন।[698]

- এটি জান্নাত থেকে আগত ইয়াকূত পাথর। হাদীসে এসেছে, ‘রুকন (হাজরে আসওয়াদ) ও মাকামে ইবরাহীম- পাথর দু’খানি জান্নাতের ইয়াকুত পাথরগুলোর মধ্য থেকে দু’টি পাথর, আল্লাহ যেগুলোকে আলোহীন করে দিয়েছেন। যদি তিনি এসবকে আলোহীন না করে দিতেন, তবে তা পূর্ব-পশ্চিমকে আলোকিত করে দিত।’[699]

- হারাম শরীফের প্রকাশ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে মাকামে ইবরাহীম। কা‘বাঘরের নির্মাণ কাজ শেষে ঐ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি সারা বিশ্বের মানুষকে হজের আহবান জানিয়েছিলেন।[700]

- কুরআনুল কারীমে মাকামে ইবরাহীমকে হারাম শরীফের স্পষ্ট নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ ﴾ [ال عمران: ٩٧]

---

[698] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৪।

[699] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৭৮; মুসনাদ আহমদ, (২/২১৩); ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২৭৩১

[700] আল-ফাসী, শিফাউল গারাম : (২০৩/১)।

“তাতে রয়েছে স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, মাকামে ইবরাহীম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, বাইতুল্লাহ’য় আল্লাহর কুদরতের স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে এবং খলীলুল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিদর্শনাবলি রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো ঐ পাথরে তাঁর খলীল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদচিহ্ন, যার উপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।[701]

ইবনুল জাওযী বলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদচিহ্ন এখন পর্যন্ত মাকামে ইবরাহীমে বিদ্যমান। হারামবাসীদের কাছে এটি খুব পরিচিত।[702]

- ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বাইতুল্লাহ’র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পর মানুষকে এর উপর দাঁড়িয়েই আহ্বান জানিয়েছিলেন, যেন তারা তালবিয়া পাঠ করতে করতে হজ পালনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রভূর ঘরের দিকে ছুটে আসে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ ٢٧ ﴾ [الحج: ٢٧]

“আর মানুষের নিকট হজের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি

---

[701] তাফসীরে তাবারী : (৪/১১)।

[702] ইবন হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে এ বক্তব্যটি ইবনুল জাওযী থেকে উদ্ধৃত করেছেন (১৬৯/৮); তাফসীর ইবন কাসীর : (৩৮৪/১)।

দিয়ে।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৭]

সে নির্দেশ অনুযায়ী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মাকামে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা প্রদান করলেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পাথরটির উপর দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে মানুষ, তোমাদের ওপর হজ ফরয করা হয়েছে। ঘোষণাটি তিনি সে অনাগত প্রজন্মকেও শুনিয়ে দিলেন, যারা ছিল তখনও পুরুষের মেরুদন্ডে এবং নারীদের গর্ভে। যারা ঈমান এনেছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা হজ করবেন বলে আল্লাহ জানতেন তারা এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বললেন, ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’।’[703]

- ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদচিহ্নের একটি ১০ সেন্টিমিটার গভীর ও অন্যটি ৯ সেন্টিমিটার। লম্বায় প্রতিটি পা ২২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১১ সেন্টিমিটার। বর্তমানে এক মিলিয়ন রিয়াল ব্যয় করে মাকামের বাক্সটি নির্মাণ করা হয়েছে। পিতল ও ১০ মিলি মিটার পুরো গ্লাস দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এটি। ভেতরের জালে সোনা চড়ানো। হাজরে আসওয়াদ থেকে মাকামে ইবরাহীমের দূরত্ব হলো ১৪.৫ মিটার।[704]

- তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু’রাকাত সালাত

[703] ইবন হাজার তার ফাতহুল বারী গ্রন্থে ৬৬৮ নং হাদীসের সনদ সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন।

[704] ড ড. মুহাম্মদ ইলয়াস আব্দুল গনী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।।

আদায় করতে হয়। জায়গা না পেলে অন্য কোথাও আদায় করলে এ বিধান পালন হয়ে যায়।

মাতাফ

কা‘বা শরীফের চারপাশে উন্মুক্ত জায়গাকে মাতাফ বলে। মাতাফ শব্দের অর্থ, তাওয়াফ করার জায়গা। মাতাফ সর্বপ্রথম পাকা করেন আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৫ হিজরীতে। এর আয়তন ছিল তখন কা‘বার চারপাশে প্রায় ৫ (পাঁচ) মিটারের মত। কালক্রমে মাতাফ সম্প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমানে মাতাফ শীতল মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রচণ্ড রোদের তাপেও শীতলতা হারায় না, ফলে হাজীগণ আরামের সাথে তার ওপর দিয়ে হেঁটে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে পারেন।

সাফা

কা‘বা শরীফ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, ১৩০ মিটার দূরে, সাফা পাহাড় অবস্থিত। সাফা একটি ছোট পাহাড়, যার ওপর বর্তমানে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। এ পাহাড়ের একাংশ এখনও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। আর বাকি অংশ পাকা করে দেওয়া হয়েছে। সমতল থেকে উঁচুতে এই পাকা অংশের ওপরে এলে সাফায় উঠেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। সাফা পাহাড়ের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে এখনও পবিত্র কা‘বা দেখা যায়।

মারওয়া

শক্ত পাথরের ছোট্ট একটি পাহাড়। পবিত্র কা‘বা থেকে ৩০০ মিটার দূরে পূর্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত। বর্তমানে মারওয়া থেকে কা‘বা শরীফ দেখা যায় না। মারওয়ার সামান্য অংশ খোলা রাখা হয়েছে। বাকি

অংশ পাকা করে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

মাস‘আ

সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানকে মাস‘আ বলা হয়। মাস‘আ দৈর্ঘ্যে ৩৯৪.৫ মিটার ও প্রস্থে ২০ মিটার। মাস‘আর গ্রাউণ্ড ফ্লোর ও প্রথম তলা সুন্দরভাবে সাজানো। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ভিড় হলে প্রথম বা দ্বিতীয় তলায় গিয়েও সা‘ঈ করতে পারেন। প্রয়োজন হলে ছাদে গিয়েও সা‘ঈ করা যাবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে, আপনার সা‘ঈ যেন মাস‘আর মধ্যেই হয়। মাস‘আ থেকে বাইরে দূরে কোথাও সাঈ করলে সাঈ হয় না।

আল-মসজিদুল হারাম

কা‘বা শরীফ ও তার চারপাশের মাতাফ, মাতাফের ওপারে বিল্ডিং, বিল্ডিংয়ের ওপারে মার্বেল পাথর বিছানো উন্মুক্ত চত্বর- এগুলো মিলে বর্তমান আল-মসজিদুল হারাম গঠিত। কারও কারও মতে পুরো হারাম অঞ্চল আল-মসজিদুল হারাম হিসেবে বিবেচিত। কুরআনুল কারীমের এক আয়াতে এসেছে-

﴿لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ﴾ [الفتح: ٢٧]

“তোমরা আল-মাসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে।”[705] অর্থাৎ হারাম অঞ্চলে প্রবেশ করবে। সূরা ইসরায় আল-মসজিদুল হারামের কথা উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[705] সূরা আলফাতহ-, আয়াত ।২৭ :

﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١﴾ [الاسراء: ١]

“পবিত্র মহান সে সত্ত্বা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা[706] পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১] ইতিহাসবিদদের বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মে হানীর ঘর থেকে ইসরা ও মি‘রাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর তৎকালে কা‘বা শরীফের চারপাশে সামান্য এলাকা জুড়ে ছিল আল-মসজিদুল হারাম, উম্মে হানীর ঘর আল-মসজিদুল হারাম থেকে ছিল দূরে। তা সত্ত্বেও উক্ত স্থানকে আয়াতে মসজিদুল হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হারামের সীমানা

আল্লাহ তা‘আলা জিবরীলের মাধ্যমে ইবরাহীম আ. কে হারামের সীমানা দেখিয়ে দেন। তিনি জিবরীলের নির্দেশনা মতে সীমানা স্তম্ভ স্থাপন করেন। মক্কা বিজয় পর্যন্ত এ অবস্থাতেই সেটি অপরিবর্তিত ছিল। সে বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামীম ইবন আসাদ আল-খুযা‘য়ীকে প্রেরণ করে তা সংস্কার করেন। এরপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ খেলাফতকালে চারজন কুরাইশীকে পাঠিয়ে আবারো তা সংস্কার করেন। আল্লাহ তা‘আলা আল-বাইতুল ‘আতীক অর্থাৎ কা‘বার সম্মানার্থে ‘হারাম’ সীমানা নির্ধারণ করেছেন এবং

---

[706] ফিলিস্তীনে অবস্থিত বাইতুল মাকদিস, যা মুসলিমদের প্রথম কিবলা ছিল।

একে নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এ নির্ধারিত স্থানে মানুষসহ সকল পশু-পাখি এমনকি গাছ-পালা তরু-লতা পর্যন্ত নিরাপদ। এখানে নেক আমলের ফযীলত অন্যান্য সকল স্থান অপেক্ষা অনেক বেশি। হারামের সীমানা মক্কার চারপাশব্যাপী বিস্তৃত। তবে সবদিকের দূরত্ব এক সমান নয়। বর্তমানে মক্কা প্রবেশের সদর রোডে হারামের সীমারেখার একটি নির্দেশনা লাগানো আছে। যা নিম্নরূপ-

- পশ্চিম দিকে জেদ্দার পথে 'আশ-শুমাইসী' নামক স্থান পর্যন্ত। যাকে আল হুদায়বিয়া বলা হয়। এটি মক্কা থেকে ২২ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।
- দক্ষিণে 'তিহামা' হয়ে ইয়েমেন যাওয়ার পথে 'ইযাআত লিব্ন' নামক স্থান পর্যন্ত। যা মক্কা থেকে ১২ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।
- পূর্বে 'ওয়াদিয়ে উয়ায়নাহ' নামক স্থানের পশ্চিম কিনারা পর্যন্ত। যা মক্কা থেকে ১৫ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।
- উত্তর-পূর্ব দিকে 'জি'ইররানাহ' এর পথে। শারায়ে মুজাহেদীনের গ্রাম পর্যন্ত, যা মক্কা থেকে ১৬ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।
- উত্তরে 'তানঈম' নামক স্থান পর্যন্ত। এটি মক্কা থেকে ৭ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ রয়েছে, যা মসজিদে আয়েশা নামে বিখ্যাত।

মক্কার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

হেরা পাহাড়

হেরা পাহাড় মক্কা খেকে মিনার পথে বাম দিকে অবস্থিত। এর উচ্চতা ৬৩৪ মিটার। বর্তমানে মক্কাবাসিরা একে জাবালে নূর বলে থাকেন। এ পাহাড়ের ওপরেই সেই গুহা রয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের পূর্বে ইবাদত করতেন। ইবাদতরত অবস্থায় এখানেই সর্বপ্রথম কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল। এ গুহার প্রবেশদ্বার উত্তর দিক দিয়ে। এতে পাঁচজন লোক বসতে পারে। এর উচ্চতা মাঝারি আকারের। এ পাহাড়ে উঠলে মক্কার ঘর-বাড়ি দেখা যায়। দেখা যায় ছাওর পাহাড়। পাহাড়ের চূড়া উটের কুজের মত। মক্কাসহ সারা পৃথিবীতে হেরা পাহাড়ের মতো কোনো পাহাড় নেই। এ এক অনন্য পাহাড়।

নবীজীর জন্মস্থান

নবীজীর পবিত্র জন্মস্থানটি সুপরিচিত। শি'আবে আলীর প্রবেশমুখে অবস্থিত। বনী হাশেম গোত্র যেখানে বাস করত সেটিই শি'আবে আলী। যেখানে কুরাইশগণ বনূ হাশিম গোত্রকে অবরুদ্ধ করে রাখে। মানুষ বরকত স্বরূপ সে স্থানের মাটি গ্রহণ করা শুরু করেছিল। যা একটি গর্হিত ও শির্কী কাজ। তাই পরবর্তীতে সেখানে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়প্ত এটি শায়েখ আব্বাস কাত্তান ১৩৭১ হিজরীতে তার ব্যক্তিগত সম্পদ দিয়ে নির্মাণ করেন।

গারে ছাওর

গারে ছাওরটি ছাওর পাহাড়ে অবস্থিত। মসজিদে হারাম থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। এর উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৪৮ মিটার আর পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রায় ৪৫৮ মিটার ওপরে। এ গর্তটি পাহাড়ের উপরে এক পাশে অবস্থিত, যার সর্বোচ্চ উচ্চতা ১.২৫ মিটার এবং সর্বোচ্চ দৈঘ্য ও প্রস্থ ৩.৫×৩.৫ মিটারপ্ম এ গর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

আবূ কুবাইস ও আজইয়াদ পাহাড়

আয়তনে খুব একটা বড় না হলেও আবূ কুবাইস মক্কার অন্যতম প্রসিদ্ধ পাহাড়। এ পাহাড়টি শি‘আবে আবী তালেব ও ‘আজইয়াদের মধ্যখানে অবস্থিত। বর্তমানে এর উপর বাদশার বাড়ী রয়েছে। আজইয়াদ হচ্ছে মক্কার উল্লেখযোগ্য পাহাড়। এটি মক্কার শক্তমাটির পাহাড়দ্বয়ের একটি। শক্ত মাটির অপরটি হলো, কু‘আইকি‘আন পাহাড়। এ দুই পাহাড়ের বিষয়ে হাদীসে রয়েছে- (আল্লাহ) বলেন, ‘হে মুহাম্মদ, আপনি চাইলে আমি তাদেরকে (কাফেরদেরকে) এই পাহাড়দ্বয়ের মাঝে চাপা দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না বরং আমি আশা করি তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন লোক জন্ম নিবে যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে।[707]

---

[707] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৩১।

দারুন নাদওয়া

এটি নির্মাণ করেন কুসাই ইবন কিলাব হিজরতের প্রায় ২০০ বছর আগে। এ নামে নামকরণ করা হয় এ কারণে যে, তারা এখানে পরামর্শ করতো। এটাই ঐ গৃহ যেখানে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ইসলাম প্রচারের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে একত্রিত হতো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনাও এখানেই করে।

আববাসী খলীফা মু‘তাদ্বাদ ২৮৪ হিজরীতে মসজিদে হারাম সম্প্রসারণের সময় দারুন নাদওয়াকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। বর্তমানে সেটা মসজিদে হারামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

নহরে যোবায়দা

নহরে যোবায়দা একটি মিষ্টি পানির নহর বা খাল বিশেষ। খলীফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী যোবায়দা হাজীদের পানি পানের ব্যবস্থা করার জন্য এটি খনন করেন। এটি সুদূর ইরাকের মসুল নগরীর নু‘মান উপত্যকা থেকে উৎসারিত হয়ে তায়েফের পাশ দিয়ে আরাফা ও উরনাহ উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মক্কার দিকে চলে গেছে। নহরে যোবায়দা খনন করা হয় আজ থেকে প্রায় ১২০০ বছর আগে। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। হিজরী ১৪২১ সালে যুবরাজ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল আজীজ (বর্তমান বাদশাহ) এ নহর থেকে বর্তমানে কীভাবে উপকৃত হওয়া যায় তা খতিয়ে দেখার জন্য এক ফরমান জারি করেন।

যী-তুয়া

যী-তুয়া উপত্যকা মক্কার উপত্যকাগুলোর একটি। এর পুরোটাই বর্তমানে আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়েছে। এ নামটিও মুছে গেছে। তবে জারওয়ালের কূপটিকে (বি'রে তুওয়া) তুওয়া কূপ নামে নামকরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে একবার রাত্রিযাপন করে সকালবেলা এর কূপের পানি দিয়ে গোসল করে মক্কায় প্রবেশ করেন। কূপটি জারওয়ালের প্রসূতি হাসপাতালের বিপরীতে এখনো বিদ্যমান।

দশম অধ্যায় : বাংলাদেশ থেকে হজের সফর: প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা

বাংলাদেশ থেকে হজের সফর: প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা

বাংলাদেশ থেকে আপনি দু'ভাবে হজে গমন করতে পারেন। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ও প্রাইভেট হজ এজেন্সির মাধ্যমে। উভয় শ্রেণীর হাজীদের প্রথম কাজ পাসপোর্ট সংগ্রহ করা। পাসপোর্ট সংগ্রহ যেহেতু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার তাই আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুতি নিবেন।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ সম্পাদন

আপনি সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে চাইলে নিম্নে বর্ণিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করুন:

- সরকার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমুদয় টাকা যেকোনো অনুমোদিত ব্যাংকে একত্রে জমা দিবেন। সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত ফরম পূরণ করে তা ঘোষিত তারিখের মধ্যে জমাকৃত টাকার রসিদসহ জেলা প্রশাসকের অফিসে জমা দিবেন।

- জমা দেওয়া টাকার রসিদ ও অন্যান্য কাগজ-পত্র দেখিয়ে অফিস কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে হজ ক্যাম্প থেকে বিমানের টিকিট সংগ্রহ করবেন।

- আপনার জমা দেওয়া টাকা যেসব খাতে ব্যয় করা হয় তা নিম্নরূপ: ১. বিমান ভাড়া। ২. এম্বারকেশন ফি। ৩. ভ্রমণ কর। ৪. ইনস্যুরেন্স ও সারচার্জ (ব্যাজ কার্ড, পুস্তিকা, কবজি-বেল্ট, আইটি সার্ভিস ইত্যাদি)। ৫. মু'আল্লিম ফি। ৬. মক্কা ও মদীনা শরীফের বাড়ি ভাড়া। ৭. সৌদি আরবে অবস্থানকালীন খাওয়া-দাওয়া ও কুরবানী খরচ, যা হাজীদেরকে বাংলাদেশেই দিয়ে দেওয়া হয়।

বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ সম্পাদন

- বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ক্যাটাগরি রয়েছে। আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী ক্যাটাগরি নির্বাচন করবেন। সরকার অনুমোদিত যেসব এজেন্সির সুনাম রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনো একটি বেছে নিবেন। তাদের নির্ধারিত টাকা চুক্তি মত পরিশোধ করবেন। টাকা পরিশোধ করে পাকা রসিদ নিয়ে নিবেন।
- কী-কী সুবিধা আপনি তাদের কাছ থেকে পাবেন তা নিশ্চিতভাবে জেনে নিন।
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়, এমন এজেন্সিকে কখনো টাকা দিবেন না।
- এজেন্সিটি সরকার অনুমোদিত কি-না জেনে নিন। সৌদি সরকারের অনুমোদন আছে কি-না তা জানতে পারবেন www.hajjinformation.com- সাইটের মাধ্যমে।

হজ যাত্রীদের করণীয়

১. স্বাস্থ্য পরীক্ষা: স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মেনিনজাইটিস প্রতিরোধক টিকা বাধ্যতামূলক। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকা নিয়ে মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। জেলা পর্যায়ে ও হাজী ক্যাম্পে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে। মেডিকেল সার্টিফিকেট ছাড়া কেউ হজে যেতে পারবেন না।

২. **হজ প্রশিক্ষণ:**

- সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ পালনেচ্ছুদের জন্য **১**ম পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জিলা ও বিভাগীয় কার্যালয়গুলোতে

সুবিধা মত সময়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২য় পর্যায়ে হজ যাত্রার ৩ দিন আগে হজ ক্যাম্পে অবস্থানকালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

- বেসরকারী হজ এজেন্সিগুলোর কোনো কোনটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৌদি আরব গমনের পূর্বেই একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এসব প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে মনোযোগের সাথে অংশগ্রহণ করা উচিৎ্য এ ছাড়াও কোনো কোন বিজ্ঞ আলেম অথবা মসজিদ কর্তৃপক্ষ হজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। সেখানেও অংশ গ্রহণ করা উচিৎ্য

ঢাকা হজ ক্যাম্পে

- সরকারী ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ হজ অফিস থেকে প্রেরিত অনুমতিপত্রে নির্ধারিত যে তারিখ থাকবে সেদিন পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে হজ ক্যাম্পে গিয়ে রিপোর্ট করবেন।

- বেসরকারী ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ এজেন্সির পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

- হজ ক্যাম্পে রিপোর্ট করার সময় সরকারী ব্যবস্থাপনার হাজীগণ পাসপোর্ট, ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার ডুপ্লিকেট রসিদসমূহ, মেডিকেল সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট এজেন্সির পরামর্শ অনুযায়ী সাথে আনবেন।

- হজ ক্যাম্প ডরমিটরিতে শুধুমাত্র হজযাত্রীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। তাই আত্মীয়-স্বজন সাথে আনা উচিৎ নয়। তবে নীচ

তলায় আত্মীয়-স্বজনগণ তাদের হজযাত্রীকে নানাবিধ দাপ্তরিক কাজে সহায়তা দিতে পারেন।

- হজ ক্যাম্পে পান খাওয়া বা ধূমপান করা নিষিদ্ধ। প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহের জন্য রয়েছে ৩টি ক্যান্টিন, যা রাত দিন ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। তাই বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।

- টিকিট, পাসপোর্ট, বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য কাগজপত্র খুবই যত্নের সাথে সংরক্ষণ করবেন। এগুলো হারিয়ে গেলে হজে যাওয়া সম্ভব হবে না।

- মালামাল বহনের জন্য যে লাগেজ নিবেন তার গায়ে নাম, পাসপোর্ট নং ও ঠিকানা লিখে নিবেন।

- কমপক্ষে ২ সেট ইহরামের কাপড়, ২ সেট পায়জামা-পাঞ্জাবি, ২টি লুঙ্গি, ২টি টুপি, ২টি গেঞ্জি, একটি তোয়ালে, ২টি গামছা সাথে নিবেন। শীত মৌসুম হলে দু'একটি গরম কাপড় বিশেষ করে চাদর সাথে নিবেন। মহিলা হজযাত্রীদের জন্য উত্তম হচ্ছে সালওয়ার-কামিজ নেয়া।

- ছুরি, কাঁচি, সুই ইত্যাদি ধারালো জিনিস হাতব্যাগে বা সাথে নেওয়া নিষেধ। তবে লাগেজে নেওয়া যাবে।

- আপনার কোনো অসুখ থেকে থাকলে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পর্যাপ্ত ওষুধ সাথে নিবেন। তবে ব্যবস্থাপত্র অবশ্যই সাথে রাখবেন। অন্যথায় জেদ্দা এয়ারপোর্টে সমস্যায় পড়তে পারেন। মনে রাখবেন, বাংলাদেশ হজ মিশন জটিল কোনো

রোগের চিকিৎসা দেয় না। সৌদি আরবে ওষুধের দাম প্রচুর। তাই এ ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হবেন। অন্যদিকে ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ঔষুধ বহন সেদেশে দণ্ডনীয় অপরাধ। অন্যের দেওয়া ঔষুধও নিজের ব্যাগে নিবেন না।

- আপনি যদি প্রথমে মক্কা প্রবেশের ইচ্ছা করেন, তাহলে বিমানের শিডিউলের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বিমানে উঠার আগেই ইহরাম বাঁধার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিবেন। সুতরাং ইহরামের কাপড় ব্যাগের ভেতর দিবেন না; বরং তা পরে নিবেন। শুধু ইহরামের নিয়তটা বাকি রাখবেন। বিমানে উঠার আগেও ইহরামের নিয়ত করা যায়, তবে তা সুন্নাতের বরখেলাফ। সুন্নাত হচ্ছে মীকাতে পৌঁছে ইহরাম বাঁধা বা ইহরামের নিয়ত করা।

- আপনি যদি প্রথমে মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়ত করে থাকেন এবং নিশ্চিত হন যে, প্রথমেই আপনি মদীনায় যেতে পারবেন, তাহলে এসময় ইহরাম বাঁধবেন না। কেননা মদীনা থেকে মক্কায় আসার পথে মদীনাবাসিদের যে মীকাত পড়বে, সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবেন।

জেদ্দা বিমান বন্দরে

- জেদ্দা বিমান বন্দরে বিমান থেকে নামার পর জেদ্দা হজ টার্মিনালে নেওয়া হবে। সেখানে বিশ্রাম কক্ষে অপেক্ষা করবেন। বিশ্রাম কক্ষ থেকে বহির্গমন বিভাগে গিয়ে পাসপোর্টে সিলমোহর লাগাতে হবে। এখানে আপনাকে লাইন বেঁধে বসতে হবে।

- পাসপোর্টে সিল লাগানো হলে আপনার ব্যাগ সংগ্রহ করবেন। ব্যাগ মেশিনে স্ক্যান করিয়ে মূল বিল্ডিং থেকে বের হয়ে যাবেন। বের হওয়ার গেটেই ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ আপনার কাছ থেকে ব্যাগ নিয়ে নিবে, যা আপনি জায়গা মতো পেয়ে যাবেন।

- একটু সামনে এগুলে কিছু অফিসার দেখতে পাবেন। তারা আপনার পাসপোর্টে কিংবা অন্য কোনো কাগজে বাসের টিকিট লাগিয়ে দিবেপ্ল

- বাংলাদেশের পতাকা টানানো জায়গায় গিয়ে পাসপোর্টে মু'আল্লিমের স্টিকার লাগাবেন। এরপর বাসে ওঠার জন্য লাইন ধরে দাঁড়াবেন। আপনার মাল-সামানা গাড়িতে ওঠানো হল কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিন। বাসে ওঠার পর ড্রাইভার হজ যাত্রীদের পাসপোর্ট নিয়ে নিবে এবং মক্কায় পৌঁছে হজ কন্ট্রাক্টর বা মু'আল্লিমের কাছে তা হস্তান্তর করবে। আর যদি মদীনায় পৌঁছেন তবে ড্রাইভার পাসপোর্টটি মদীনার আদিল্লাহ অফিসে জমা দিবেন। পাসপোর্ট জমা হওয়ার পর একটি হ্যাণ্ডবেল্ট দেওয়া হবে, যা সবসময় হাতে রাখতে হবে। কোনো অবস্থায়ই হারানো যাবে না। ফিরে আসার সময় বিমানবন্দরে পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হবে। সে পর্যন্ত এই হ্যাণ্ডবেল্টই পাসপোর্টের কাজ করবে।

মক্কা ও মদীনায়

- বাস থেকে নেমে প্রথমে নিজের মাল-সামানা সংগ্রহ করবেন। মাল-সামানা নিয়ে সরকার অথবা এজেন্সির ভাড়া করা বাসায়

আপনার জন্য বরাদ্দ করা কক্ষে গিয়ে উঠবেন। যে হোটেল বা বাসায় উঠবেন তার কয়েকটি কার্ড সংগ্রহ করে রাখুন।

- মক্কায় পৌঁছার পর মু'আল্লিম অফিস থেকে দেওয়া হাত বেল্ট সবসময় সাথে রাখবেন। এ বেল্টে মু'আল্লিম অফিসের নম্বর লেখা আছে, যা আপনি হারিয়ে গেলে কাজে লাগবে। ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় বেশি টাকা সাথে রাখবেন না। ভিড়ের মধ্যে টাকা হারিয়ে যেতে পারে কিংবা পকেটমারের খপ্পরে পড়তে পারেন। আর সবসময় দলবদ্ধ হয়ে চলার চেষ্টা করবেন। একা কখনো ঘরের বাইরে যাবেন না যতক্ষণ না আপনার বাসার লোকেশন ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারেন।

- গোসল করে খাওয়া দাওয়া সেরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে উমরা আদায়ের প্রস্তুতি নিন। সরকারী ব্যবস্থাপনার আওতাধীন হলে আপনার ফ্ল্যাটে অথবা আপনার নাগালের মধ্যে কোনো আলেম আছেন কি-না তা জেনে নিন। আলেম না পেলে হজ উমরা বিষয়ে যাকে বেশি জ্ঞানসম্পন্ন মনে হবে তার নেতৃত্বে উমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

- যাওয়ার পথে রাস্তার কিছু জিনিস আলামত হিসাবে নির্ধারণ করবেন, যাতে হারিয়ে গেলে সহজেই আপনার বাসা খুঁজে বের করতে পারেন। আলেম অথবা নেতা নির্ধারণের সময় হকপন্থী কি-না, তা ভালো করে যাচাই করে নিন। অন্যথায় আপনার হজ ও উমরা নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

- রোদের মধ্যে বাইরে বেশি ঘোরা-ফেরা করবেন না। প্রচুর ফলের রস ও পানি পান করবেন। প্রয়োজনে লবণ মিশিয়ে পান

করবেন। শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করলে বাংলাদেশ হজ মিশনের ডাক্তার অথবা সৌদি সরকার কর্তৃক স্থাপিত চিকিৎসাকেন্দ্রসমূহে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র ও ঔষুধ সংগ্রহ করবেন। এ ব্যাপারে কোনো অলসতা করা উচিৎ নয়। কেননা অসুস্থ শরীর নিয়ে হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করা খুবই কঠিন।

- হজ এজেন্সি বা মু'আল্লিমের সাথে কোনো সমস্যা দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে, ঠান্ডা মাথায় তা সমাধানের চেষ্টা করবেন। প্রয়োজন মনে করলে বাংলাদেশ হজ মিশনের কর্মকর্তাদের সাহায্যও নিতে পারেন।

মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায়

- ৭ যিলহজ দিবাগত রাতে অথবা ৮ যিলহজ সকালে ইহরাম অবস্থায় মু'আল্লিম কর্তৃক সরবরাহকৃত বাসে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। সাথে হালকা কিছু কাপড়-চোপড়, শুকনো খাবার ও সামান্য টাকা নিবেন। মূল্যবান জিনিসপত্র সাবধানে ঘরে রেখে যাবেন। নিরাপত্তার স্বার্থে টাকা মু'আল্লিম অফিসের কর্মকর্তার কাছে জমা রাখতে পারেন। তবে টাকা আমানত রেখে রসিদ নিতে ভুলবেন না। শক্ত-সবল এবং মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করায় অভ্যস্ত না হলে এবং নিজেদের তাবু না চিনলে মিনা আরাফায় পায়ে হেঁটে যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন না।

- আরাফার ময়দানে জাবালে আরাফায় উঠার চেষ্টা করবেন না এমনকি তার কাছে যাওয়ারও চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন।

আরাফায় হারিয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। হারিয়ে গেলে নিজ তাঁবুতে ফিরে আসা কঠিন। তাই নিজ তাঁবুতেই অবস্থান করুন।

- আরাফায় টয়লেট ব্যবহার করতে হলে কাউকে সাথে নিয়ে বের হোন। মুযদালিফাতেও টয়লেট ব্যবহারের প্রয়োজন হলে একই পন্থা অবলম্বন করুন।

- মিনা বা আরাফায় কখনো নিজের তাঁবু হারিয়ে ফেললে বাংলাদেশ হজ মিশনের তাঁবুতে পৌঁছার চেষ্টা করুন। সেখান থেকে কোনো না কোনো উপায়ে নিজ তাঁবুতে ফিরে আসার ব্যবস্থা হবে। আপনার হজ পালনে কোনো সমস্যা হবে না।

- কঙ্কর মারার সময় কখনো পায়ের স্যান্ডেল খুলে গেলে অথবা হাত থেকে কঙ্কর পড়ে গেলে তা উঠাতে চেষ্টা করবেন না।

- নিজেরা কুরবানীর পশু যবেহ করার পরিকল্পনা করলে সবার পক্ষ থেকে সবল ও তরুণ ২/৩ জনকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে যবেহ করাবেন। তবে এ প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। তাই মক্কা মদীনায় যেকোনো ব্যাংকে অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে রসিদ সংগ্রহ করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হজযাত্রীদের পক্ষ থেকে কুরবানী দিয়ে দিবেন। এ প্রক্রিয়াটি সহজ ও নিশ্চিত। সুতরাং অতি লোভনীয় অন্যসব প্রস্তাব বাদ দিয়ে এটাই বেছে নিন।

পরিশিষ্ট

- এক নজরে হজ-উমরা
- কুরআনের নির্বাচিত দো‘আ
- হাদীসের নির্বাচিত দো‘আ
- হজ-উমরা সংক্রান্ত পরিভাষা-পরিচিতি
- ব্যবহারিক আরবী শব্দসম্ভার

এক নজরে হজ-উমরা

হজের রুকন তথা ফরযসমূহ

(১) ইহরাম তথা হজ শুরু করার নিয়ত করা।

(২) আরাফায় অবস্থান।

(৩) তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাযা।

(৪) অধিকাংশ শরী'আতবিদের মতে সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করা। (ইমাম আবু হানিফা রহ. এটাকে ওয়াজিব বলেছেন।)

{এসব রুকনের কোনো একটি ছেড়ে দিলেও হজ হবে না।}

হজের ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম বাধাঁ।

২. আরাফার ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা।

৩. মুযদালিফায় রাত যাপন।

৪. কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

৫. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা।

৬. আইয়ামে তাশরীকের রাতসমূহ মিনায় যাপন।

৭. বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এসব ওয়াজিবের কোনো একটি ছেড়ে দিলে, দম অর্থাৎ পশু যবেহ করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।}

উমরার রুকন বা ফরযসমূহ

ইহরাম তথা উমরা শুরু করার নিয়ত করা।

বাইতুল্লাহ'র তাওয়াফ করা।

সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করা।

উমরার ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা।

৩. আবূ হানীফা রহ.-এর মতে সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

১. মাথার চুল কাট-ছাঁট বা পুরোপুরি মুণ্ডন করা।

২. হাত বা পায়ের নখ কর্তন বা উপড়ে ফেলা।

৩. ইহরাম বাঁধার পর শরীর, কাপড় কিংবা এ দু'টির সাথে সম্পৃক্ত অন্য কিছুতে সুগন্ধি জাতীয় কিছু ব্যবহার করা।

৪. বিবাহ করা, বিবাহ দেওয়া বা বিবাহের প্রস্তাব পাঠানো।

৫. ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা।

৬. ইহরাম অবস্থায় কামোত্তেজনাসহ স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা।

৭. ইহরাম অবস্থায় শিকার করা।

৮. মাথা আবৃত করা। (পুরুষদের জন্য)

৯. পুরো শরীর ঢেকে নেওয়ার মত পোশাক কিংবা পাজামার মত অর্ধাঙ্গ ঢাকে এমন পোশাক পরিধান করা। যেমন জামা বা পাজামা পরিধান করা। (পুরুষদের জন্য)

১০. হাত মোজা ব্যবহার করা। (মহিলাদের জন্য)

১১. নেকাব পরা। (মহিলাদের জন্য)

এক নজরে তামাত্তু হজ

৮ যিলহজের পূর্বে তামাত্তু হজ পালনকারীর করণীয়

১- মীকাত থেকে বা মীকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম বাঁধা। উমরা আদায়ের নিয়ত করে মুখে বলা, لَبَّيْكَ عُمْرَةً (লাব্বাইকা উমরাতান)। বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ শুরু করার আগ পর্যন্ত সাধ্যমত তালবিয়া পাঠ করতে থাকা।

২- বায়তুল্লাহে পৌঁছে উমরার তাওয়াফ সম্পাদন করা।

৩- উমরার সাঈ সম্পাদন করা।

৪- মাথার চুল ছোট করা অথবা মাথা মুণ্ডন করা। তবে এ উমরার ক্ষেত্রে ছোট করাই উত্তম। এরপর গোসল করে পরিচ্ছন্ন হয়ে স্বাভাবিক কাপড় পরে নেয়া। অন্য কোনো উমরা না করে ৮ যিলহজ পর্যন্ত হজের ইহরামের অপেক্ষায় থাকা। এ সময়ে নফল তওয়াফ, কুরআন তিলাওয়াত, জামাতের সাথে সালাত আদায়, হাজীদের সেবা ও যিলহজের দশদিনের ফযীলত অধ্যায়ে লিখিত আমলসমূহ প্রভৃতি নেক আমলে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

৮ যিলহজ

নিজ অবস্থান স্থল থেকে হজের নিয়তে لَبَّيْكَ حَجًّا (লাব্বাইকা হাজ্জান) বলে ইহরাম বাঁধা এবং মিনায় গমন করা। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং পরদিনের ফজরের সালাত নিজ নিজ ওয়াক্তে দু'রাকাত করে আদায় করা।

৯ যিলহজ (আরাফা দিবস)

১) ৯ যিলহজ সূর্যোদয়ের পর আরাফায় রওয়ানা হওয়া। সেখানে যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে যোহর ও আসর দুই ওয়াক্তের সালাত এক আযান ও দুই ইকামতে দু'রাকাত করে একসাথে আদায় করা। সালাত আদায়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আ ও যিকিরে মশগুল থাকা। সাধ্যমত উভয় হাত তুলে দো'আ করা।

২) সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে মুযদালিফায় রওয়ানা হওয়া।

৩) মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে এক আযান ও দুই ইকামতে, মাগরিব ও ইশার সালাত একসাথে আদায় করা। ইশার সালাত কসর করে দু'রাকাত পড়া এবং সাথে সাথে বিতরের সালাতও আদায় করে নেওয়া।

৪) মুযদালিফায় রাতযাপন। ফজর হওয়ার পর আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের সালাত আদায় করা। আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দো'আ মোনাজাতে মশগুল থাকা।

৫) মুযদালিফা থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করা যেতে পারে তবে জরুরী নয়। ৫৯ বা ৭০টি কঙ্কর সংগ্রহ করা। মিনা থেকেও কঙ্কর সংগ্রহ করা যেতে পারে। পানি দিয়ে কঙ্কর ধৌত করার কোনো বিধান নেই।

৬) সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনায় রওয়ানা হওয়া। তবে দুর্বলদের ক্ষেত্রে মধ্যরাতের পর মিনার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাওয়া জায়েয।

১০ যিলহজ

১। তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে জামরায়ে আকাবা তথা বড় জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। নিক্ষেপের সময় প্রত্যেকবার 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' অথবা 'আল্লাহু আকবর' বলা।

২। হাদী তথা পশু যবেহ করা, অন্যকে দায়িত্ব দিয়ে থাকলে হাদী যবেহ হয়েছে কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। হারামের অধিবাসিদের ওপর হাদী যবেহ করা ওয়াজিব নয়।

৩। মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা। মুণ্ডন করাই উত্তম। মহিলাদের ক্ষেত্রে আঙুলের অগ্রভাগ পরিমাণ ছোট করা।

৪। মাথা মুণ্ডনের মাধ্যমে ইহরাম হতে বেরিয়ে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাওয়া, এতে স্বামী-স্ত্রী মেলা-মেশা ছাড়া ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ অন্যসব বিষয় বৈধ হয়ে যাবে।

৫। তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাযা তথা ফরয তাওয়াফ সম্পাদন করা। এ ক্ষেত্রে এগার ও বার তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে। অধিকাংশ শরী'আতবিদের মতে এরপরেও আদায় করা যাবে, তবে ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে সেরে নেওয়া ভালোপ্ম

৬। সাঈ করা ও পুনরায় মিনায় গমন।

৭ । ১০ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় যাপন।

উল্লেখ্য, তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাযা আদায়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মেলা-মেশাও বৈধ হয়ে যায়।

১১ যিলহজ

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর ছোট, মধ্য, বড় জামরার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। ছোট জামরা থেকে শুরু করে বড় জামরায় শেষ করা। ছোট ও মধ্য জামরায় নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে দু'হাত উঠিয়ে দীর্ঘ দো'আ করা।

১২ যিলহজ

১। ১২ তারিখ অর্থাৎ ১১ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় রাতযাপন।

২। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিন জামরার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ। শুধু ছোট ও মধ্য জামরাতে নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে দু'হাত উঠিয়ে দীর্ঘ দো'আ করা।

হাজীদের জন্য ১২ তারিখে মিনা ত্যাগ করা জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনার সীমানা অতিক্রম করতে হবে। সেদিনই যদি কাউকে মক্কা ছেড়ে যেতে হয় তাহলে মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করা।

৩। ১২ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় যাপন করা উত্তম। ১২ তারিখের রাত মিনায় যাপন করলে ১৩ তারিখ সূর্য হেলে যাওয়ার পর ছোট, মধ্য ও বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করা।

১৩ যিলহজ

১। সূর্য হেলে যাওয়ার পর পর ছোট, মধ্য ও বড় জামরায় সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ। ছোট জামরা থেকে শুরু করে বড় জামরাতে

গিয়ে শেষ করবে। শুধু ছোট ও মধ্য জামরাতে নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করবে।

২। মিনা ত্যাগ করে মক্কা অভিমুখে যাত্রা এবং মক্কা ত্যাগের আগে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পাদন করা। তবে প্রসূতি ও স্রাবগ্রস্ত মহিলাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ না করার অনুমতি আছে।

এক নজরে কিরান হজ

৮ যিলহজের পূর্বে কিরান হজকারীর করণীয়

১- মীকাত থেকে বা মীকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম বাঁধা। কিরান হজ পালনকরী বলবে-

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

(লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান)

এরপর সাধ্যমত তালবিয়া পাঠ করতে থাকা। ১০ যিলহজ বড় জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের আগ মুহূর্তে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা।

২- তাওয়াফে কুদূম সম্পাদন করা।

৩- হজের মূল সাঈ অগ্রিম আদায় করার ইচ্ছা করলে তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করে নেয়া। এ তাওয়াফ সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। কেননা এই তাওয়াফ না করে সরাসরি মিনায় চলে যাবার অনুমতিও আছে। তখন সাঈ তাওয়াফে যিয়ারতের পর করতে হবে। কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা।

৮ যিলহজ

মিনায় গমন করা এবং সেখানে যোহর, আসর ও ইশা দুই রাকাত এবং মাগরিব ও পরদিনের ফজরের সালাত নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করাপ্স

৯ যিলহজ (আরাফা দিবস)

(১) ৯ যিলহজ সূর্যোদয়ের পর আরাফা অভিমুখে যাত্রা। সেখানে

যোহর ও আসর দুই ওয়াক্তের সালাত যোহরের ওয়াক্তে এক আযান ও দুই ইকামতে দু'রাকাত করে একসাথে আদায় করা। সালাত আদায় শেষ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আ ও যিকিরে মশগুল থাকা।

(২) সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে মুযদালিফা অভিমুখে রওয়ানা হওয়া।

(৩) মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে এক আযান ও দুই ইকামতে, মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করা। ইশার সালাত কসর করে দু'রাকাত পড়া এবং সাথে বেতরের সালাতও আদায় করে নেওয়া।

(৪) মুযদালিফায় রাত্রিযাপন। ফজর হওয়ার পর আউয়াল ওয়াক্তেই ফজরের সালাত আদায় করা। আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দো'আ ও মোনাজাতে মশগুল থাকা।

(৫) সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনায় রওয়ানা হওয়া। তবে দুর্বলদের ক্ষেত্রে মধ্যরাতের পর মিনার উদ্দেশে রওনা করা জায়েয।

(৬) মুযদালিফা থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করা যেতে পারে তবে জরুরী নয়। কঙ্কর সংখ্যা হবে ৫৯ বা ৭০টি। মিনা থেকেও কঙ্কর সংগ্রহ করা চলে। পানি দিয়ে কঙ্কর ধৌত করার কোনো বিধান নেই।

১০ যিলহজ

১। জামরায়ে আকাবা তথা বড় জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। নিক্ষেপের সময় প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বা আল্লাহু আকবার বলা।

২। হাদী তথা পশু যবেহ করা, অন্যকে দায়িত্ব দিয়ে থাকলে হাদী যবেহ হয়েছে কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। হারামের অধিবাসীদের জন্য হাদী যবেহ নেই।

৩। মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা। মুণ্ডন করাই উত্তম। নারীদের ক্ষেত্রে আঙুলের অগ্রভাগ পরিমাণ ছোট করা।

৪। মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে ইহরাম হতে বেরিয়ে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাওয়া, এতে স্বামী-স্ত্রী মেলা-মেশা ছাড়া ইহরাম অবস্থায় হারাম হয়ে যাওয়া অন্যসব কিছু জায়েয হয়ে যাবে।

৫। তাওয়াফে যিয়ারত সম্পাদন করা। এ ক্ষেত্রে ১১ ও ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে। অধিকাংশ শরী'আতবিদের মতানুসারে এরপরেও আদায় করা যাবে, তবে ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে সেরে নেওয়া ভালোপ্ম

৬। তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ না করে থাকলে সাঈ করা।

৭ । ১০ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় যাপন।

উল্লেখ্য, তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মেলা-মেশাও জায়েয হয়ে যায়।

১১ যিলহজ

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিন জামরার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ। ছোট জামরা থেকে শুরু করে বড় জামরায় শেষ করা। ছোট ও মধ্য জামরায় নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে

দু’হাত উঠিয়ে দীর্ঘ দো‘আ করা। বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষের পর দো‘আ নেই।

১২ যিলহজ

১। ১২ তারিখ (১১ তারিখ দিবাগত রাত) মিনায় রাতযাপন।

২। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিন জামরার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ। শুধু ছোট ও মধ্য জামরাতে নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে দু’হাত উঠিয়ে দীর্ঘ দো‘আ করা।

৩। হাজীদের জন্য ১২ তারিখে মিনা ত্যাগ করা জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনার সীমানা অতিক্রম করতে হবে।

৪। মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করা।

১৩ যিলহজ

১। সূর্য হেলে যাওয়ার পর পর তিন জামরায় সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। ছোট জামরা থেকে শুরু করে বড় জামরাতে গিয়ে শেষ করা। শুধু ছোট ও মধ্য জামরাতে নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে দু’হাত উঠিয়ে দীর্ঘ দো‘আ করা।

২। মিনা ত্যাগ করে মক্কায় রওয়ান করা। মক্কা ত্যাগের আগে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পাদন করা। প্রসূতি ও স্রাবগ্রস্ত মহিলাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ না করার অনুমতি আছে।

এক নজরে ইফরাদ হজ

৮ যিলহজের পূর্বে ইফরাদ হজকারীর করণীয়

১- মীকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম বাঁধা। ইফরাদ হজ পালনকারী বলবে,

لَبَّيْكَ حَجًّا

(লাব্বাইকা হাজ্জান)

এরপর সাধ্যমত তালবিয়া পাঠ করা।

২- তাওয়াফে কুদুম সম্পাদন করা।

৩- হজের মূল সাঈ অগ্রিম আদায় করার ইচ্ছা করলে তাওয়াফে কুদূমের পর সাঈ করে নেয়া। এ তাওয়াফ সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। কেননা এই তাওয়াফ না করে সরাসরি মিনায় চলে যাওয়ারও অনুমতি আছে। তখন সাঈ তাওয়াফে যিয়ারতের পর সম্পাদন করা। কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা।

৮ যিলহজ

মিনায় গমন করা এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং পরদিনের ফজরের সালাত নিজ নিজ ওয়াক্তে দু'রাকাত করে আদায় করা।

৯ যিলহজ (আরাফা দিবস)

১. ৯ যিলহজ সূর্যোদয়ের পর আরাফা অভিমুখে যাত্রা। সেখানে - যোহর ও আসর- এই দুই ওয়াক্তের সালাত যোহরের ওয়াক্তে এক

আযান ও দুই একামতে দু’ রাকাত করে একসাথে আদায় করা। সালাত আদায় শেষ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো‘আ ও যিকিরে মশগুল থাকা।

২. সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে মুযদালিফাভিমুখে রওয়ানা হওয়া।

৩. মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে, এক আযান ও দুই একামতে, মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করা। ইশার সালাত কসর করে দু’রাকাত পড়া এবং সাথে সাথে বিতরের সালাতও আদায় করে নেয়া।

৪. মুযদালিফায় রাত্রিযাপন। সুবহে সাদিক উদয়ের পর অন্ধকার থাকা অবস্থাতেই ফজরের সালাত আদায় করা। আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দো‘আ মুনাজাতে মশগুল থাকা।

৫. সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনা অভিমুখে যাত্রা। তবে দুর্বলদের ক্ষেত্রে মধ্যরাতের পর মিনার উদ্দেশে রওনা করা বৈধ।

৬. মুযদালিফা থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করা যেতে পারে তবে জরুরী নয়। মোট কঙ্কর সংখ্যা ৫৯ বা ৭০টি। মিনা থেকেও কঙ্কর সংগ্রহ করা চলে। পানি দিয়ে কঙ্কর ধৌত করার কোনো বিধান নেই।

১০ যিলহজ

১। জামরায়ে আকাবা তথা বড় জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ।

২। মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা। মুণ্ডন করাই উত্তম। নারীদের ক্ষেত্রে আঙুলের অগ্রভাগ পরিমাণ ছোট করা।

৪। মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে ইহরাম হতে বেরিয়ে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী মেলা-মেশা ব্যতীত ইহরাম অবস্থায় হারাম হয়ে যাওয়া অন্যসব কিছু বৈধ হয়ে যাওয়া।

৫। তাওয়াফে যিয়ারত সম্পাদন। এ ক্ষেত্রে ১১ ও ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে। অধিকাংশ ফেকহবিদদের মতানুসারে এর পরেও আদায় করা যাবে। তবে ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে সেরে নেওয়া ভালোপ্ম

৬। তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ না করে থাকলে সাঈ করা।

৭ । ১০ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় যাপন।

উল্লেখ্য, তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মেলা-মেশাও বৈধ হয়ে যায়।

১১ যিলহজ

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিন জামরার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ। ছোট জামরা থেকে শুরু করে বড় জামরায় শেষ করা। ছোট ও মধ্য জামরায় নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে (দু'হাত উঠিয়ে) দো'আ করা। বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষের পর দো'আ নেই।

১২ যিলহজ

১। ১২ তারিখ (১১ তারিখ দিবাগত রাত) মিনায় রাতযাপন।

২। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিন জামরার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ। শুধু ছোট ও মধ্য জামরাতে নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করা।

৩। হাজীদের জন্য ১২ তারিখে মিনা ত্যাগ করা বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনার সীমানা অতিক্রম করতে হবে।

৪. মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করা।

১৩ যিলহজ

১। সূর্য হেলে যাওয়ার পর পর তিন জামরায় সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ। ছোট জামরা থেকে শুরু করে বড় জামরাতে গিয়ে শেষ করবে। শুধু ছোট ও মধ্য জামরাতে নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে (দু'হাত উঠিয়ে) দো'আ করবে।

২। মিনা ত্যাগ করে মক্কা অভিমুখে যাত্রা এবং মক্কা ত্যাগের আগে বিদায়ি তাওয়াফ সম্পাদন। তবে প্রসূতি ও স্রাবগ্রস্ত মহিলারা এ থেকে অব্যাহতি পাবে।

হজের তালবিয়া নিম্নরূপ

لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكْ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكْ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكْ ، لا شَرِيْكَ لَكْ

(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাকা)

“আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। তোমার কোনো শরীক নেই। নিশ্চয় প্রশংসা ও নি‘আমত তোমার এবং রাজত্বও, তোমার কোনো শরীক নেই।”

তওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী থেকে হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পড়ার বিশেষ দো‘আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(রববানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাহ, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়াকিনা আযাবান নার) “হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি থেকে বাচাও।”

আরাফা দিবসের বিশেষ দো‘আ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহূ লাহুল মুলক, ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর)

‘আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা‘বুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।’

কুরআনের নির্বাচিত দো‘আ

১- ﴿ رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٢٣ ﴾ [الاعراف: ٢٣]

(১) ‘হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুল্ম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে রহম না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।’ [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২৩]

২- ﴿ رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارَۢا ٢٨ ﴾ [نوح: ٢٨]

(২) ‘হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দিবেন না।’ [সূরা নূহ, আয়াত: ২৮]

৩- ﴿ رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ ٤١ ﴾ [ابراهيم: ٤٠، ٤١]

(৩) ‘হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দো‘আ কবুল করুন। হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।’ [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০-৪১]

৪- ﴿ رَّبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَإِلَيۡكَ أَنَبۡنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٤ ﴾ [الممتحنة: ٤]

(৪) ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে।’ [সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৪]

৫- ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝٥ ﴾ [الممتحنة: ٥]

(৫) ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র বানাবেন না। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ [সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৫]

৬- ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ۝٢٥ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ۝٢٦ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى ۝٢٧ ﴾ [طه: ٢٥، ٢٧]

(৬) ‘হে আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আর আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন।’ [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ২৫-২৭]

৭-﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ۝٥٣ ﴾ [ال عمران: ٥٣]

(৭) ‘হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন।’ [[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৩]

৮- ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٨٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝٨٦ ﴾ [يونس: ٨٥، ٨٦]

(৮) 'তখন তারা বলল, 'আমরা আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করলাম। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে যালিম কওমের ফিতনার পাত্র বানাবেন না। আর আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহে কাফির কাওম থেকে নাজাত দিন।' [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৬]

৯- ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝١٤٧ ﴾ [ال عمران: ١٤٧]

(৯) 'হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পদসমূহকে, আর কাফির কওমের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন'। [[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৭]

১০-﴿ رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ۝١١٨ ﴾ [المؤمنون: ١١٨]

(১০) 'হে আমাদের রব, আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' [সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত : ১১৮]

১১- ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأٓخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۝٢٠١ ﴾ [البقرة: ٢٠١]

(১১) হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।' [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]

১২- ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦﴾ [البقرة: ٢٨٦]

(১২) ‘হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব, আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।’ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]

১৩- ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ٨﴾ [ال عمران: ٨]

(১৩) ‘হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।’ [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮]

১৪- ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ [الفرقان: ٧٣]

(১৪) ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন’। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪]

১৫- ﴿ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠ ﴾ [الحشر: ١٠]

(১৫) ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।’ [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

১৬-﴿ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٨ ﴾ [التحريم: ٨]

(১৬) ‘হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।’ [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮]

১৭-﴿رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦ ﴾ [ال عمران: ١٦]

(১৭) ‘হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন’। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬]

১৮-﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ٣٥﴾ [ابراهيم: ٣٥]

(১৮) ‘হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন’। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৫]

১৯- ﴿ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٧ ﴾ [الاعراف: ٤٧]

(১৯) ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে যালিম কওমের অন্তর্ভুক্ত করবেন না’। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৪৭]

২০- ﴿ حَسۡبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ١٢٩ ﴾ [التوبة: ١٢٩]

(২০) ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করেছি। আর তিনিই মহাআরশের রব।’ [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৯]

হাদীসের নির্বাচিত দো'আ

١. «اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

(১) 'হে আল্লাহ! তোমার যিকির করার, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার কাজে আমাকে সহায়তা কর।'[708]

٢. «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ من أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

(২) 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা থেকে। আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের চরম পর্যায় থেকে। দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে।'[709]

٣. «اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

(৩) 'হে আল্লাহ, আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশি জুলুম করেছি আর তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ কেউই মাফ করতে পারে না। সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি রহম কর। তুমি তো মার্জনাকারী ও দয়ালু।'[710]

---

[708] নাসাঈ, হাদীস নং ১৩০৩; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৫২২; মুসনাদে আহমাদ : (৩৬/৪৩০), হাদীস নং ২২১১৯; হাকিম : (১/৪০৭), হাদীস নং ১০১০।

[709] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৬৫।

[710] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৩৪।

٤. «اَللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اَللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِينَ».

(৪) ‘হে আল্লাহ! তুমি ঈমানকে আমাদের নিকট সুপ্রিয় করে দাও এবং তা আমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দাও। কুফর, অবাধ্যতা ও পাপাচারকে আমাদের অন্তরে ঘৃণিত করে দাও, আর আমাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও। আমাদের মুসলিম হিসেবে বাঁচিয়ে রাখ। লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত না করে আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পৃক্ত কর।[711]

٥. «اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

(৫) হে আল্লাহ! তোমারই রহমতের আকাঙ্ক্ষী আমি। সুতরাং এক পলকের জন্যও তুমি আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিয়ো না। তুমি আমার সমস্ত বিষয় সুন্দর করে দাও। তুমি ভিন্ন প্রকৃত কোনো মা‘বুদ নেই।[712]

٦. «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ عَرْشِ الْعَظِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ».

---

711 আহমদ, হাদীস নং ১৫৪৯২।

712 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৫০৯০।

(৬) আল্লাহ ছাড়া কোনো মা‘বুদ নেই, যিনি সহনশীল, মহীয়ান। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা‘বুদ নেই, যিনি সুমহান আরশের রব। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা‘বুদ নেই। তিনি আকাশমণ্ডলীর রব, যমিনের রব এবং সুমহান আরশের রব।[713]

٧. «اَللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ».

(৭) ‘হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে কিছু নেই। তুমি সবার ওপর, তোমার ওপরে কিছুই নেই। তুমি সবচেয়ে কাছের, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই; তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও আমাকে দারিদ্র্যমুক্ত করে অমুখাপেক্ষী কর।’[714]

٨. «اَللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ».

(৮) ‘হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল বস্তু দিয়ে আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ করে। তুমি ভিন্ন অন্য সবার থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।’[715]

٩. «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

---

[713] আহমদ, হাদীস নং ২৪১১।

[714] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৩।

[715] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৬৩।

(৯) 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, মসিহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে এবং জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকে।'[716]

١٠. «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ».

(১০) 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই; কেননা আমি সাক্ষ্য দিই যে- তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি এক অদ্বিতীয়। সকল কিছুই যার মুখাপেক্ষী। যিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই।'[717]

١١. «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ».

(১১) 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিপদের কষ্ট, নিয়তির অমঙ্গল, দুর্ভাগ্যের স্পর্শ ও বিপদে শত্রু উপহাস থেকে।'[718]

١٢. «اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ».

(১২) 'হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ।'[719]

---

[716] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৯।

[717] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৭৫।

[718] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৪৭।

[719] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৩।

١٣. «اَللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ،وَلا يعزُّ مَن عَادَيت, تَبَارَكْتَ ربَّنَا وَتَعَالَيْتَ».

(১৩) 'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যাদেরকে নিরাপদ রেখেছ আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত কর। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করো। তুমি আমাদেরকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছ তা হতে আমাদেরকে রক্ষা করো। কারণ তুমিই তো ফয়সালা কর। তোমার ওপরে তো কেউ ফয়সালা করার নেই। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, সে কোনো দিন অপমানিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছ, সে কখনো সম্মানিত হতে পাবে না। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময় ও সুমহান।'[720]

١٤. «اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ».

(১৪) 'হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে নূর প্রদান কর। আমার কর্ণে নূর দাও। আমার চোখে নূর দাও। আমার সম্মুখে নূর দাও। আমার পশ্চাতে নূর দাও। আমার ডানে নূর দাও। আমার বামে নূর দাও।

---

[720] তিরমিযী, হাদীস নং ৪৬৪।

আমার উপরে নূর দাও। আমার নিচে নূর দাও। আর হে সৃষ্টিকুলের রব, আমার নূরকে তুমি প্রশস্ত করে দাও।’[721]

١٥. «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ».

(১৫) ‘হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! তোমার দীনের ওপর আমার অন্তরকে অবিচল রাখ।’[722]

---

[721] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬৩।

[722] তিরমিযী, হাদীস নং ২১৪০।

হজ-উমরা বিষয়ক আরবী পরিভাষাসমূহ

আইয়ামে তাশরীক: যিলহজ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়।

ইযতিবা: ডান বগলের নিচ দিয়ে চাদরের প্রান্ত বাম কাঁধের ওপর উঠিয়ে রাখা। এভাবে, ডান কাঁধ খালি রেখে উভয় প্রান্ত বাম কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে রাখা।

ইয়াওমুত তারবিয়াহ: যিলহজ মাসের ৮ তারিখ মিনায় যাওয়ার দিন।

ইয়াওমু আরাফা: আরাফা দিবস। যিলহজ মাসের ৯ তারিখ সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে সূযাস্ত পর্যন্ত ফরয হিসেবে আরাফায় অবস্থান করতে হয়। এ দিনকে ইয়াওমু আরাফা বলে।

ইহরাম: হারাম বা নিষিদ্ধ করে নেয়া। হজ ও উমরা পালনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু কথা ও কাজ নিজের ওপর নিষিদ্ধ করে নেওয়ার সংকল্প করা।

ওয়াদি মুহাস্সার: এটি মুযদালিফা ও মিনার মাঝামাঝি একটি জায়গার নাম, যেখানে আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীকে ধ্বংস করা হয়েছিল। স্থানটি হেরেমের ভেতরে অবস্থিত কিন্তু ইবাদতের স্থান নয়। এখানে পৌঁছলে আল্লাহর গজব নাযিল হওয়ার স্থান হিসেবে তা দ্রুত অতিক্রম করা উচিৎ।

ওয়াদি উরনাহ: আরাফার মাঠের পাশে বিস্তৃত উপত্যকা, যা মুযদালিফার দিক থেকে আরাফায় প্রবেশের ঢোকার সময় প্রথম সামনে পড়ে।

উকূফ: অবস্থান করা। আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করাকে যথাক্রমে উকূফে আরাফা ও উকূফে মুযদালিফা বলা হয়।

কসর: সংক্ষিপ্ত করা। চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতগুলো দু'রাকাত করে আদায় করা।

কিরান: মিলিয়ে করা। হজ ও উমরাকে একই সাথে আদায় করার নাম কিরান করা। এটি তিন প্রকার হজের অন্যতম।

জামরাহ: শাব্দিক অর্থ পাথর। মিনায় অবস্থিত শয়তানকে পাথর মারার স্থান। জামরার সংখ্যা তিনটি।

জাবাল: পাহাড়।

জাবালে আরাফা: আরাফায় অবস্থিত পাহাড়, যাকে জাবালে রহমতও বলে।

তাওয়াফ: প্রদক্ষিণ করা। কা'বার চারপাশে প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলে।

তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারাহ: ১০ যিলহজ কুরবানী ও হলক-কসরের পর থেকে ১২ যিলহজের মধ্যে কা'বা শরীফের তাওয়াফ করাকে তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারাহ বলে। এ তাওয়াফ ফরয।

তাওয়াফে কুদূম: কদূম অর্থ আগম করা। সুতরাং এর অর্থ আগমনী তাওয়াফ। মীকাতের বাইরের লোকেরা যখন হজ বা উমরার উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফে আসেন, তখন তাদেরকে বায়তুল্লাহ তথা কা'বার সম্মানার্থে এ তাওয়াফটি করতে হয়। এটি সুন্নাতপ্ন

তাওহীদ: আল্লাহর একত্ববাদ।

তাকবীর: বড় করা। ইসলামী পরিভাষায় 'আল্লাহু আকবার' বলাকে তাকবীর বলে।

তামাত্তু: উপকৃত হওয়া, উপকার নেওয়া, ভোগ করা। একই সফরে প্রথমে উমরা আর পরে হজ আলাদাভাবে আদায় করাকে তামাত্তু বলে। এটি তিন প্রকার হজের অন্যতম।

তালবিয়া: সাড়া দেয়া। এখানে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে হজ বা উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারীকে 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলে যে বাণী পাঠ করতে হয় তাকে তালবিয়া বলা হয়।

তাহলীল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা।

দম: রক্ত। হজ-উমরা আদায়ে ওয়াজিব ছুটে যাওয়া জনিত ভুল-ত্রুটি হলে তার কাফফারা স্বরূপ একটি পশু যবেহ করে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হয়। এই পশু যবেহকে বলে দম দেওয়া।

নহর: কুরবানী করা। উট কুরবানী করার জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় তার গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়প্এ প্রক্রিয়াকে নহর বলে।

ফিদয়া: ক্ষতিপূরণ। সাধারণ কোনো অপরাধ হয়ে গেলে তিনটি কাজের যেকোন একটি করতে হয়। ছয়জন মিসকীনকে এক কেজি দশ গ্রাম পরিমাণ খাবার প্রদান কিংবা তিনদিন সিয়াম পালন করা অথবা ছাগল যবেহ করে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া।

বাতনে ওয়াদী: বাতন অর্থ পেট বা মধ্যভাগ। আর ওয়াদী অর্থ উপত্যকা। তাই বাতনে ওয়াদী শব্দদু'টির অর্থ উপত্যকার মধ্যভাগ। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে নিচু উপত্যকা এলাকা ছিল। সে উপত্যকাটিকেই বাতনে ওয়াদী বলে।

মাকামে ইবরাহীম: ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাঁড়ানোর স্থান। একটি বড় পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা শরীফ নির্মাণ সম্পন্ন করেন। সে পাথরে তার পদচিহ্ন পড়ে যায়, যা এখনো বর্তমান রয়েছে। কা'বা শরীফের সামনে অবস্থিত এই পাথরকে মাকামে ইবরাহীম বলা হয়।

মাতাফ: তাওয়াফ করার স্থান। কা'বা ঘরের চারদিকে সাদা পাথর বিছানো এলাকাকে মাতাফ বলা হয়। এখান দিয়েই তাওয়াফ করা হয়।

মাবরূর: মকবুল। হাদীসে মকবুল হজকে হজ্জে মাবরূর বলা হয়েছে।

মাশ'আর: নিদর্শন সম্বলিত স্থান। আর মাশ'আরুল হারাম বলতে মুযদালিফাকে বুঝানো হয়েছে।

মাস'আ: সাঈ করার স্থান। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা, যেখানে লোকজন সাঈ করে।

মুলতাযাম: লেপ্টে থাকার স্থান। হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে অবস্থিত কা'বা ঘরের স্থান, যা দো'আ কবুলের স্থান হিসেবে পরিচিত। তাই এখানে সবসময় লোকজন লেগেই থাকে।

রওযা: বাগান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মিম্বর ও ঘরের মাঝখানের অংশকে রওযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাত বা জান্নাতের একটি বাগান বলে অভিহিত করেছেন।

রমল: ঘন পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটা। হজ বা উমরার প্রথম তাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্কর ঘন পদক্ষেপে বীরদর্পে বাহু ঘুরিয়ে দ্রুত হাঁটতে হয়। এটাকে রমল বলে।

রুকন: স্তম্ভ। হজের রুকনের অর্থ হজের স্তম্ভসমূহ, যার ওপর হজের ভিত্তি। এর কোনটি বাদ গেলে হজ হয় না।

রুকনে ইয়ামানী: রুকনে ইয়ামানীর অর্থ কা‘বার সেই স্তম্ভ যেটি ইয়ামান দেশের দিকে স্থাপিত।

সাঈ: দৌড়ানো। এখানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার যাওয়া আসা করাকে বুঝায়।

হজ্জে আকবার: যিলহজের দশ তারিখের দিনকে কুরআনে ‘ইয়াওমুল হাজ্জিল-আকবার তথা বড় হজের দিন বলা হয়েছে। যিলহজের ৯ তারিখ তথা আরাফা দিবস যদি শুক্রবারে হয় তাহলে আরাফা দিবস ও জুমাবার- উভয়ের ফযীলত লাভ হয়। তবে এটি আকবরী হজ নামে যে লোক মুখে প্রচলিত তার কোনো ভিত্তি নেই।

হলক-কসর: হজ বা উমরার কাজ সম্পন্ন হলে মাথার চুল কামাতে বা ছোট করতে হয়। মাথা কামানোকে হলক এবং চুল ছোট করাকে কসর বলা হয়।

হারাম: নিষিদ্ধ বস্তুকে হারাম বলে। আবার সম্মানিত স্থানকেও হারাম বলে। মক্কা ও মদীনার নির্দিষ্ট সীমারেখাকে হারাম বলে।

হালাল: বৈধ হওয়া। ইহরাম শেষ হওয়ার পর মুক্ত অবস্থাকে হালাল হওয়া বলে।

হিজর বা হাতীম: কা'বা শরীফ সংলগ্ন উত্তর পাশে খোলা জায়গা, যা ইবরাহীম আ. কর্তৃক নির্মিত মূল কা'বার অংশ ছিল।

হজের সফরে প্রয়োজনীয় আরবী শব্দসমূহ

খাদ্য ও পানীয়

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
পানি	মুইয়া	নাস্তা	ফুতুর
মিষ্টি পানি	মুইয়া হেলু	দুপুরের খাবার	গাদা
কলের পানি	মুইয়া মাকিনা	রাতের খাবার	আশা
বৃষ্টির পানি	মুইয়া মাতার	হুক্কা	শিশা
বরফের পানি	মুইয়া মুসাল্লায	সিগারেট	সিজারা
চাউল/ভাত	রুয্	চিনি	সুগ্গার
গোশত্	লাহাম	চা	শাই
গরুর গোশত	লাহমুল বাকার	কফি	গাহওয়া
মুরগীর গোশত	লাহমুদ্দাজাজ	পরাটা	মুতাববাখ
খাসীর গোশত	লাহাম মায়েয	মাখন	যুবদা
উটের গোশত	লাহমুল জামাল	পনীর	যুবন
মেষ/দুম্বার গোশ্ত	লাহমুল গানাম	তৈল	যাইত
ভূনা গোশত	লাহাম মাশাওয়ী	সালুন	ইদাম
বিরিয়ানী	রুয মাশওয়ী	আটা	দকীক

সাদা ভাত	রুয সালুল	কিমা	মাফ্রুম্নম
পোলাও	রুয বুখারী	পান	তাম্বুল
দুধ	হালীব	চুন	নূরা
বাংলা	**আরবী**	**বাংলা**	**আরবী**
দধি	লাবান	মাথা	রা'স
রুটি	খুবয/আইশ	কলিজা	কিবদা
আলু গোশ্ত	লাহামবাতাতিস	গুরদা	কলব
শুরুয়া	শুরবা	ক্ষুধার্ত	জাওআন
পিপাসিত	আতশান	সমুদ্রের মাছ	হূতুলবাহার
ছোট মাছ	সামাক	নদীর মাছ	হূতুননাহার
মাছ	হূত		

মসলা জাতীয়

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
সরিষার তৈল	যাইতুখারদাল	মসল্লা	মাসাল্লা
মরিচ	ফিলফিল	লবণ	মিলহ
রসুন	সূম	পেঁয়াজ	বাসাল
লবঙ্গ	গোরনফুল	এলাচী	হিল

জিরা	কামনুন	দারুচিনি	গুরবা
আদা	জানজাবিল	হলুদ	হোরদ

তরি তরকারী

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
শাকসবজী	খাদরাওয়াত	টমেটো	তামাতা
সব্জীওয়ালা	খাদারী	বাঁধা কপি	কুরম্বা
মুদী	বাককাল	শশা	খিয়ার
মুদী দোকান	বাককালা	ডাল	আদাস
সীম, বীট	ফুল	ঢেড়শ	বামিয়া
বেগুন	বাদিন্জান	শালগম	শালজাম
মূলা	ফিজিল	পালং শাক	শিলক
গোল আলু	বাতাতিস	লেবু	লিমুন

ফল জাতীয়

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
বাদাম	লওয্	তরমুজ	হাব্হাব্
খেজুর	তামার	আনারস	আনানাস

আম	মানগা	আংগুর	ইনাব
আপেল	তুফফাহ	কমলা লেবু	বুরতুগাল
মাল্টা	বুরতুগাল	বেদানা	রোমমান
কলা	মাওয	পাকা খেজুর	রাতাব
নারিকেল	জাযলুল হিন্দ		

দিক, সময় ও দিনের নাম

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
পূর্ব	মাশরিক	শনিবার	ইয়াওমুস সাবত
পশ্চিম	মাগরিব	রবিবার	ইয়াওমুল আহাদি
উত্তর	শিমাল	সোমবার	ইয়াওমুল ইছ্নাইন
দক্ষিণ	জুনুব	মঙ্গলবার	ইয়াওমুস ছুলাছা
এখানে	হুনা	বুধবার	ইয়াওমুলআরবিয়া
ওখানে	হুনাকা	বৃহস্পতিবার	ইয়াওমুল খামীস
দূরে	বাঈদ	শুক্রবার	ইয়াওমুল জুমুআ
কাছে	কারীব	দিন	ইয়াওমুন/নাহার
আমার কাছে	ইনদী	তোমার কাছে	ইনদাক
আমার	মিননী	রাত্রি	লায়ল

থেকে			
আমার	লী	আগামীকাল	বুকরা
বছর	আম/সানা	পরশু	বা ’দা
মিনিট	দাক্বীক্বা	গতকল্য	আমস
মাস	শাহ্‌র	ঘড়ি/ঘন্টা	সাআত

পেশা ও চিকিৎসা সম্পর্কিত

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
বাদশাহ	মালিক	প্রাথমিক চিকিৎসা	ইসআফ
বিচারক	কাযী	হাসপাতাল	মুসতাশফা
কর্মচারী	মুওয়াযযাফ	ফার্মেসী	সাইদালা
দারোয়ান	বাওওয়াব	ওষুধ	দাওয়া
চৌকিদার	চৌকিদার	বড়ি	হুবুব
শ্রমিক	উম্মাল	ব্যথা	আলাম
ইঞ্জিনিয়ার	মুহানদিস	রোগী	মারীদ
ডাক্তার	তাবীব	রোগ	মরাদ
নার্স	মুমাররেদা	আরোগ্য	শেফা

সর্বনাম

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
আমি	আনা	তোমরা (পুং)	আনতুম
আমরা	নাহ্‌নু	তোমরা (স্ত্রী)	আনতুন্না
তুমি (পুং)	আনতা	সে (পুং)	হুয়া
তুমি (স্ত্রী)	আনতি	সে (স্ত্রী)	হিয়া
তোমরা দুইজন	আনতুমা	তাহারা (স্ত্রী)	হুন্না

ব্যবহারিক দ্রব্যাদি

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
চায়ের কাপ	ফিনজান	সুরমা	কুহল
ট্রে	তিফ্‌সি	ছুরি	সিক্কীন
চামচ	মিল‘আগা	স্যুটকেস/ব্যাগ	হাক্বীবা
পেট্রোল	বেন্‌যিন	তালা	গুফল
পাখা	মিরওয়াহা	টেপরেকর্ডার	মুসাজ্জাল
মগ	মুগরাব	রেডিও	রাদিও

গ্লাস	কা’স	টেলিফোন	তিলফুন
পাতিল	গেহের	টেপ বা ফিতা	শরিত্
বালতি	ছতল	ডিস্ক রেকর্ড	উস্তুয়ানা
সাবান	সাবুন	রিফ্রেজারেটর	থাল্লাজা
ছাতা	শামসিয়া	ব্যাটারী	বাত্তারীয়া
আয়না	মিরআয়া	কাগজ	ওয়ারাক
চিরুনী	মুশত	কলম	ক্বালাম
বাক্স	সুনদূক	চিঠি	কিতাব
চাবি	মিফতাহ	ম্যাপ	খারীতা
স্কেল	মিসতারা		

আত্মীয়-স্বজন

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
পিতা	আব	দাদী	জাদ্দাহ
মা	উম্ম	মেয়ে	বিনত
বোন	উখত	ছেলে	ওয়ালাদ
ভাই	আখ	স্ত্রী/স্ত্রীলোক	হুরমাত/হারীম
বন্ধু	রাফীক্ব	রক্ত সম্পর্কীয়	মুহাররাম

		আত্মীয়	
চাচা	আম	দাদা	জাদ্দ
ফুফু	আম্মাহ	মিস্টার	আসসায়্যিদ

ক্রিয়াকর্ম, প্রশ্নবোধক ও বাক্যাংশ

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
কত?	কাম	অর্ধেক	নিসফ
কে?	মান	কিছু না	মালিশ্
কোথায়	ফিন্	তাই নয় কি?	মুশ কিদা?
কখন	মাতা	এখন না	লিস
এখন	দাহীন	বাইরে	বাররা
আসো	তাআল	ভেতরে	জুওয়া
চড়ো	আরকাব	কম/অল্প	কালীল
পান কর	আশরাব	বেশি	কাছীর
খাও	ক্কুল	কত	গাদাশ
উঠাও	শিলু	ধর	আমসাক
নামাও	নাযযিল	উঠ	ক্কুম

যাও	রোহ	কাট	ক্বাত্তি’
অল্প কিছু	শাই	দেখ	শুফ
শোন	ইসমা	দাও	গিব্
রাখ	হোত্তা	যাও	আমশি
আন	হাতি	ওজন কর	ওয়াযযিন
সামনে সামনে	ক্বাবলা ক্বাবলা	খরিদ কর	ইশতারি
পেছনে সর	ওরে ওরে	বিক্রি কর	বিঅ’
উপরে	ফাওক্বা	যবেহ কর	আদ্বাহ্
নীচে	তাহতা	পরিধান কর	ইলবিস
ডানে	ইয়ামীন	টাকা ভাঙ্গানোর দোকান	মাসরাফ/সার্রাফ
বায়ে	ইয়াসার	কসাই	কাস্সাব
সমান সমান	সাওয়া সাওয়া	নাপিত	হাললাক
আছে	ফী	নাই	মা ফী

ভ্রমণ সংক্রান্ত

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
বিমানবন্দর	মাতার	কুলি	উবাশ
লাউঞ্জ/কাউন্টার	সালাহ	মোটরকার	সাইয়ারা
অনুসন্ধান	ইসতিলামা	মোটরগাড়ি/বাস	হাফেলা
ব্যাংক	মাসরাফ	টেক্সি	তাকসী
বিমান	তাইয়ারা	ড্রাইভার	সায়েক
পাসপোর্ট	জাওয়ায	রাস্তা	তারীক
ভিসা	তাশীরা	ওভার ব্রিজ	কুবরা
কাস্টম	জুমরুক	টাকার ভাংতি	তাফরীক

হোটেল-রেস্টুরেন্ট

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
হোটেল	ফনদুক	বাবুর্চি	তাববাখ
রেস্টুরেন্ট	মাতআম	বাজার	সুক
ম্যাসিয়ার	সুফরজী	গোসলখানা	হামমাম

গণনা

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী

১ এক	ওয়াহেদ	১৯ ঊনিশ	তিসআতা আশারা
২ দুই	ইছনানে	২০ বিশ	ইশরীন
৩ তিন	ছালাছা	৩০ ত্রিশ	ছালাছীন
৪ চার	আরবাআ	৪০ চল্লিশ	আরবাঈন
৫ পাঁচ	খামসা	৫০ পঞ্চাশ	খামসীন
৬ ছয়	সিত্তা	৬০ ষাট	সিততীন
৭ সাত	সাবআ	৭০ সত্তর	সাবঈন
৮ আট	ছামানিয়া	৮০ আশি	ছামানীন
৯ নয়	তিসআ	৯০ নববই	তিসঈন
১০ দশ	আশারা	১০০ একশ	মিআহ
১১ এগার	ইহদা আশারা	২০০ দুইশ	মিআতাইন
১২ বার	ইছনা আশারা	৩০০ তিনশত	ছালাছ মিআহ
১৩ তের	ছালাছাতা আশারা	এক হাজার	আলফ
১৪ চৌদ্দ	আরবাআতাআশারা	দুই হাজার	আলফাইন
১৫ পনের	খামসাতা আশারা	তিন হাজার	ছালাছ আলাফ

১৬ ষোল	সিত্তাতা আশারা	প্রথম	আওয়াল
১৭ সতের	সাবআতা আশারা	শেষ	আখির
১৮ আঠার	ছামানিয়া আশারা	মধ্যে	ওয়াসাত

পোশাক জাতীয়

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
কাপড়	কুমমাশ	মশারী	নামুসীয়া
পাজামা	সিরওয়াল	খাটিয়া	খাশাব
জায়নামায	সাজজাদা	গেঞ্জি	ফিনলা
জামা	কামীস	গাইড	দালীল
প্যান্ট	বুনতুল	মু'আল্লিম	মুতাওয়ীক
তোয়ালে	ফুতা	অবতরণ কর	তানাযযাল
রুমাল	মিনদীল	ট্যাক্স	দরীবা
স্যান্ডেল	শাবশাব	বাংলাদেশ	বাংলাদেশ
বালিশ	মোখাদ	দূতাবাস	সাফারা

কিছু কথোপকথন

বাংলা	আরবী

সুপ্রভাত	সবাহাল খাইর/সবাহান নূর
শুভ সন্ধ্যা	মাসাআল খাইর/মাসাআন নূর
কেমন আছেন?	কাইফা হালুক/কাইফা সিহহা
আলহামদুলিল্লাহ্, আমি ভালো	কুয়াইস, আলহামদুলিল্লাহ
আপনার নাম কি?	ইশ, ইসমুক?
আমার নাম মুহাম্মাদ	ইসমি মুহাম্মাদ
আমি বাংলাদেশী	আনা মিন বাংলাদেশ
আমি বাংলাদেশী তাঁবু খুঁজছি	আবগা খিমা বাংলাদেশ?
আপনার মুআল্লিম কে?	মন মুতাওয়াফকা
আমার মুআল্লিম যায়দ	মুতাওয়াফী যাইদ
মদীনায় আপনার পথপ্রদর্শক কে?	মন দালীলুকা ফিল মদীনা
আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি	আনা ফাকাদতু তারীক
আমি জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাস্তা খোঁজ করছি	আনা উরীদু সাফারা বংলাদেশ লাদা জেদ্দা
আপনি কি চান?	ইশ তাবগা?
আমি বাংলাদেশ হজ্জ মিশন অফিসে যেতে চাই	আবগা আন আবরাহা ইলা মাকতাব বি'সাতিল হাজ

	বাংলাদেশ
মক্কা শরীফের বাসস্ট্যাণ্ড কোথায়?	ফেন মাওকাফ আতবাস মাক্কা
বাংলাদেশ হজ্জ মিশন বাবে আব্দুল আযীযের সামনে	মাকতাব বি'সাতিল হাজ বাংলাদেশ কুদদাম বাব আবদুল আযীয
তোমার সাথে কে?	মান মাআকা
তিনি আমার বন্ধু	হুয়া রাফিকি
এই কুলী, এদিকে আসো!	তাআল ইয়া হামমাল
এই জিনিসগুলো উঠাও	শেলু হাজিহিল আশয়া
ড্রাইভার তুমি কি মক্কা যাবে?	ইয়া সাওওয়াক হাল তারবাহ ইলামাককা
কত ভাড়ায়?	বিকাম?
এই উটটির দাম কত?	বিকাম হাজাল জামাল?
কুরবানীর জায়গা কোথায়?	ফেন মাযবাহ?
আমাকে জামরার রাস্তা বলুন	দুললানি তারীক জামরা
মসজিদ খাইফ কোথায়?	ফেন মাসজিদ খাইফ?
হাজী সাহেব, আসুন!	তাফাদদাল ইয়া হাজ্জি
ধন্যবাদ, এক প্লেট ভাত দাও	শুকরান, হাতি সাহম রুয

কি তরকারী আছে?	ইশ ফী ইদাম?
গরুর গোশত এবং মাছ দাও	হাতি লাহম বাকার ওয়া সামাক
ঠান্ডা পানি দাও	জিবু মুইয়া সাল্লাজা
দুধ আছে ?	হালীব ফী?
দুধ নাই তবে কফি আছে	মাফী হালেব লাকিন কাহওয়া ফী
দাম কত হয়েছে?	কাম আল হিসাব?
সাড়ে পাঁচ রিয়াল	খামস রিয়াল ওয়া নিসফ
আল্লাহ তোমার ওপর রাজী থাকুন	আল্লাহ আরদা আলাইকা
আল্লাহ দীর্ঘজীবি করুন	হাইয়াকুমুল্লাহ
আমার সাথে আস	তাআল মাঈ
তার সাথে যাও	রোহ মাআহ
কেন দেরি করেছ?	লেমা তাআখখারতা?
আমার অনেক কাজ	ইনদি শুগুল কাছীর
সামনে চলুন	কুদদাম কুদদাম
পেছনে সরুন	ওয়ারা ওয়ারা
এই তরমুজটি কত	বেকাম হাবহাব হাজা
এর দাম দুই রিয়াল	হাজা বেরিয়ালাইন

এক কথাতো	ওয়াহেদ কালাম
দেড় রিয়াল শেষ কথা	রিয়াল ওয়াহেদ ওয়ানিসফ আখের কালাম
কেটে দেখিয়ে দিবে তো?	আলাস সিককীন
নিশ্চয় কেটে দেখিয়ে দেব	ওয়াল্লাহে আলাস সিককীন
এটা খারাপ তরমুজ	হাজা হাবহাব বাত্তাল
এটা ভালো মিঠা	হাজা তাইয়েব হুলু
কি চান হাজী সাহেব	ইশ তাবগা হাজ্জি
আমি ডাক্তার খানা চাই	আবগা ইয়াদ তা 'বীর
রাস্তার শেষ মাথায়	হাজা ফি আখির তারিক
ডাক্তার আছেন?	তাবীব ফী?
আছি, ভেতরে আসুন	ফী তাফাদদাল
হাজী সাহেব কী হয়েছে?	মা বিকা হাজ্জি?
ওহ্ মাথা ব্যাথা!	উহ রা'সি
পেটে ভীষণ ব্যাথা!	আলাম শাদীদ ফী বাতনী
গত রাতে কী খেয়েছিলেন?	মাজা আকালতা বিল বারিহা
রুটি ও গোশত খেয়েছিলাম	তানাওয়ালতু খুবয ওয়া লাহাম
আমার যখম হয়েছে	আসাবতু বিল জুরহ

আমার জ্বর হয়েছে	আসাবতু বিল হেমা
এ ওষুধ তোমাকে সুস্থ করবে	হাজা দাওয়া ইয়াশফিক
ওষুধ কোথায় পাব?	ফেন আজিদ দাওয়া?
ফার্মেসিতে	ফেস সায়দালা
কিভাবে সেবন করবো?	কাইফা আসতা'মিল
১ বড়ি দৈনিক ৩ বার	ওয়াহেদ কুরস ছালাছ মাররা
১ টি করে ক্যাপসুল দিনে ২ বার	ওয়াহেদ কাবসুল মাররাতান ফেল ইয়াওম
ধন্যবাদ	শুকরান